মূল মুদ্রণের পূর্বের কপি

প্রশিক্ষণ মডিউল

কমিউনিটি প্যারামেডিক-২০১৮

তৃতীয়পত্র

পরিবার পরিকল্পনা ও জেন্ডার

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

প্রিন্ট: ২৪-০১-২০১৯

কমিউনিটি প্যারামেডিকদের
মৌলিক প্রশিক্ষণ

বিষয় : ৩

পরিবার পরিকল্পনা ও জেন্ডার

অধ্যায় ১ ঃ পরিবার পরিকল্পনা

পাঠ ১	জনমিতি	৮
পাঠ ২	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	১১
পাঠ ৩	পরিবার পরিকল্পনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা, পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা ও বাঁধাসমূহ	১৩
পাঠ ৪	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ	১৮
পাঠ ৫	উদ্বুদ্ধকরণ	২১
পাঠ ৬	কাউন্সেলিং	২৫
পাঠ ৭	গ্রহীতা বাছাইকরণ	২৯
পাঠ ৮	মায়ের দুধ খাওয়ানো পরিবার পরিকল্পনার একটি সনাতন পদ্ধতি	৩৫
পাঠ ৯	দেরীতে বিবাহ, আযল বা প্রত্যাহার এবং সহবাস থেকে বিরত থাকা	৩৭
পাঠ ১০	প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপদকাল নির্ণয়, পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা ও ব্যবহার বিধি	৩৮
পাঠ ১১	কনডম	৪১
পাঠ ১২	খাবার বড়ি	৪৯
পাঠ ১৩	খাবার বড়ি গ্রহীতার ইতিহাস গ্রহণ, শারীরিক পরীক্ষা, বড়ি খাওয়ার নিয়মাবলী এবং পরামর্শদান	৫৩
পাঠ ১৪	বন্ধ্যাত্ব ও এর ব্যবস্থাপনা	৫৭
পাঠ ১৫	খাবার বড়ি ব্যবহারকারীদের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, জটিলতা ও ব্যবস্থাপনা	৬৩
পাঠ ১৬	খাবার বড়ি ব্যবহারকারীদের ফলো-আপের সহায়ক তালিকা	৭১
পাঠ ১৭	জন্মনিরোধক ইনজেকশন পদ্ধতি	৭৩
পাঠ ১৮	ইনজেকশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ,পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, জটিলতা এবং ব্যবস্থাপনা	৭৬
পাঠ ১৯	আইইউডি	৮৮
পাঠ ২০	আইইউডি ব্যবহারের সুবিধা, অসুবিধা, কোন কোন অবস্থায় মহিলাদের আইইউডি দেয়া যায় না এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা	৯৩
পাঠ ২১	আইইউডি প্রয়োগের জন্য কি কি সরবরাহ ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এবং প্রয়োগের পূর্বে যন্ত্রপাতিসমূহ জীবাণুমুক্তকরণ	৯৬
পাঠ ২২	আইইউডি প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রয়োগ পরবর্তী উপদেশ	৯৮
পাঠ ২৩	আইইউডি ব্যবহারের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, জটিলতা ও তার ব্যবস্থাপনা	১০৮
পাঠ ২৪	স্থায়ী পদ্ধতি	১১৯
পাঠ ২৫	অটোক্লেভ	১৩৩
পাঠ ২৬	অস্ত্রোপচার কক্ষ প্রস্তুতি	১৩৯
পাঠ ২৭	অপারেশন পূর্ববতী যত্ন	১৪৪
পাঠ ২৮	স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের সময় ১ম এবং ২য় সাহায্যকারীর দায়িত্ব	১৪৬

পাঠ ২৯ কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস এবং কার্ডিয়াক ম্যাসেজ) বা হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস পুনরুজ্জীবিতকরণ ১৪৯
পাঠ ৩০ ইমপ্ল্যান্ট ১৫৪
পাঠ ৩১ ইমপ্ল্যান্ট এর কার্যকারিতা এবং ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ১৫৫
পাঠ ৩২ ইমপ্ল্যান্ট বিষয়ক কাউন্সেলিং এবং গ্রহীতা বাছাইকরণ ১৫৮
পাঠ ৩৩ ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন ১৬২
পাঠ ৩৪ ইমপ্ল্যান্ট এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও তার ব্যবস্থাপনা ১৬৫
পাঠ ৩৫ ইমপ্ল্যান্ট খোলা ১৬৮
পাঠ ৩৬ ইমপ্ল্যান্ট রিপোর্টিং এবং ইমপ্ল্যান্ট সংক্রান্ত প্রশ্ন-উত্তর ১৬৯
পাঠ ৩৭ জরুরী গর্ভনিরোধক (ECP) ১৭২
পাঠ ৩৮ জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে আইইউডি ১৭৬
পাঠ ৩৯ অনিরাপদ গর্ভপাত ১৭৯
পাঠ ৪০ মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর) ১৮১
পাঠ ৪১ মেনোপজ ও এর ব্যবস্থাপনা ২০০
পাঠ ৪২ জরায়ু মুখের ক্যান্সার ২০৪
পাঠ ৪৩ স্তন ক্যান্সার ২০৬

অধ্যায় ২ ঃ জেন্ডার

পাঠ ১ জেন্ডার ঃ মূলধারণাসমূহ ২১১

Abbreviations

ADCC - Assistant Director Clinical Contraception
AIDS - Acquired Immune Deficinency Syndrome
BBS - Bangladesh Bureau of Statistics
BDHS - Bangladesh Demographic and Health Survey
BOC - Bangladesh Oxygen Company
BP - Blood Pressure
CBR - Crude Birth Rate
CDR - Crude Death Rate
CPR - Contraceptive Prevalence Rate
CAR - Contraceptive Acceptance Rate
CCSD - Clinical Contraceptive Service Delivery
CSM - Comittee on Safety of Medicine
DIC - Disseminated Intravascular Coagulation
DVT - Deep Vein Thrombosis
ECP - Emergency Contraceptive Pill
FP - Family Planning
ESP - Essential Services Package
FWVTI - Family Welfare Visitor Training Institute
FSH - Follicle Stimulating Hormone
FWV - Family Welfare Visitor
FWC - Family Walfare Visitor
GA - General Anesthesia
GI - Gastro Intestinal
HNPSP - Health, Nutrition and Population Sector Program
HIV - Human Immunodeficiency Virus
HDL - High Density Lipoprotein

IUD	- Intra Uterine Device
IMR	- Infant Mortality Rate
IV	- Intra Venus
IM	- Intra Muscular
IPPF	- International Plannt Parenthood Federation
LH	- Leutinizing Hormone
MMR	- Maternal Mortality Rate
MIS	- Management Information System
MCH	- Maternal and Child Health
MDG	- Millennium Development Goal
MR	- Menstrual Regulation
MSR	- Medical and Surgical Requisite
MOMCH	- Medical Officer Maternal and Child Health
MCWC	- Mother and Child Welfare Centre
NIPORT	- National Institute of Population Research & Training
NRI	- Natural Rate of Increase
NRR	- Net Reproductive Rate
NMR	- Neonatal Mortality Rate
NA	- Not Acceptable
NSV	- No Scalpel Vasectomy
PE	- Pulmonary Embolism
PID	- Pelvic Inflammatory Disease
PI	- Pelvic Infection
PV	- Per Veginal
RPIP	- Revised Program Implantation Plan
RTD	- Reproductive Tract Disorders
RH	- Reproductive Health
RhF	- Reshus Factor
SA	- Saptic Abortion

SACMO	- Sub Assistant Community Medical Officer
SVT	- Superficial Venous Thrombosis
TFR	- Total Fertility Rate
TT	- Tetanus Toxoid
UHC	- Upazila Health Centre
UTI	- Urinary Tract Infaction
UNICEF	- United Nations Children’s Fund
WHO	- World Health Organization

অধ্যায় ১ ঃ পরিবার পরিকল্পনা

পাঠ-১
জনমিতি

জনমিতি (Demography) কি ?

সাধারণ ভাষায় যে পুস্তকে জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য যেমন-জনসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু ও প্রজনন হার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে জনমিতি বা Demography বলে। Demos অর্থ জনসংখ্যা আর Graphy অর্থ চার্ট অর্থাৎ জনমিতি হলো জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রকৃত ঘটনার চিত্র বিশেষ।

১। স্থুল জন্ম হার (Crude Birth Rate-CBR)

কোন দেশে বা ভৌগলিক এলাকায় নির্দিষ্ট বছরে জনসংখ্যার প্রতি এক হাজারে যে ক'জন জীবিত শিশু জন্ম গ্রহণ করে সেই সংখ্যাকে ঐ এলাকার স্থুল জন্ম হার বলা হয়। এক বছরের মধ্যে জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যা (সাধারণতঃ বছরের মাঝামাঝি সময়ে, জুন মাসের জনসংখ্যা) দ্বারা ভাগ করে ঐ ভাগফলকে এক হাজার দ্বারা গুণ করলে স্থুল জন্ম হার পাওয়া যায়।

নির্দিষ্ট সনে নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা
-- x ১০০০
উক্ত সনের মাঝামাঝি সময়ে ঐ নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় মোট জনসংখ্যা

২। স্থুল মৃত্যু হার (Crude Death Rate-CDR)

কোন দেশে বা ভৌগলিক এলাকায় নির্দিষ্ট বছরে জন্যসংখ্যার প্রতি এক হাজারে যে ক'জন মারা যান সেই সংখ্যাকে ঐ এলাকার স্থুল মৃত্যু হার বলা হয়। এক বছরের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যাকে উক্ত বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ঐ ভাগফলকে এক হাজার দ্বারা গুণ করলে স্থুল মৃত্যু হার পাওয়া যায়।

কোন ভৌগলিক এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সনের মোট মৃত্যুর সংখ্যা
-- x ১০০০
উক্ত সনের মাঝামাঝি সময়ে ঐ নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার মোট জনসংখ্যা

৩। স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (Natural Rate of Increase-NRI)

স্থুল জন্ম হার ও স্থুল মৃত্যু হারের পার্থক্যকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বলা হয়। স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার সাধারণতঃ শতকরা হিসেবে নির্ণয় ও ব্যবহার করা হয় যেমন:

কোন ভৌগলিক এলাকায় ১৯৮৫ সালের স্থুল জন্ম হার-উক্ত ভৌগলিক এলাকায় ১৯৮৫ সালের স্থুল মৃত্যু হার

-- x ১০০

১০০০

৪। শিশু মৃত্যু হার (Infant Mortality Rate-IMR)

কোন দেশে বা নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় নির্দিষ্ট বছরে প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে অনুর্ধ্ব এক বছর বয়সের যে ক'জন শিশু মৃত্যুবরণ করে সেই সংখ্যাকে শিশু মৃত্যু হার বলা হয়।

নির্দিষ্ট সনে কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় অনুর্ধ্ব এক বছর বয়সের শিশু মৃত্যুর মোট সংখ্যা
-- x ১০০০
উক্ত ভৌগলিক এলাকায় উক্ত সনের জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মোট সংখ্যা

৫। মাতৃ মৃত্যু হার (Maternal Mortality Rate-MMR)

কোন দেশে বা ভৌগলিক এলাকায় প্রতি বছরে প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্মদান করতে গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবকালীন সময় অথবা প্রসবের পর ৪২ দিনের মধ্যে যে ক'জন প্রসূতি মা মারা যায় সেই সংখ্যাকে মাতৃ মৃত্যু হার বলে।

নির্দিষ্ট সনের কোন ভৌগলিক এলাকায় মোট প্রসূতীর মৃত্যুর সংখ্যা
--- x ১০০০
উক্ত সনের ঐ ভৌগলিক এলাকায় জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মোট সংখ্যা

৬। নবজাতকের মৃত্যু হার (Neonatal Mortality Rate-NMR)

কোন দেশে বা ভৌগলিক এলাকায় কোন নির্দিষ্ট বছরে প্রতি এক হাজারে জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে যে ক'জন শিশু মৃত্যু ২৮ দিন বা তার কম বয়সে ঘটে সেই সংখ্যাকে নবজাতকের মৃত্যু হার বলে।

নির্দিষ্ট সনে কোন ভৌগলিক এলাকায় নবজাতকের মৃত্যুর মোট সংখ্যা
--- x ১০০০
উক্ত সনের ঐ ভৌগলিক এলাকায় জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মোটসংখ্যা

৭। মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate-TFR)

কোন দেশে বা ভৌগলিক এলাকায় একজন মহিলা কোন নির্দিষ্ট বছরে বিরাজমান বয়ঃক্রমিক প্রজনন হার অনুযায়ী তার সমগ্র প্রজননকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৫-৪৯ বছর পর্যন্ত গড়ে যে ক'জন সন্তানের জন্ম দেবেন সেই সংখ্যাকে মোট প্রজনন হার বলা হয়।

মোট প্রজনন হার অতি প্রয়োজনীয় পরিমাপ। বর্তমানে মহিলারা প্রতি জনে কতজন সন্তান জন্ম দেন, এটি তার হিসাব। মোট প্রজনন হার নির্ণয়ের মাধ্যমে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। মোট প্রজনন হার নির্ণয়ের জন্য বয়ঃক্রমিক প্রজনন হার জানা প্রয়োজন হয়।

৮। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর শতকরা হার (Contraceptive Prevalence Rate-CPR)

সাধারণত: ১৫-৪৯ বছর বয়সী এবং বর্তমানে বিবাহিত দম্পতিদের প্রতি একশত জনের মধ্যে যে ক'জন দম্পতি নিয়মিতভাবে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন সেই সংখ্যাকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর শতকরা হার বা সিপিআর বলা হয়। উল্লেখ্য যে, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের শতকরা হার বা সিপিআর নির্ণয়ের সময় ১৫-৪৯ বছর বয়সী বিবাহিত মহিলাকে দম্পতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নির্দিষ্ট সনে কোন ভৌগলিক এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারকারী দম্পতির সংখ্যা
--- x ১০০
উক্ত সনে ঐ ভৌগলিক এলাকায় সক্ষম দম্পতির মোট সংখ্যা (সাধারণত: ১৫-৪৯ বছর বয়সের বিবাহিত মহিলার সংখ্যা)

৯। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (Contraceptive Acceptance Rate-CAR)

সাধারণত: ১৫-৪৯ বছর বয়সী এবং বর্তমানে বিবাহিত দম্পতিদের প্রতি একশত জনের মধ্যে যে কতজন দম্পতি বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিচ্ছেন তাকেই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার বলা হয়। এই হার সর্বদা সিপিআর এর চেয়ে বেশী থাকে। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে এই সংজ্ঞাটিও ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাঠ-২
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
সাংগঠনিক কাঠামো

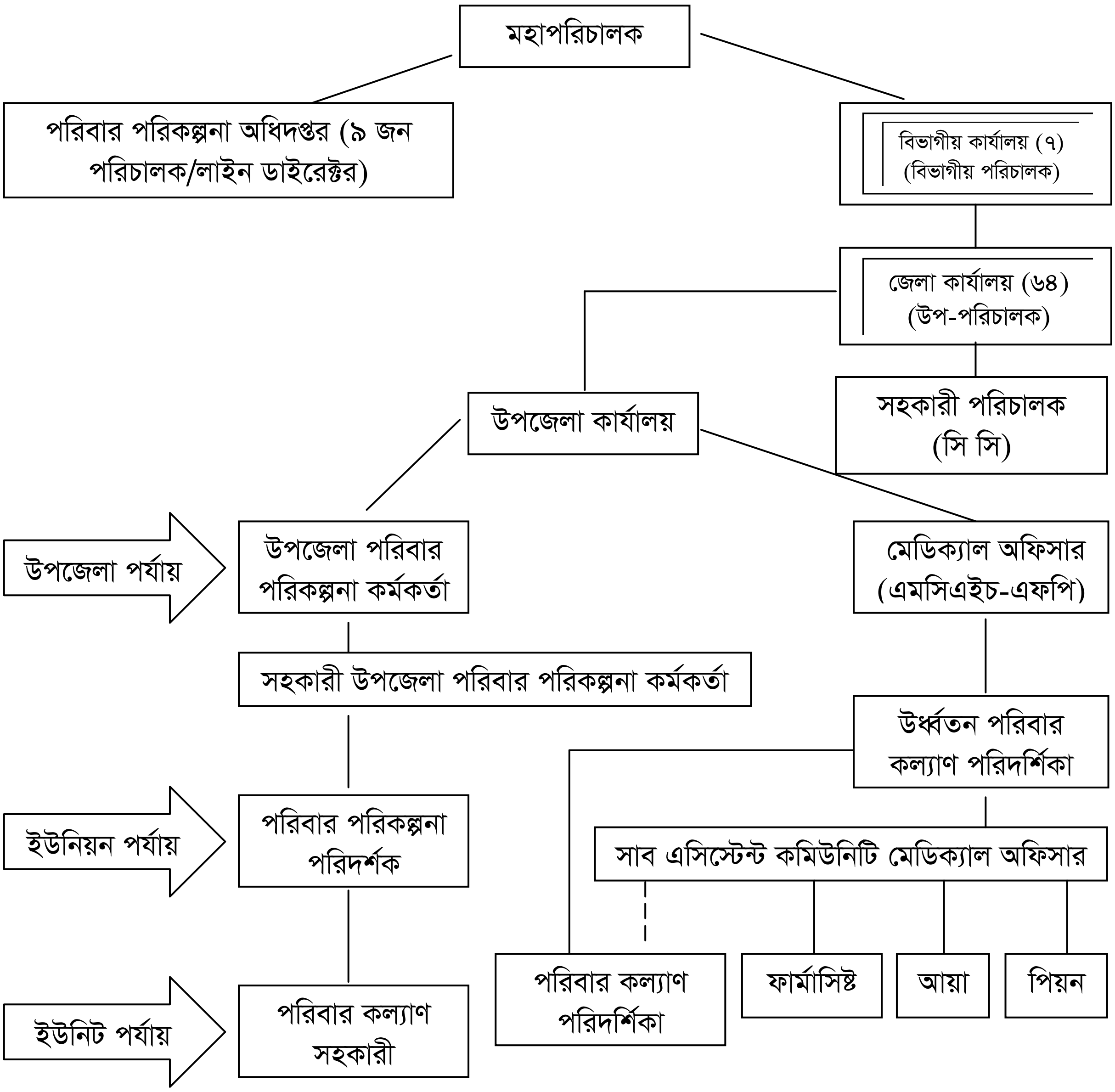

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য
সেবা অবকাঠামো

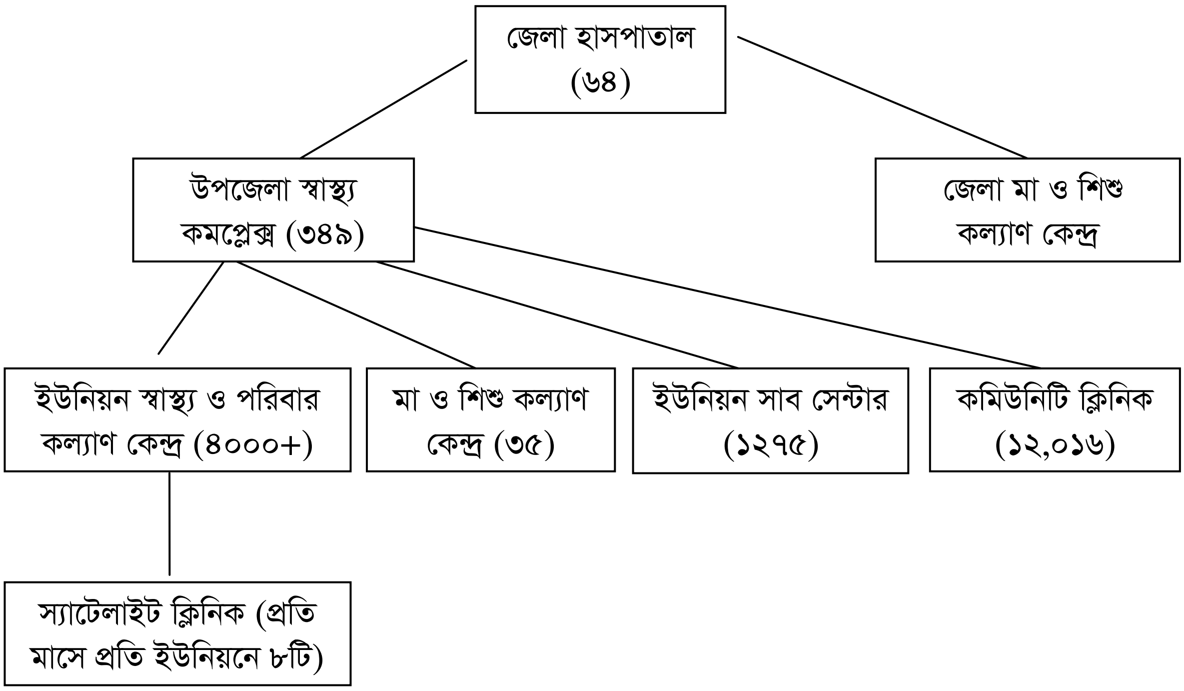

পাঠ-৩
পরিবার পরিকল্পনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা, পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা ও বাঁধাসমূহ

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

WHO এর সংজ্ঞা

দম্পতিগণ স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে যে উপায়ে তাদের সন্তান সংখ্যা ও সন্তানদের বয়সের ব্যবধান বজায় রাখতে সক্ষম হয় তাকেই "পরিবার পরিকল্পনা" বলা হয়ে থাকে। এটা সম্ভব হয় গর্ভধারণ না করে অথবা দেরীতে গর্ভধারণ করে।

"জন্মনিয়ন্ত্রণ" শব্দটি পরিকল্পিত পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব অথবা গর্ভধারণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিবার পরিকল্পনার প্রতিশব্দ হিসেবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি শব্দই দম্পতিদের গর্ভের বিরতি বা নিয়ন্ত্রণ এবং যাদের কাঙ্খিত গর্ভধারণের অসুবিধা রয়েছে তাদের সাহায্যার্থে ব্যবহৃত সকল সেবা প্রদান কর্মসূচীকে সাধারণভাবে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণ জন্ম নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় কোন দম্পতির বেশী সন্তান গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া।

পরিবার পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে-

- অনাকাঙ্খিত জন্ম পরিহার করা
- কাঙ্খিত জন্ম ঘটানো
- জন্মের ব্যবধান (বিরতি) নিয়ন্ত্রণ করা এবং দুই গর্ভের মাঝে ৩ বছরের (কমপক্ষে ২ বছর) ব্যবধান নিশ্চিত করা।
- মহিলাদের উপযুক্ত বয়সে (২০-৩৫ বৎসর) সন্তান জন্মের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- বন্ধ্যাত্বের পরামর্শ ও চিকিৎসা।

পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

এক বা একাধিক কারণ একজন দম্পতিকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা অথবা তাদের জন্মের ব্যবধান নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী করে তুলে।

১। স্বাস্থ্যগত কারণ ঃ

(ক) পরিবার পরিকল্পনা মায়ের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে

- দুই গর্ভের মাঝে বিশ্রামের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- সন্তান প্রসবে যে শারীরিক শক্তি ক্ষয় হয় তা পুনঃসঞ্চয়ে সাহায্য করে।
- গর্ভধারণের জটিলতা কমায়।
- মাতৃ মৃত্যু ও অসুস্থতা কমায়।
- অপুষ্টি থেকে রক্ষা করে।
- অল্প বয়স্ক মহিলা (২০ বছরের নিচে) অথবা ৩৫ বছরের উপরের মহিলাদের গর্ভরোধ করে, এই সব মহিলা গর্ভবতী হলে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে।
- উপরোক্ত বিষয়গুলো একত্রিত হয়ে গর্ভাবস্থায় মায়ের মৃত্যু কমায় এবং সাধারণভাবে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখে।

(খ) পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্যবান শিশু নিশ্চিত করে

দেরীতে গর্ভবতী হলে মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় ফলে শিশু বেশী বুকের দুধ পায় এবং ভাল পুষ্টি পায়। মা সুস্থ ও সবল থাকে এবং ভাল খাবার গ্রহণের ফলে ভ্রুণ ভালভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে জন্মের সময় বাচ্চার ওজন বেশী হয় এবং শিশু স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকে।

- মা পুনরায় দেরিতে গর্ভবতী হওয়ার নিশ্চয়তায় শিশু বিশেষ যত্ন পায় ও ভালভাবে বৃদ্ধি লাভ করে।
- অপুষ্টি থেকে রক্ষা করে।
- ঘন ঘন বাচ্চা হলে রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

(গ) পরিবার পরিকল্পনা বড় সংসারের ভরণপোষণের দুশ্চিন্তা ও বেশী কাজের ঝামেলা থেকে মা বাবাকে রক্ষা করে।

(ঘ) ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়ার সামর্থ্য ও সুযোগ বাড়ায়।

২। অর্থনৈতিক কারণ ঃ

পরিবার পরিকল্পনা নিম্নলিখিতভাবে জনগণকে সাহায্য করে-

(ক) দরিদ্র হওয়া থেকে রক্ষা করে। যেমন- দরিদ্র পরিবারে যদি ছেলে মেয়ে বেশী থাকে তবে তাদের অপুষ্টিজনিত কারণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না এবং খাদ্য ও ঔষধের জন্য বেশী টাকা খরচ হয়।

(খ) ছেলে-মেয়ে সংখ্যায় কম হলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়। কারণ একই সম্পদ দিয়ে কম সংখ্যক ছেলে মেয়েকে ভালভাবে ভরণ পোষণ করা যায়।

(গ) অনেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হওয়া প্রতিরোধ করে।

৩। পারিবারিক সুখ ঃ

পরিবার পরিকল্পনা নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করে-

(ক) পারিবারিক জীবনে সুখ আনে-বেশী সাহায্য পাওয়া যায়, অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের ভয় কমে যায়, মানসিক প্রশান্তি আসে।

(খ) প্রতিটি শিশুকে লালন পালনের জন্য বেশী সময় ব্যয় করা যায়।

(গ) বাড়িতে অতিরিক্ত লোকের ভীড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(ঘ) বেশী সন্তানের বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪। সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ ঃ

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যা হয় না।

(ক) অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও অতিরিক্ত ভিড় পরিহারে সাহায্য করে।

(খ) অসামাজিক কার্যকলাপ হ্রাস পাবে।

(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতিকে সাহায্য করে।

(ঘ) প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর চাপ কমায় যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নষ্ট হচ্ছে।

(ঙ) রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে না।

৫। মহিলা কল্যাণ ঃ

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ একজন মহিলাকে বাড়ির বাহিরে যাওয়ার, যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব স্থাপন এবং পারিপার্শ্বিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। এক্ষেত্রে মহিলা কি ধরনের জীবন যাপন করবে তা পছন্দ করার সুযোগ বৃদ্ধি করে।

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- **অজ্ঞতা-** বাংলাদেশে প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জনগণের পূর্ণজ্ঞান নেই।
- **অশিক্ষা-** অশিক্ষার কারণে উৎসাহিত নয়। লেখা পড়া না থাকায় বিভিন্ন পোষ্টার, প্যামপ্লেট ইত্যাদি পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।
- **কু-সংস্কার-** নানা ধরনের কুসংস্কার বাংলাদেশে রয়েছে। যেমন- টিউবেকটমী করলে মরার পরে জানাজা পড়া হয় না, লাশ মাটি দেয়া হয় না। অথবা ইনজেকশন বা আইইউডি নেয়ার পরে মাসিকের সময় বাদে অন্য সময় ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হলে কোরান শরীফ পড়া যায় না, নামাজও পড়া যায় না ইত্যাদি।
- **কৃষ্টিগত-** বাল্য বিবাহ (অল্প বয়সে বিবাহ) আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। এই প্রচলিত নিয়মের জন্য মহিলাদের প্রজননকাল ইতিপূর্বে অনেক দীর্ঘ ছিল। এটাও বিশ্বাস করা হয় যে ছেলেরা পিতার পরিচয়ে বংশ বয়ে নিয়ে যাবে। সেজন্য বেশী ছেলে হওয়ার একটা তীব্র আকাংখা থাকে যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে বংশ টিকে থাকবে।
- **সামাজিক-** বাংলাদেশের সমাজে যদি একজন মহিলা বিবাহের ২-৩ বছরের মধ্যে গর্ভবতী না হয় তবে তাকে বন্ধ্যা বলে সন্দেহ করা হয়। বন্ধ্যা মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা খুবই নিম্ন (তাদের দুষ্ট আত্মার সাথে তুলনা করা হয়)।
- **অর্থনৈতিক-** বাংলাদেশী সমাজে ছেলে সন্তানকে অর্থনৈতিকভাবে খুব মূল্যবান মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, ছেলেরাই বাবার পেশাকে বেছে নেবে। বিশেষ করে কৃষি কাজে এবং বৃদ্ধ বয়সে ছেলেরাই পিতা-মাতাকে সাহায্য ও দেখাশুনা করবে।
- **ধর্মীয়-** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিতে পাপ মনে করা হয়। শিশু জন্মকে আল্লাহর আশীর্বাদ মনে করা হয় এবং এটা প্রতিরোধের যে কোন প্রচেষ্টাকে পাপ মনে করা হয়। যদিও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকে সমর্থন করে তথাপি এগুলো বহুলভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নি।
- **পরিবেশগত-** বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক দেশের তুলনায় অধিক। সেজন্য পিতা-মাতা নিশ্চিত নন যে তাদের ছেলে মেয়ে অনেক দিন বেঁচে থাকবে। এ কারণে পরিবারের বেশী সন্তান নেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

- **সামগ্রীগত-** দেখা গেছে যে, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সহজভাবে পাওয়া গেলে অনেক দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী হন। কিন্তু তারা সহজলভ্য সেবা পাচ্ছেন না বলে অনেকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। এ সমস্ত দম্পতিকে সেবা প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ

প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করার উপায়গুলো নিম্নে দেয়া হলোঃ

- স্বাস্থ্য কর্মীগণ দ্বারা মানসম্পন্ন সেবাদান প্রদান।
- সঠিক ও সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার।
- জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা।
- রেডিও, টেলিভিশন, পোষ্টার, প্যামপ্লেট ইত্যাদির মাধ্যমে বার্তাগুলো প্রচার করা।
- প্রতিটি ঘরে বার্তা আরও সুষ্ঠুভাবে পৌছে দেয়ার জন্য সুদক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী গড়ে তোলা।
- স্থানীয়ভাবে জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ও ধর্মীয় লোকদের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে আরও বেশী সম্পৃক্ত করা।
- ধর্মীয় লোকদের কথা ধর্মভীরু জনসাধারণ বেশী প্রাধান্য দেন, অতএব কোরান শরীফের বাণীগুলো যদি তাদের মুখ থেকে প্রচারিত হয় তাহলে অন্তত: গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা সম্ভব হবে। যেমন- পবিত্র কোরান শরীফে উল্লেখ আছে ‘অধিক সন্তান এবং কম সম্পদ তোমাদের জন্য ক্ষতিকর ও দুর্ভাগ্য স্বরূপ।’

পাঠ-৪

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ

মহিলা ও পুরুষের ব্যবহারের জন্য অনেক ধরনের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো প্রধানতঃ ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১। ক্লিনিক্যাল ঃ (ক) ইনজেকশন (খ) আইইউডি (গ) ইমপ্ল্যান্ট এবং (ঘ) স্থায়ী পদ্ধতি

২। নন-ক্লিনিক্যাল ঃ (ক) কনডম (খ) খাবার বড়ি এবং (গ) সনাতন/ ন্যাচারাল পদ্ধতি, যেমন-

- বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো
- নিরাপদ কাল পদ্ধতি
- প্রত্যাহার বা আযল
- সহবাস থেকে বিরত থাকা

আবার পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সমূহকে স্থায়ীত্বের উপর ভিত্তি করে ২ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

ক) স্থায়ী পদ্ধতি ঃ

- মহিলাদের জন্য টিউবেকটমী (Tubectomy)
- পুরুষদের জন্য ভ্যাসেকটমী (Vasectomy)

খ) অস্থায়ী পদ্ধতি ঃ

- খাবার বড়ি
- কনডম
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন
- আইইউডি
- ইমপ্ল্যান্ট

খাবার বড়ি, ইনজেকশন ও ইমপ্ল্যান্টকে ''হরমোন জাতীয়'' পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিও বলা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ ঃ

কোন দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য নিম্নের ধাপসমূহের কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে। ধাপগুলো হলোঃ

ক) তথ্য প্রদান

খ) উদ্বুদ্ধকরণ

গ) কাউন্সেলিং

ঘ) ক্লায়েন্ট বাছাইকরণ

ঙ) পদ্ধতি প্রদান

চ) রেকর্ড সংরক্ষণ

ছ) ফলো আপ বা অনুসরণ

জ) পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা

ঝ) জটিলতার চিকিৎসার জন্য সঠিক সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট রেফার করা।

ক) তথ্য প্রদান/শিক্ষা ঃ

পরিবার পরিকল্পনা কি, এর উপকারিতা কি, কিভাবে পরিবার পরিকল্পনা করা যায়, উহার কি কি পদ্ধতি আছে? কোথা থেকে পাওয়া যায় তা বিভিন্ন পোষ্টার, লিফলেট, ফ্লিপচার্ট ও ব্যক্তিগত আলোচনা এবং সম্ভব হলে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে দম্পতিদের এ সকল তথ্য প্রদান/শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন।

খ) উদ্বুদ্ধকরণ ঃ

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি দম্পতিদের জানানোর পর তাদেরকে যে কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য গ্রহীতাকে কোন বিষয়ে অনুকুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহিত করা হয় তাকেই উদ্বুদ্ধকরণ বলা হয়।

গ) কাউন্সেলিং ঃ

কোন দম্পতি উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা স্বেচ্ছায় যে কোন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত হলে তাকে একটি সঠিক পদ্ধতি গ্রহণে সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য যে পরামর্শ প্রদান করা হয় তাকে কাউন্সেলিং বলা হয়। কাউন্সেলিং এর সময় প্রতিটি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। তারই আলোকে একজন গ্রহীতা স্বেচ্ছায় যে পদ্ধতিটি নিতে চান সেটাই তাকে দিতে হবে।
তবে প্রতিটি পদ্ধতিরই কিছু কিছু বিধি নিষেধ আছে। ঐ বিধি নিষেধের কারণে যদি তাকে উক্ত পদ্ধতিটি দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে তাকে বুঝিয়ে অন্য একটি পদ্ধতি বাছাইয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

ঘ) ক্লায়েন্ট বাছাইকরণ ঃ

কোন ক্লায়েন্ট কোন পরিবার পকিল্পনা পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত তা বাছাই করা প্রয়োজন। সে জন্য ক্লায়েন্টের মাসিকের ইতিহাস, সন্তান জন্মদানের ইতিহাস, বিভিন্ন রোগের ইতহাস, দৈহিক পরীক্ষা, প্রজননতন্ত্রের পরীক্ষা এবং প্রচলিত ল্যবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে ক্লায়েন্টকে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণের জন্য বাছাই করতে হবে।

ঙ) পদ্ধতি প্রদান ঃ

ক্লায়েন্ট স্বেচ্ছায় যে পদ্ধতি নিতে সম্মত হয়েছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ঐ পদ্ধতি গ্রহণে উপযুক্ত বলে সনাক্ত হয়েছেন কেবল তখনই ক্লায়েন্টকে সে পদ্ধতিটি সরবরাহ/প্রয়োগ করা যাবে।

চ) রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

কোন ক্লায়েন্টকে একটি পদ্ধতি সরবরাহ/প্রয়োগ করার পর তার যাবতীয় তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য হলো ক্লায়েন্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ, ফলোআপ বা অনুসরণ করা। কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার ব্যবস্থা প্রদান, জটিলতা দেখা দিলে তার চিকিৎসার জন্য রেফার করা এবং ড্রপ আউট হচ্ছে কি না তা নির্ণয় করা। তাছাড়াও একটি মাসিক প্রতিবেদন তৈরী করা ও প্রয়োজনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

ছ) ফলোআপ বা অনুসরণ ঃ

কোন ক্লায়েন্ট একটি পদ্ধতি গ্রহণ করার পর ক্লায়েন্টের অসুবিধা হচ্ছে কি না বা পদ্ধতিটি ছেড়ে দিয়েছে কি না বা অকৃতকার্য হয়ে কোন গর্ভধারণ হয়েছে কি না তা বিস্তারিত জানা।

পাঠ-৫
উদ্বুদ্ধকরণ

উদ্বুদ্ধকরণ (Motivation) কি?

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য গ্রহীতাকে কোন বিষয়ে যথাযথ তথ্য প্রদান সহকারে অনুকুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহিত করা হয় তাকেই উদ্বুদ্ধকরণ বলা হয়।

উদ্বুদ্ধকরণের গুরুত্ব

উদ্বুদ্ধকরণের এর গুরুত্ব অপরিসীম। কেবলমাত্র সঠিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমেই একজন মহিলা বা একজন পুরুষ অথবা গোটা পরিবার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন একজন মহিলা জন্মনিরোধক বড়ি অথবা আইইউডি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা এবং তার নিজের বেলায় প্রয়োজন কি না জানতে পারবেন তাহলেই কেবলমাত্র তিনি পদ্ধতিটি গ্রহণ করবেন এবং দীর্ঘদিন তার প্রয়োজন অনুযায়ী সে পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন।

উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্য

লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলা।

উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

- ক্লায়েন্টকে তার নিজের সম্পর্কে তথ্য, ক্লায়েন্টের নিজস্ব চাহিদা ও তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগিতা করা।
- ক্লায়েন্টের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেগ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দুরীকরণে সাহায্য-সহযোগিতা করা।
- সেবা সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্তটি যা ক্লায়েন্টর চাহিদা ও আকাঙ্খাকে পূরণ করতে সমর্থ হবে, সেই বিশ্বাস অর্জনে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা।

গ্রহণের (Adoption) বিভিন্ন পর্যায়

যে কোন ব্যক্তি যখন কোন নতুন ভাব/ধারণার সাথে পরিচিত হন তখন তা মানসিকভাবে গ্রহণ করতে তাকে বেশ কিছু পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। অনেকগুলি পর্যায় অতিক্রম করে ব্যক্তি নতুন বার্তা বা শিক্ষণীয় বিষয়কে গ্রহণ করেন। মানুষের এই মানসিক পর্যায়গুলোকে গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায় বলা হয়। কমিউনিটি প্যারামেডিককে অবশ্যই এই পর্যায়গুলো সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কোন ব্যক্তি সহসাই নতুন কোন অভিমত গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন না। তাই যোগাযোগকারীকে অপেক্ষা করতে হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য তাকে বিভিন্ন যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণের কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

গ্রহণের পর্যায়গুলো হলো ঃ

১) কোন ধারণা নেই

২) সচেতন হওয়া (Aware)

৩) আগ্রহী হওয়া (Interested)

৪) মূল্যায়ণ করা (Evaluate)

৫) পরীক্ষণ করা (Test/Trial)

৬) গ্রহণ করা (Adopt)

সচেতন হওয়া ঃ

মানুষ যখন প্রথমে কোন ভাব বা বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন তখন এর গুণগত বিশেষত্ব সম্পর্কে তার তেমন কোন জ্ঞান থাকে না। তাই এটি তার জন্য মঙ্গলজনক কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন না। সচেতনতার এই পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞান প্রদান করে তাকে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায়।

আগ্রহী হওয়া ঃ

এই পর্যায়ে এসে মানুষ শুধু বিষয় বা ভাবটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেই সন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি এ সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে চান যা তার আগ্রহকে তৃপ্ত করতে পারেন। যেমন- এটা কি? এটা কি করে? কিভাবে এটা কাজ করে? তিনি এ সম্পর্কে শুনতে চাইবেন, জানতে চাইবেন অথবা এ বিষয়ে কিছু পড়তে চাইবেন। এই পর্যায়ে যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণের কৌশল এমনভাবে সাজাতে হবে যা তার এইসব আগ্রহকে তৃপ্ত করতে সক্ষম হবে। আর এইভাবে বার্তাকে/ বিষয়কে গ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

মূল্যায়ন করা ঃ

এই পর্যায়ে তিনি ভাল না খারাপ তা মূল্যায়ন করতে চাইবেন। তাই তিনি বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং এর ব্যবহারিক দোষগুণ সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করবেন। যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলকে গ্রহণ পর্যায়ের এই সব চাহিদা অনুযায়ী সাজাতে হবে।

পরীক্ষণ করা ঃ

এরপর যদি তিনি মনে করেন যে, বিষয়টি ভাল এবং তার জন্য মঙ্গলজনক, তখন তিনি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে চাইবেন। এজন্য বেশ কিছু সময় লাগতে পারে। এক্ষেত্রে সঠিক ও যথাযথ কৌশল গৃহিত হলে বিষয়কে গ্রহণের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

গ্রহণ করা ঃ

মূল্যায়ণ ও পরীক্ষণের পর যদি বিষয়টি তার মন:পুত এবং মঙ্গলজনক মনে হয় তাহলে তিনি এ বিষয়টি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং অপরকে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।

একজন যোগাযোগ কর্মীর জন্য গ্রহণের প্রতিটি স্তরই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক এক স্তরে উদ্দীষ্ট জনগণের প্রশ্ন এবং প্রয়োজন এক এক রকম। সব স্তরেই তাকে ব্যক্তিগত মানসিক সহযোগিতা যোগানো যোগাযোগ কর্মীর দায়িত্ব। যোগাযোগ কর্মী যে এলাকায় কাজ করতে যাচ্ছেন, সেখানে তাকে প্রাথমিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে হবে যে কোন ক্লায়েন্ট কোন স্তরে আছেন।

যদি কোন ব্যক্তি পর্যায়গুলো একের পর এক অতিক্রম করে তবেই উদ্বুদ্ধ হন। তবে কেউ দ্রুত আবার কেউ ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ হন। মানুষের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবেশ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে গ্রহণ প্রক্রিয়ার গতি।

কেইস ষ্টাডি ঃ

রহিমা বেগম, বয়স ২২ বৎসর। স্বামী একজন কৃষক। দুই মাস আগে তাদের একটি ছেলে হয়েছে। রহিমা গর্ভাবস্থায় কমিউনিটি প্যারামেডিক দ্বারা গর্ভকালীন যত্ন নিয়েছেন। সেই সময় বাচ্চা হওয়ার পর দেড় মাস বয়স থেকে বাচ্চাকে ৮টি রোগের (যেমন- যক্ষ্মা, হাম, পোলিও, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিং কাশি, হেপাটাইটিস-বি এবং হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি) বিরুদ্ধে টিকা দিতে হবে তা জেনেছিলেন। কিন্তু বাচ্চার বয়স দুই মাস হয়েছে অথচ এখনও টিকা দেননি তা শুনে পাশের বাড়ির মহিলা ছফুরা খাতুন বললেন তার বাচ্চাকে তিনি দেড় মাস বয়সেই সব টিকা দিয়েছেন। তখন রহিমা বেগম চিন্তা করলেন যে, গর্ভাবস্থায়

কমিইনিট প্যারামেডিক আপা তাকে এসব কথা বলেছিলেন। অথচ তিনি এ কথাগুলোর তেমন গুরুত্ব দেন নাই। এখন তিনি চিন্তিত এবং অনুতপ্ত। তাই ছফুরা খাতুনের কাছে আবারও টিকা দেয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। যেমন- টিকা দিলে কোন অসুবিধা হয় কি না, কোথায় গিয়ে টিকা দিতে হয়, কোন খরচ লাগে কি না, ছফুরা খাতুন তার সব প্রশ্নের উত্তর দেন এবং যারা টিকা দেন তাদের ব্যবহারের প্রশংসা করেন। ছফুরা খাতুনের কথা শুনে রহিমা বেগমের মনে বিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু তবুও তিনি আশ্বস্ত হন নাই। আরও কয়েকজনের কাছে টিকার বিষয় জেনে নেন। সকলেই তাকে উৎসাহ দেন বাচ্চাকে টিকা কেন্দ্রে নেয়ার জন্য। তার স্বামীও অনেকের কাছে এই বিষয় শুনেছেন। তিনিও আগ্রহী। এরপর রহিমা বেগম স্বামীসহ নিকটবর্তী টিকা কেন্দ্রে গিয়ে বাচ্চাকে টিকা দিয়ে আনেন।

ঘটনাটি পড়ে প্রত্যেক প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করুন ঃ

১। কমিউনিটটি প্যারামেডিক রহিমাকে বাচ্চার টিকা সম্বন্ধে কি কি বার্তা দিয়েছিলেন? এই বার্তাসমূহ গ্রহণের কোন পর্যায়ের বার্তা ছিল?

২। কি কি বার্তা ও কার বার্তায় রহিমা বেগম আগ্রহী পর্যায়ে আসে?

৩। রহিমা বেগম মূল্যায়ণ পর্যায়ে কি করেন?

৪। কি কি বার্তা রহিমা বেগমকে মূল্যায়ন পর্যায় থেকে গ্রহণ পর্যায় আনে?

পাঠ-৬
কাউন্সেলিং

পরিবার পরিকল্পনায় কাউন্সেলিং

পরিবার পরিকল্পনায় সেবাদান পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং (Counseling) ও অবহিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ বস্তুতঃ একটি ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি যারা গ্রহণ করেন তারা সবাই সুস্থ মানুষ। গ্রহণকারী কোন পদ্ধতি নিবেন, তার ভিত্তি হলো কাউন্সেলিং এবং অবহিতকরণ। সুতরাং কিভাবে তাদেরকে বোঝাতে হবে বা কিভাবে তাদের পরামর্শ দিতে হবে, তা সেবা প্রদানকারীর জানা প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন কিছু গ্রহণ, বর্জন, পছন্দ বা অপছন্দের স্বাধীনতা আছে। পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের বেলায়ও এই সত্যটি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাউন্সেলিং একটি অত্যন্ত সুচারু এবং অত্যাবশ্যকীয় যোগাযোগ প্রক্রিয়া। গ্রহীতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা এর উদ্দেশ্য নয়। বরং সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াসহ সকল তথ্য সঠিকভাবে বুঝিয়ে, গ্রহীতার সকল বৈশিষ্ট্য যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক ও উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে গ্রহীতাকে সহায়তা করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। পরামর্শদানের সময় গ্রহীতার সকল কথা ধৈর্য্য সহকারে শুনতে হবে এবং সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে হবে। আলোচনার সময় গ্রহীতার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তিনি সমস্ত বিষয় কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা তার মুখ থেকেই শুনতে হবে। কাজটি এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যেন গ্রহীতার ভয় ও সংকোচ না থাকে। সকল বিষয়ে বিস্তারিত ও সঠিক ধারণা দেয়া হলে গ্রহীতার সংখ্যা কম থাকলেও তাদের পদ্ধতি ব্যবহারের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হবার সম্ভাবনা থাকে।

একজন ইচ্ছুক গ্রহীতা ক্লিনিকে আসার পূর্বে সব কিছু নাও জানতে পারেন বা তাকে যে ব্যক্তি নিয়ে আসেন তিনি সব কথা তাকে নাও বলতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় গ্রহীতাকে একটা ইনজেকশন দেয়া হবে বা কোন কিছু কাটা হবে না এসব বলে অর্থাৎ সঠিক তথ্য না জানিয়ে নিয়ে আসা হয়। তবে যে কথা বলেই আনা হোক না কেন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করার আগে অবশ্যই তাকে সেই পদ্ধতির ভাল-মন্দ সব দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো প্রয়োজন।

কাউন্সেলিং এর বাংলা অর্থ পরামর্শ। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র পরামর্শ বললে বিষয়টির সবটুকু বোঝা যায় না। তাই কাউন্সেলিংই সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। কাউন্সেলিং সামগ্রিক অর্থে একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন গ্রহীতা খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করে, ভাল-মন্দ জেনে পরিবার পরিকল্পনার যে কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আবার কাউন্সেলিং এর পর কোন ব্যক্তি কোন পদ্ধতি নাও গ্রহণ করতে পারেন।

তবে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক, তা হল কাউন্সেলিং সেশন শেষে ঐ মূহুর্তে গ্রহীতা যদি কোন পদ্ধতি গ্রহণে অনিচ্ছুক হন, তাহলে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে কাউন্সেলিং সেশনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। কেননা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে কাউকে বাধ্য করার কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ সব কিছু জেনে শুনে গ্রহীতা কোন পদ্ধতি নিলে তা দীর্ঘদিন ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে।

কাউন্সেলিং ও অবহিতকরণ ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা দলে দেয়া যায়। এসব নির্ভর করে কারা কোন অবস্থায় কাউন্সেলিং করবেন তার উপর। পরিবার পরিকল্পনার কাউন্সেলিং এ প্রথমে সাধারণতঃ দলভিত্তিক সব পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি পর্যায়ে, যিনি যে পদ্ধতি গ্রহণ করবেন সেই পদ্ধতি সম্পর্কে তাকে বোঝাবেন এবং অবহিত করবেন।

অবহিতকরণের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো গ্রহীতাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করা এবং অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা যাতে তিনি পদ্ধতি গ্রহণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অবহিতকরণের ফলে গ্রহীতা বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারেন। একজন ভাল কাউন্সেলর এর উচিত গ্রহীতার পারিপার্শ্বিকতার অবস্থা চিন্তা করা, তাদের অনুভূতির প্রতি সাড়া দেয়া এবং গ্রহীতার আস্থা অর্জন করা। তারা প্রায়ই ভয়, দ্বিধা ও শংকা নিয়ে আলোচনা করতে আসেন। প্রায়ই গ্রহীতারা অনিশ্চয়তায় ভোগেন। একজন দক্ষ কাউন্সেলর একজন গ্রহীতার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে দিয়ে তার সব ভয় ও আশংকা দূর করে দিতে পারেন। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে এবং গ্রহীতার কথা ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে শুনে একজন কাউন্সেলর তার অনুভূতি বুঝতে পারেন এবং গ্রহীতা নিজস্ব পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে একটা সঠিক পদ্ধতি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

কার্যকরী কাউন্সেলিং এর জন্য যা প্রয়োজন

কার্যকরী কাউন্সেলিং এর জন্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়গুলো হলো ঃ

১। দক্ষ কাউন্সেলর (Counselor)

২। কাউন্সেলিং এর উপযোগী পরিবেশ এবং

৩। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ওপর খোলাখুলি এবং দ্বিমুখী আলোচনা।

কাউন্সেলিং এর এ্যপ্রোচ হিসেবে GATHER শব্দটি ব্যবহার করা যায়-

G = Greet Clients (শুভেচ্ছা বিনিময় করা)- গ্রহীতাকে শুভেচ্ছা জানানো।

A = Ask and Assess Need (চাহিদা নির্ণয় করা)- আগত গ্রহীতা কি ধরনের সেবা চান তা জানতে চাওয়া এবং তার চাহিদা নির্ণয় করা।

T = Tell about Services (সেবা সম্পর্কে গ্রহীতাকে বলা)- গ্রহীতাকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে বলা।

H = Help (সেবা বেছে নিতে গ্রহীতাকে সাহায্য করা)- পদ্ধতি বেছে নিতে গ্রহীতাকে সাহায্য করা।

E = Explain (বাছাইকৃত সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা)- পছন্দকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা।

R = Return for follow-up or Refer (ফলোআপের জন্য পুনরায় আসতে বলা অথবা রেফার করা)- ফলো-আপ এ আসতে বলা বা প্রয়োজনে গ্রহীতাকে সুচিকিৎসার জন্য অন্যত্র প্রেরণ করা।

কাউন্সেলিং এর সময় তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের উপর লক্ষ্য রেখে সেবা গ্রহণে গ্রহীতাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে কোন সেবা নেয়ার আগে এবং পরে পরামর্শদান করলে সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

আদর্শ কাউন্সেলর

মনে রাখা আবশ্যক যে, একজন আদর্শ কাউন্সেলর এর উপর ক্লিনিকের সুনাম, গ্রহীতার সন্তুষ্টি এবং গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে, সুতরাং-

- একজন ভাল কাউন্সেলর- এর প্রধান গুণ হলো সকল গ্রহীতাকেই সমান মর্যাদা দেয়া, তাদের মতামত এবং অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেয়া। গ্রহীতার আনন্দ, বেদনা, বিরক্তি, লজ্জা এবং রাগের অভিব্যক্তি সম্পর্কে ভালভাবে উপলব্ধি করা এবং সেই অনুযায়ী আলোচনার বিষয় বা ধারা নির্ধারণ করা।
- ধৈর্যশীল, বিনয়ী, নমনীয়, সহযোগী এবং সহনশীল মনোভাব পোষণ করা। গ্রহীতা যাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। নিজে বেশী বলার চেয়ে গ্রহীতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, বিশেষ কোন পদ্ধতির ভাল দিকগুলো সম্পর্কে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করা।
- সহজ সরল শব্দের ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং যথাসম্ভব ইংরেজী শব্দ পরিহার করা। সবচেয়ে ভাল হয় যদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাসিক ঋতুস্রাব, যৌন মিলন, গর্ভধারণ, গর্ভপাত এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, উপকরণ সম্পর্কে গ্রহীতা যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে সেটা জেনে নিয়ে সেই ভাষা ব্যবহার করা।

উপযোগ পরিবেশ ঃ

- কাউন্সেলিং এর কক্ষ যেন একটু নিরিবিলি হয়। অর্থাৎ আলোচনার গোপনীয়তা যেন বজায় থাকে।

- হস্তক্ষেপমুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ অন্য লোকের কারণে অকারণে সেখানে না যাওয়া এবং কাউন্সেলিং সেশন সংক্ষিপ্ত করে তাড়াতাড়ি গ্রহীতাকে পাঠানোর তাগিদ না দেয়া।
- প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য বা শিক্ষা উপকরণ (পোষ্টার, ফ্লিপচার্ট, ফোল্ডার বা স্লাইড) প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনার একঘেয়েমী দুর করা।
- পুরো কাউন্সেলিং সেশন বা আলোচনার সময়টুকুতে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা।

খোলাখুলি আলোচনা ঃ

কি আলোচনা হবে, কতক্ষণ আলোচনা হওয়া উচিত সেটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয় এবং এর জন্য নির্দিষ্ট সময় আগে থেকে বরাদ্দ করে রাখা উচিত নয়। খোলাখুলি আলোচনার সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন বাদ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখাঃ-

- প্রথমে গ্রহীতাকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে, সে কার সঙ্গে ক্লিনিকে এসেছে, বাড়ী থেকে কিভাবে এসেছে, আসতে কোন কষ্ট হয়েছে কি না, বাড়ীতে কে কে আছে, ছেলে মেয়ে ক'জন, তারা কে কি করছে, এসব প্রসংগ দিয়ে আলোচনা শুরু করা।
- গ্রহীতা কারো সঙ্গে এলে তাকে কি বলে এনেছেন সেটা শোনা এবং যদি কোন পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলে থাকে, তা হলে সে সম্পর্কে কতটুকু বলা হয়েছে সেটা জানা।
- কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা না করা সম্পর্কে গ্রহীতার ইচ্ছাই যে শেষ কথা-এ ব্যাপারে নিশ্চিত করা।
- গ্রহীতা জন্মনিয়ন্ত্রণের কি কি পদ্ধতির কথা শুনেছেন বা ব্যবহার করেছেন অথবা ব্যবহার ছেড়ে দিলে তার কারণ জেনে নেয়া এবং অন্যান্য পদ্ধতির ভালো-মন্দ, ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে কি না সেটা জেনে নেয়া এবং থাকলে সেই সকল পদ্ধতির ভাল মন্দ দিক, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, জটিলতা, সফলতা ও ব্যর্থতা কতটুকু, সে সম্পর্কে আলোচনা করা।
- পদ্ধতি গ্রহণে গ্রহীতার মনে ভয় বা সন্দেহ আছে কি না এবং থাকলে সেটা কি ধরনের তা আলোচনা করা।
- অস্থায়ী বা স্থায়ী পদ্ধতি, তার কার্যকারিতা এবং কোথায় পাওয়া যাবে তা জানিয়ে দেয়া। গ্রহীতা আরো কিছু জানতে চায় কি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা।
- গ্রহীতাকে পরিবার পরিকল্পনায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে অবগত করে, অবহিত সম্মতিপত্রে (Informed Consent Form) লিখিত বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়ে স্বাক্ষর অথবা টিপসই নেয়া।
- আলোচনা শেষে গ্রহীতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তার সাথে কথা বলে ভাল লেগেছে একথা বলে পরবর্তী পর্যায়ে তাকে কোথায় যেতে হবে তা বলে দেয়া এবং সম্ভব হলে সেখানে পৌঁছে দিয়ে একটি কাউন্সেলিং সেশন শেষ করা।

পাঠ-৭

গ্রহীতা বাছাইকরণ

উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচন করতে হলে প্রথমে মহিলা/ পুরুষের ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে হবে। সাধারণতঃ দুই ধরনের ক্লায়েন্ট পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে আসেন।

- এক ধরনের ক্লায়েন্ট পদ্ধতি সম্পর্কে আগে থেকেই জানেন এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি পছন্দ করে কমিউনিটি প্যারামেডিকের নিকট হতে গ্রহণ করতে চান।
- আর কোনো কোনো ক্লায়েন্ট কোনো পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে কমিউনিটি প্যারামেডিক এর পরামর্শ অনুযায়ী কোনটা তাদের জন্য উপযুক্ত হবে সেই পদ্ধতি চান।

তাই কমিউনিটি প্যারামেডিকদের কর্তব্য হলো ঃ

- যে ক্লায়েন্ট তার পছন্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পদ্ধতি নিতে এসেছেন তা তিনি নিতে পারবেন কি না সেটা চেকলিস্ট অনুযায়ী ইতিহাস নেয়া, পরীক্ষা করা এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি দেয়া।
- আর যদি পদ্ধতি বাছাইকরণ তালিকা অনুযায়ী ক্লায়েন্ট তার পছন্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণের উপযুক্ত না হন তাহলে তাকে অন্য পদ্ধতির পরামর্শ ও সম্ভব হলে অন্য পদ্ধতি দিয়ে দেয়া।
- যে সকল ক্লায়েন্টের নির্দিষ্ট পদ্ধতি পছন্দ নেই, সেক্ষেত্রে কমিউনিটি প্যারামেডিকের দায়িত্ব হলো; যে কোনো ক্লায়েন্টকে সকল পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা এবং উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বাছাইকরণ সহায়ক তালিকা চেকলিস্ট (MEC) অনুযায়ী ইতিহাস নেয়া ও শারীরিক পরীক্ষা করা।
- তারপর সেই ক্লায়েন্টের উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার পর পদ্ধতি প্রদান করা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় কোন মহিলার জন্য কোন পদ্ধতি উপযোগী তার একটি নির্দেশিকা দেয়া হলো ঃ

কমিউনিটি প্যারামেডিকদের জন্য যে কোন ক্লায়েন্টের উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচনে সহায়ক তালিকা (MEC)

- প্রশ্নের উত্তর “হ্যাঁ” হলে শুধুমাত্র টিকা (√) চিহ্নিত দেয়া পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা যাবে।
- ডাক্তার বা পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা রোগীকে পরীক্ষা করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।
- আইইউডি পছন্দ করলে অভিজ্ঞ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বা ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করুন।
- কমিউনিটি প্যারামেডিক অবশ্যই স্তন পরীক্ষা করবেন।
- কমিউনিটি প্যারামেডিক অবশ্যই পি ভি পরীক্ষা করবেন।

- ডাক্তার বা কমিউনিটি প্যারামেডিক রোগীকে পরীক্ষা করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।
- কমিউনিটি প্যারামেডিক অবশ্যই স্তন পরীক্ষা করবেন।

কমিউনিটি প্যারামেডিকদের জন্য যে কোন ক্লায়েন্টের উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচনে সহায়ক তালিকা (MEC)

ইতিহাস সংক্রান্ত প্রশ্নমালা	**পদ্ধতির নাম**							
	খাবার বড়ি: স্বাভাবিক মাত্রা	খাবার বড়ি: (লো ডোজ/স্বল্পমাত্রা)	ইনজেকশন	আই ইউ ডি	কনডম	মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি	পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি	ইমপ্ল্যান্ট
আপনার কি প্রায়ই প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয়?								
প্রায়ই সংজ্ঞা হারান বা মুর্ছা যান কি?								
গত এক বছরে চোখ, চামড়া ও প্রস্রাব হলুদ হয়েছিল কি?								
অতিরিক্ত পিপাসা বোধ করেন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করেন?								
অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট হয় বা হাঁপিয়ে যান?								
স্তনে কোন চাকা অনুভব করেন?								
গত তিন মাসের মধ্যে মাসিক বন্ধ ছিল কি?								
আপনি কি সন্দেহ করেন যে আপনি গর্ভবতী?								
দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব বা সহবাসের পর কি রক্তক্ষরণ হয়?								
আপনার তলপেটে কি অনবরত ব্যাথা হয়?								
মাসিকের সময় ৩ দিনের বেশী সময় ধরে দৈনিক ৫ বারের বেশী মাসিকের কাপড় বদলাতে হয় কি?								
আপনার যোনিদ্বার দিয়ে দূর্গন্ধযুক্ত বা পুঁজযুক্ত স্রাব হয়?								
সিজারিয়ান অপারেশন এর দ্বারা আপনার প্রসব হয়েছিল কি?								
আপনার জরায়ু নীচে নেমে গিয়ে যোনিপথ দিয়ে বের হয়ে আসে?								
আপনি কি কখনো পায়ের পিছনে ফোলা								

শিরাযুক্ত মাংসপেশীতে প্রচন্ড স্থায়ী ব্যথা ও সঙ্গে জ্বরে ভূগেছেন?								
আপনার তলপেটে চর্মরোগ আছে?								
আপনার স্বামীর কি একজনের বেশী স্ত্রী আছে?								
আপনার বয়স ৪০ এর বেশী? আপনি কি ধুমপান করেন?								
মহিলার বয়স ৪৫ বছরের কম। ধুমপান করেন না।								
মহিলার বয়স ৪০ বছরের উপরে এবং ধুমপান করেন।								
আপনার ছোট বাচ্চার বয়স কত?								
ছোট বাচ্চার বয়স দেড় মাসের কম?								
ছোট বাচ্চার বয়স ৬ মাসের কম?								
আপনার কয়টা সন্তান হয়েছে?								
সন্তান হয় নি?								
১ টি সন্তান?								
২ জন সন্তান বা তার অধিক সন্তান?								
ক্লায়েন্ট রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন কি?								
ক্লায়েন্টের রক্তচাপ কেমন?								
১৪০/৯০- মিঃ মি. মার্কারী এর বেশী								
১৪০/৯০- এর কম								
পি ভি পরীক্ষার ফলাফল								
কোন অস্বাভাবিক কিছু নেই								
দুর্গন্ধযুক্ত বা পুঁজযুক্ত স্রাব আছে								
জরায়ূর মুখে ঘা আছে								
জরায়ূ নড়াচড়া করে না								
জরায়ূ নড়াচড়া করলে ব্যথা হয়								
জরায়ূর সাইজ স্বাভাবিকের চেয়ে বড়								
পেটে সিজারিয়ান অপারেশনের দাগ আছে								
পা পরীক্ষা করে দেখুন								
পায়ের পিছনে শিরা ফোলা								

বিঃ দ্রঃ

- 'হ্যা' হলে (√) চিহ্ন দিন এবং 'না' হলে (X) চিহ্ন দিন।
- ডাক্তার বা অভিজ্ঞ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা আই ইউ ডি প্রয়োগ করবেন।
- ডাক্তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

গর্ভনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতি (টিউবেকটমী ও ভ্যাসেকটমি) সম্পাদনে বিবেচ্য স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক উপযুক্ততার নির্দেশিকা।

গর্ভনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতি (টিউবেকটমি ও ভ্যাসেকটমি) সম্পাদনে স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার শ্রেণীবিভাগ অন্যান্য গর্ভনিরোধক থেকে ভিন্ন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্যগত বিবেচনায় স্থায়ী পদ্ধতির কোন নিশ্চিত প্রতিনির্দেশক নেই অর্থাৎ এমন কোন স্বাস্থ্যগত অবস্থা বা শর্ত নেই যার জন্য স্বেচ্ছায় স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে ইচ্ছুক গ্রহীতাকে স্থায়ীভাবে বিরত রাখা যায় বা উচিত। তবে বিশেষ কিছু স্বাস্থ্যগত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অথবা বর্তমান রোগাবস্থা উপশম না হওয়া পর্যন্ত অপারেশন বিলম্বিত করে অথবা উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কোন হাসপাতাল/ ক্লিনিকে রেফার করে অপারেশন সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে স্থায়ী পদ্ধতি প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব প্রদান করে স্থায়ী পদ্ধতি প্রদান করতে হয়। কাজেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত "স্বাস্থ্যগত অবস্থার জন্য স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক উপযুক্ততার নির্দেশিকা" প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ সামাজিক শর্তাবলীর প্রতিফলনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪ (চার) টি শ্রেণীবিভাগের অতিরিক্ত একটি শ্রেণী/ ক্যাটাগরির "NA (Not Acceptable)- গ্রহণযোগ্য নয়" (অর্থাৎ এই অবস্থায় স্থায়ী পদ্ধতি সম্পাদন করা যাবে না) প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থায়ী পদ্ধতির জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চারটি এবং বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত শ্রেণীবিভাগ ও মাত্রা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাস্থ্যগত অবস্থার শ্রেণী বিভাগ ও মাত্রা	
শ্রেণী বিভাগ (Category)	শ্রেণীবিভাগের সংজ্ঞা
A-Accept = গ্রহণযোগ্য	এই অবস্থায় গর্ভনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতি প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত বা সামাজিক কোনো বাধা নেই। অর্থাৎ এ অবস্থায় স্থায়ী পদ্ধতির অপারেশন করা যাবে।
C-Caution = সতর্কতার সাথে অপারেশন সম্পাদন করা	নিয়মিতভাবে যে সকল কেন্দ্রে স্থায়ী পদ্ধতির অপারেশন করা হয় সে সকল কেন্দ্রেই বর্তমান স্বাস্থ্যগত অবস্থার স্থায়ী পদ্ধতির অপারেশন করা যাবে, তবে অতিরিক্ত প্রস্তুতি ও সতর্কতার প্রয়োজন হবে।
D-Delay = অপারেশন বিলম্বিত করা বা সাময়িক স্থগিত রাখা	বর্তমান স্বাস্থ্যগত সমস্যার নিরসন বা রোগাবস্থা ভাল না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী পদ্ধতির অপরেশন স্থগিত রাখতে হবে।
S- Special = বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।	এমন কোন ক্লিনিক/হাসপাতালে স্থায়ী পদ্ধতির অপারেশন সম্পাদন করতে হবে যেখানে অভিজ্ঞ সার্জন ও সাহায্যকারী স্টাফ এবং জেনারেল এ্যানেসথেসিয়াসহ যে কোন উদ্ভুত জরুরী অবস্থা মোকাবিলার সুবিধাদি বিদ্যমান আছে।

বাংলাদেশের সামাজিক রীতি-প্রথার প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত শ্রেণী বিভাগ ও মাত্রা	
NA-Not Acceptable = গ্রহণযোগ্য নয়	বাংলাদেশ জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে এমন কিছু সামাজিক মূল্যবোধ, রীতি-প্রথা ও প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়া হয়, যার প্রেক্ষিতে গর্ভনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতির অপারেশন করা হয় না।
গর্ভনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতি ঃ টিউবেকটমি ও ভ্যাসেকটমি	গর্ভনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতি যৌনবাহিত সংক্রমণ (এইচআইভি/ এসটিআই) প্রতিরোধ করে না। যৌনবাহিত রোগ বা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকির ক্ষেত্রে (প্রসবোত্তর সময়ের) সঠিক পদ্ধতিতে ও নিয়মিতভাবে কনডম এককভাবে বা অন্য কোন গর্ভনিরোধকের সাথে ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া উচিত। পুরুষের রাবার কনডম যৌনবাহিত রোগ ও এইচআইভি থেকে উভয় পার্টনারকে রক্ষা করে।

উপযুক্ততার টেবিল সম্পর্কে ধারণা ঃ টেবিলটির প্রথম কলামটি ক্রমিক নম্বর। দ্বিতীয় কলামটিতে বিবেচ্য স্বাস্থ্যগত ও বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। তৃতীয় কলামটিতে স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক অবস্থার মাত্রা দেখানো হয়েছে। শেষ কলামে ব্যাখ্যা/সাক্ষ্য-প্রমাণ/মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে।

পাঠ-৮

মায়ের দুধ খাওয়ানো পরিবার পরিকল্পনার একটি সনাতন পদ্ধতি

মায়ের দুধ খাওয়ানো জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি। শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ালেই ৬ মাস পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। (এ সময় মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন কিছু খাওয়ানো যাবে না যেমনঃ মধু, চিনি বা মিসরির পানি, শুধু পানি ইত্যাদি)।

বাচ্চাকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো ঃ

যখন একজন মা তার শিশুকে বুকের দুধ (বোতলের দুধ বা সম্পূরক খাবার না দেন) খাওয়ান, তখন তার শরীরে প্রোজেষ্টেরন হরমোন বেশী তৈরী হয়। ফলেন এ সময় ডিম্বস্ফোটন স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ থাকে।

শিশু মায়ের দুধ চোষার ফলে আর এক প্রকার হরমোন তৈরী হয় যাকে প্রোলেকটিন বলে। প্রোলেকটিন ডিম্বস্ফোটন সম্ভাবনা কমায়। সেজন্য মায়েদের নিয়মিত বুকের দুধ (রাত্রিকালিন সময় সহ) খাওয়ানোর জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন। যদি মা কম সময়ের জন্য বুকের দুধ খাওয়ান অথবা ৬ মাসের পূর্বেই সম্পূরক খাবার দেন তাহলে ডিম্বস্ফোটন এবং ঋতুস্রাব আগেই শুরু হবে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। কমপক্ষে রাতে-দিনে ৬ (ছয়) বার বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। প্রতিবারই স্তনে তৈরী সম্পূর্ণ দুধই চুষে খেতে হবে।

সুবিধাসমূহ ঃ

- এটি একটি কার্যকরী পদ্ধতি।
- যে মহিলা ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ায় তার গর্ভ হওয়ার সুযোগ থাকে কম।
- বুকের দুধ খাওয়ানো মা ও তার শিশুর জন্য সুবিধাজনক।
- বুকের দুধ খাওয়ালে শিশুর লালন পালনের জন্য অতিরিক্ত খরচ হয় না।
- মা ও শিশুর মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।
- শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- ডায়রিয়া, এআরআইসহ অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকে।
- বুকের দুধ সহজে পাওয়া যায় এবং তা পুষ্টিকর।
- শুধুমাত্র বুকের দুধ খাইয়ে মা তার নিজস্ব উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।
- শিশু অধিকার নিশ্চিত হয়।

অসুবিধাসমূহ ঃ

- কখন উর্বরতা ফিরে আসে তা জানা যায় না।
- বাচ্চা হওয়ার পর মহিলার যখন ডিম্বস্ফোটন হয় (যা ৫ মাসের মধ্যে হয় না যদি সে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান), তখন তিনি আবার গর্ভধারণ করতে পারেন। কিন্তু মহিলা যোনীপথের শ্লেষ্মা দেখে জানতে পারবে না যে তার ডিম্বস্ফোটন হয়েছে, তিনি কেবলমাত্র বুঝতে পারবেন যে তার পুনরায় মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে। উর্বরতা সম্পর্কে তিনি বুঝতে পারবেন ডিম্বস্ফোটনের ১৪ দিন পর যখন তার প্রথম ঋতুস্রাব হবে। (অনেক মহিলা বেশী নিশ্চিত হওয়ার জন্য অতিরিক্ত একটি জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন।)
- কর্মজীবি মহিলা ঃ যারা কাজের জন্য বুকের দুধ খাওয়ানোর মাত্রা কমিয়ে দেয় তাদের জন্য এ পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নয়।

সম্পূরক খাবার ঃ

যখনই মা তার শিশুকে সম্পূরক খাবার দিতে শুরু করেন তখন শিশু বুকের দুধ কম চোষে বলে ডিম্বস্ফোটন পুনরায় শুরু হতে পারে। মাকে কেবলমাত্র ৬ মাস (১৮০ দিন) পুরোপুরি বুকের দুধ খাওয়ানোর পরই সম্পূরক খাবার দেয়ার জন্য শিক্ষা দিতে হবে।

পাঠ-৯

দেরীতে বিবাহ, আযল বা প্রত্যাহার এবং সহবাস থেকে বিরত থাকা

- **দেরীতে বিবাহ ঃ**

যদি কোন মহিলা দেরীতে বিবাহ করেন তাহলে তার সন্তান ধারণের জন্য সময় কম থাকে। সেজন্য যারা অল্প বয়সে বিবাহ করে তাদের তুলনায় যিনি দেরীতে বিয়ে করেন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার না করলেও তার সন্তান কম হবে।

মেয়েদের বয়স ২০ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত গর্ভধারন না করার জন্য পরামর্শ দিতে হবে। কারণ ২০ বৎসরের নিচে কোন মহিলা গর্ভবতী হলে মা ও শিশু উভয়েই অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে।

- **আযল বা প্রত্যাহার ঃ**

আযল একটি সনাতন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহারকারী পুরুষ সহবাসের সময় যোনিপথের ভিতর বীর্য নির্গত হওয়ার পূর্বে তার লিঙ্গ যোনিপথ থেকে বাহিরে নিয়ে আসেন। এই পদ্ধতি, প্রত্যাহারের সঠিক সময় জানার উপর নির্ভর করে। যদি পদ্ধতি সঠিক হয় তবুও গর্ভবতী হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায় কারণ কিছু শুক্রকীট চূড়ান্ত উত্তেজনার আগেই পুরুষ লিঙ্গের মাথা দিয়ে তরলের সাথে বের হতে পারে।

সুবিধা ঃ

- কোন কৃত্রিম পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না।
- কোন খরচ হয় না।
- সহজেই পদ্ধতিটি পালন করা যায়।

অসুবিধা ঃ

- যৌন সহবাস কোন কোন দম্পতির কাছে কিছুটা অতৃপ্তিকর ও অসম্পূর্ণ মনে হয়।
- এই পদ্ধতি কার্যকর করতে হলে দম্পতির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।

- **সহবাস থেকে বিরত থাকা ঃ**

সহবাস থেকে বিরত থাকা পরিবার পরিকল্পনার একটি পুরাতন পদ্ধতি। এর অর্থ হচ্ছে দম্পতিদের যৌন সহবাস থেকে সংযত থাকা। (যেমনঃ কিছু দম্পতি চাকুরী অথবা শিক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথক থাকার পরিকল্পনা নেয়। কিছু কিছু সমাজে বাচ্চা জন্মের পর পিতা ও মাতাকে অনেক দিন পর্যন্ত আলাদা করে রাখে।) যদি একজন পুরুষ ও মহিলার যৌন সহবাস না হয় তা হলে স্পষ্টভাবেই বলা যায় মহিলা গর্ভবতী হবেন না।

পাঠ-১০

প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপদকাল নির্ণয়, পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা ও ব্যবহার বিধি

নিরাপদকাল ঃ

একজন মহিলা মাসিক চক্রের কয়েক দিন উর্বর থাকেন। যদি ২৬-৩২ দিনের নিয়মিত মাসিক হয় তাহলে মাসিকের ৯ম থেকে ২০তম দিবস পর্যন্ত উর্বর দিন। এই সময় ডিম্বকোষ পুরুষ শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসলে গর্ভধারণ নিশ্চিত হতে পারে। একজন দম্পতির যদি ৯ম থেকে **১২**তম দিবসের মধ্যে যৌনসহবাস হয়ে থাকে তাহলে ডিম্বক্ষরণ না হওয়া পর্যন্ত শুক্রকীট ডিম্বনালীতে বেঁচে থাকতে পারে। তাই যৌনসহবাসের জন্য ৯ম দিবসের আগে অথবা থেকে ২০তম দিবসের পর নিরাপদকাল। যে সব মহিলার সম্পূর্ণরূপে ২৬-৩২ দিনের নিয়মিত মাসিক তাদের বেলায় এই তারিখগুলো ধরা হয়। কিন্তু যে সকল মহিলার অনিয়মিত অথবা বিভিন্ন মেয়াদের চক্র রয়েছে, তাদের বেলায় এই দিনগুলো নির্ভরযোগ্য নয়।

নিরাপদকালের সুবিধাসমূহ ঃ

- কোন প্রকার খরচ নাই (শুধুমাত্র তাপমাত্রা পরিবর্তন পদ্ধতির ক্ষেত্রে থার্মোমিটার কেনার প্রয়োজন হয়)
- কোন শারীরিক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।
- সামাজিকভাবে বেশী গ্রহণীয়। রাসায়নিক বা প্রতিবন্ধক পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতির প্রতি ধর্মীয় বা সামাজিক আপত্তি কম।

নিরাপদকালের অসুবিধাসমূহ ঃ

- মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কখন যৌনসহবাস নিরাপদ এটা জানার জন্য দম্পতিগণ হিসাব করা এবং রেকর্ড রাখা পছন্দ নাও করতে পারেন।
- কম নির্ভরযোগ্য। কারণ মাসিক ঋতুচক্র অনেক কারণে পরিবর্তন হতে পারে।
- যে সময় গর্ভবতী না হওয়ার কথা সে সময় গর্ভবতী হতে পারেন। নিরাপদকাল হিসাব করার সময়ও ভুল হতে পারে।
- যৌন সহবাসের নিরাপদ সময় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ প্রতি চক্রে সাত বা ততোধিক দিনে যৌন সহবাসের ফলে গর্ভসঞ্চার হতে পারে। দম্পতিকে অবশ্যই নিজস্ব নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে।

- শিশু জন্মের পর এই পদ্ধতি যথোপযুক্ত নয়। মাসিক চক্র পুনরায় শুরু না হওয়া পর্যন্ত এবং নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।
- যত্ন সহকারে রেকর্ড (মাসিকের হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়)।

উর্বর দিনগুলো চিহ্নিতকরণ

৩টি পদ্ধতিতে উর্বর দিন গুলোকে চিহ্নিত করা যায়

১. নিরাপদ কাল পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে উর্বর দিন গুলোকে চিহ্নিত করতে হয় যা অনুসরণ করা অধিকতর সহজ।

২. সারভিক্স এর শ্লেস্মা পদ্ধতি

প্রতিদিন যেনিপথ দিয়ে নির্গত শ্লেস্মা পরীক্ষা করে চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হয় যা অনুসরণ করা খুবই কঠিন

৩. তাপমাত্রা লক্ষণ পদ্ধতি

প্রতিদিনের যেনিপথ পথের শ্লেস্মা পরীক্ষা করে এবং সকালে বিছানা ছাড়ার আগে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হয় যা অনুসরণ করা খুবই কঠিন।

নিরাপদ কাল নির্ভর পদ্ধতি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

নিরাপদকালে যেসব মহিলার মাসিক চক্র নিয়মিত ২৬ থেকে ৩২ দিন মেয়াদী হয় তাদের জন্য প্রযোজ্য

১. মাসিকের প্রথম দিনটি ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে চিহ্নিক করে রাখতে হবে

২. মাসিকের প্রথম দিনসহ এক, দুই এভাবে গুণে নবম দিন চিহ্নিত করে দাগ দিতে হবে। এরপর ৯ম দিনসহ ১২ দিন গুণে ২০তম দিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি তারিখ দাগ দিয়ে চিহ্নিক করে রাখতে হবে

৩. ৯ম থেকে ২০তম চিহ্নিত দিনগুলোতে গর্ভধারনের সম্ভবনা বেশী থাকে। গর্ভধারণ প্রতিরোধে এসব দিনে কনডম বা আজল পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে অথবা সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. ৯ম থেকে ২০তম দিন ব্যতীত অন্য দিনগুলোতে অন্য দিনগুলোতে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে না। এসব দিনে সহবাস করা যাবে। কনডম বা আজল পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে না।

৫. পরবর্তী মাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দিন হতে একই নিয়মে উর্বর দিনগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

মাসিক চক্র নিয়মিত না হলে এ পদ্ধতির কোন কার্যকারীতা নেই। সেই সাথে উর্বর দিন ঠিকমত বুঝতে ও চিহ্নিত করতে না পারলে এই পদ্ধতি ব্যবহার না করাই উত্তম। কারন এতে অনাকাঙ্খিত গর্ভসঞ্চারের ঝুঁকি থেকে যায়।

নিরাপদকাল পদ্ধতি কারা ব্যবহার করতে পারবেন/কারা পারবেন না

- বেশীর ভাগ মহিলা দিন গণনা বা আদর্শ কাল পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। যাদের মাসিক চক্র নিয়মিত, ২৬ থেকে ৩২ দিন মেয়াদি হয়, তারা উর্বর দিনে সহবাস থেকে বিরত থাকবেন অথবা কনডম বা আযল পদ্ধতি ব্যবহার করবেন।
- যাদের মাসিক চক্র অনিয়মিত তারা এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন না।

পাঠ-১১
কনডম

কনডম পুরুষদের জন্য একটি নিরাপদ এবং কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এর ব্যবহারে অনাকাংখিত গর্ভরোধ ছাড়াও যৌনবাহিত রোগ বিস্তার রোধ করা যায়। সারা বিশ্বে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধের জন্য আজ কোটি কোটি দম্পতি কনডম ব্যবহার করছেন।

আজ থেকে চার হাজার বছর আগে কনডম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ রয়েছে। ইটালীর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যালেপিয়াস ১৫৮৪ সালে প্রথম কনডম জাতীয় পদ্ধতির উল্লেখ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম কনডম নামকরণ করা হয়। তখন যৌনরোগ বিস্তার রোধ করার জন্য কনডম ব্যবহার করা হতো। প্রথমে কনডম পশুর নাড়ী থেকে তৈরি করা হতো। ১৮৪০ সালে রাবার প্রযুক্তির বিকাশের সাথে কনডমের উৎপাদন ও ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক রাবার প্রযুক্তির উন্নতির ফলে কনডম এখন "ল্যাটেক্স" হতে তৈরি হয়। গ্রহণযোগ্যতার জন্য কনডম এখন খুবই পাতলা ভাবে তৈরি হয়। এতে শুক্রনাশক ও পিচ্ছিলকারক পদার্থও এখন যোগ করা হচ্ছে। বর্তমানে কিছু কনডমে ফোঁটা (Dotted) যুক্ত হওয়াতে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কনডম এখন আরও বেশী স্বাচ্ছন্দকর পদ্ধতি।

চিত্র ঃ কনডম

কনডম কিভাবে কাজ করে ঃ

কনডম শুক্রকীটকে যোনিপথে ঢুকতে বাধা দেয়। কোন কোন কনডমে যে শুক্রনাশক ব্যবহার করা হয় তা শুক্রকীটগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। কনডমের সঠিক ব্যবহার জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত

রোগের বিস্তার রোধ করে। তবে কনডমের ভুল ব্যবহার ও ফেঁটে গেলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে। তাই শুক্রকীট ধ্বংস করে এমন পদার্থ কনডমের সাথে যোগ করলে এর কার্যকারিতা আরও বেড়ে যায়।

কনডম ব্যবহারের সুবিধা ঃ

কনডমের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণগুলো হচ্ছে-

১) কনডম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

২) কনডম তুলনামূলকভাবে সস্তা ও সহজলভ্য।

৩) জন্মনিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে।

৪) সম্ভবত: মেয়েদের জরায়ূ মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে কনডম কাজ করে।

৫) কনডমের কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।

৬) যখন প্রয়োজন তখন ব্যবহার করলেই চলে বিধায় এর গ্রহণযোগ্যতা বেশী।

কনডমের অতিরিক্ত উপকারিতা ঃ

১) যাদের তাড়াতাড়ি বীর্যপাত হয়ে যায়, যৌন চিকিৎসকরা তাদের অনেক সময় কনডম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ যদি সহবাসের সময় যৌন উত্তেজনা বজায় রাখতে ব্যর্থ হন (বিশেষ করে বার্ধক্য বা তলপেটে কোন অপারেশনের জন্য) তবে কনডম ব্যবহারে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে, কারণ কনডমের মুখের রাবার আটসাট বলে উত্তেজনা বজায় রাখতে কিছুটা সাহায্য করে।

২) পিচ্ছিল কনডম কোন কোন দম্পতির ঘর্ষণজনিত অস্বস্তি কমায়।

৩) কনডম যৌনবাহিত রোগ বিস্তার রোধ করে ব্যবহারকারীকে বন্ধ্যাত্ব থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ যৌনবাহিত রোগ বন্ধ্যাত্বের একট অন্যতম কারণ।

৪) কনডম ব্যবহারে জরায়ু মুখের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা কমে যায় বলে ধারণা করা হয়।

৫) কোন নারীর বীর্য বা শুক্রকীটে এলার্জি হলে সেক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা যায়।

৬) বিরল ক্ষেত্রে পুরুষের বীর্যের বিপরীতে নারী দেহে যে এন্টিবডি তৈরী হয়, তা বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করতে পারে। ক্রমাগত কনডমের ব্যবহারে তা অনেক সময় প্রশমিত হয় এবং ঐ নারী গর্ভবতী হতে পারেন।

অসুবিধা ঃ

কনডম যারা ব্যবহার করতে পারবেন ঃ

১) যে কোন প্রজনন সক্ষম পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণ রোধের জন্য কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

২) কনডম ব্যবহারের জন্য কোন ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। তাই যেসব দম্পতি কোন শারীরিক কারণে জন্মনিয়ন্ত্রনের অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন না, তারা অনায়াসে কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

৩) যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী অথবা এক নাগাড়ে পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান না।

কনডম যারা ব্যবহার করতে পারবেন না ঃ

১) কনডম প্রায় সবাই ব্যবহার করতে পারেন। কদাচিৎ দু একজন কনডম পরে যদি উত্তেজনা বজায় রাখতে অথবা চরম পুলক লাভে ব্যর্থ হন তবে তাদের জন্য কনডম উপযোগী নয়।

২) যাদের লেটেক্সে এলার্জি আছে (যদিও খুবই বিরল), তারা নন-লেটেক্স কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

কনডমের ভুল ব্যবহার এড়িয়ে চলুন ঃ

১) কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, কনডম বীর্যপাতের আগে পরলেই চলে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্যপাতের আগে যে রস নি:সৃত হয়, তাতেও শুক্রকীট থাকে, ফলে গর্ভধারণ হতে পারে। তাই অবশ্যই সহবাস শুরু করার আগেই কনডম পরে নিতে হবে।

২) কনডম ব্যবহারে যৌনক্রিয়া অস্বস্তিকর মনে হলে পদ্ধতিটি বাদ দেয়ার আগে প্রয়োজনে পানিভিত্তিক তরল পিচ্ছিলকারক (যেমন- গ্লিসারিন) ব্যবহার করতে পারেন।

৩) একবার ব্যবহার করা কনডম পুনরায় আর ব্যবহার করা যাবে না।

কনডমের ব্যবহার বিধি ঃ

১) সহবাসের আগে কনডম প্যাকেট থেকে খুলে উত্থিত পুরুষাঙ্গে পরে নিতে হবে।

২) কনডম পরার সময় সামনের অংশ টিপে ধরে নিতে হবে যেন উত্থিত অঙ্গে পরার পর সামনে ১.৫ সেন্টিমিটার অতিরিক্ত জায়গা বীর্য ধারণের জন্য থাকে এবং সেখানে কোন বাতাস না থাকে। বাতাস থাকলে কনডম ফেটে যেতে পারে।

৩) বীর্যপাত হওয়ার পরপরই উত্থিত থাকা অবস্থায় কনডমের গোড়া চেপে ধরে যোনিপথ থেকে পুরুষাঙ্গ বের করতে হয়। এই সতর্কতার উদ্দেশ্য হলো যাতে করে কোনো শুক্রাণু যোনিপথে ঢুকে যেতে না পারে।

কনডম ব্যবহারের সমস্যা ও তার সমাধান ঃ

কনডম ব্যবহারে কেউ কেউ সমস্যা অনুভব করতে পারেন। সমস্যাসমূহ ও তার সমাধান নিচে দেয়া হলোঃ

১) কনডম অনুভূতি কমায় বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

- পিচ্ছিল কনডম ব্যবহার করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনে পানিতে দ্রবণীয় পিচ্ছিল পদার্থ যেমনঃ গ্লিসারিন ব্যবহার করে অনেকে বেশী আনন্দ পান। তাছাড়া ত্বকের রঙের বা স্বচ্ছ কনডম ব্যবহার করাই শ্রেয়। পেট্রোলিয়াম জাতীয় পিচ্ছিলকারক (যেমনঃ ভেসলিন) ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ তাতে কনডমের ক্ষতি হতে পারে।

২) যৌনক্রিয়ার সময় পুরুষদের এটা ব্যবহার করতে হয় বলে অনেকে ঝামেলা মনে করেন।

- এক্ষেত্রে কনডম পরানোর দায়িত্বটা যদি সঙ্গিনী পালন করেন তবে ব্যাপারটা সহবাস পূর্বক্রিয়ায় পুরুষের মানসিকতার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সেটিকে বরং আরও আনন্দময় করে তুলতে পারে।

৩) কনডমে এলার্জির অভিযোগ।

- লেটেক্স কনডমে এলার্জির সম্ভাবনা খুবই কম। প্রজননতন্ত্রের জীবাণু সংক্রমণের জন্যও কখনও কখনও এলার্জির মত অস্বস্তি হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে অন্য ব্র্যান্ডের কনডম ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে।

৪) কনডম ফেটে যাওয়া।

- সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে কনডম ফেটে যায়। সঠিক ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে পিচ্ছিলকারক পদার্থ ব্যবহার করলে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। অনেক দিনের পুরানো (পাঁচ বছরের বেশী) রোদ এবং স্যাঁত স্যাঁতে জায়গায় রাখা বা খোলা অবস্থায় রাখা কনডম ব্যবহার করা উচিত নয়। কনডম ব্যবহার করার সময় খেয়াল করতে হবে, যেন বাতাস না ঢুকে।

৫) কনডম কোথায় রাখতে হবে এবং ফেলতে হবে।

- কনডমগুলো শুকনো জায়গায় যেখানে সরাসরি রোদ বা ফ্লোরেসেন্ট বাল্বের আলো পড়ে না সেখানে রাখতে হবে।
- ব্যবহারের পর এমন স্থানে ফেলতে হবে যাতে অস্বস্তি বা লজ্জাকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়।
- কাগজে মুড়িয়ে ডাষ্টবিনে অথবা সম্ভব হলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

৬) কনডম পায়খানায় প্যানে ফেললে স্যুয়ারেজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

মেয়েদের জন্য কনডম

জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহে সংযুক্ত হয়েছে নতুন এক পদ্ধতি "মেয়েদের জন্য কনডম"। জন্মনিয়ন্ত্রণে এমন কোন পদ্ধতি নেই যা সবার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন মূলত সেখানেই। ব্যাপক গবেষণায় প্রকাশ কোন ব্যক্তির একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পছন্দের পিছনে কাজ করে তার শারীরিক, সামাজিক ও অনুভূতিগত বিভিন্নমুখী ব্যক্তিসত্ত্বা, যার মধ্যে রয়েছে সঙ্গী ও সঙ্গিনীর সঙ্গে একান্ত বিষয়গুলো নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলার সহজ প্রত্যয়, পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি, শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রকৃতি ইত্যাদি যাই হোক মেয়েদের কনডমে যেমন কিছু সুবিধা রয়েছে তেমন রয়েছে কিছু অসুবিধাও।

সুবিধা ঃ

১) এটি জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরি পদ্ধতি।

২) ব্যবহার পদ্ধতি সহজ।

৩) তেমন কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।

৪) মেয়েরা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

৫) যৌনবাহিত রোগ নিরোধক

৬) এটি পরতে কারো সাহায্য দরকার পড়ে না বা কিনতেও কোন ব্যবস্থাপত্র বা ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

অসুবিধা ঃ

১) গ্রহীতা ও তার সঙ্গী উভয়ের জন্যই অস্বস্তিকর হতে পারে।

২) পুরুষদের কনডমের তুলনায় পরতে অসুবিধাজনক।

৩) অপেক্ষাকৃত দাম বেশী।

বাজারে মেয়েদের যে কনডমটি আছে সেটি পলিইউরেথেন দিয়ে তৈরি যা পুরুষদের কনডমের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী। এখন পর্যন্ত এর কোন এলার্জিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। এই কনডমের কোন গন্ধ নেই। তাছাড়া এর সাথে অন্যান্য তেলভিত্তিক পিচ্ছিলকারক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। মেয়েদের কনডম বাজারে একটি সাইজেই পাওয়া যায়। এর দুই প্রান্তে দুটি রিং থাকে। ভিতরের রিংটি আঙ্গুল দিয়ে ধরে এমনভাবে যোনিপথে স্থাপন করতে হয় যাতে সেটি জরায়ুমুখ আবৃত করে রাখে। বাইরের রিংটি যোনিমুখের সাথে মিশে থাকে। যে কোন সময় একজন মহিলা এটি ব্যবহার করতে পারেন। পুরুষাঙ্গ উত্থিত হওয়ার আগে এবং বীর্যপাতের পরে কিছু সময় যোনিপথে থাকলেও এর কার্যকারিতা হারায় না। পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত

কনডমের ক্ষেত্রে এই সুবিধা নেই। আর সেই কারণেই আজ অনেক মহিলাই মেয়েদের কনডমকে প্রিয় পদ্ধতি হিসেবে পছন্দ করছেন।

শুক্রকীটনাশক

শুক্রকীটনাশক এমন একটি পদ্ধতি যা সহবাসের আগে নারীর যোনিপথে ব্যবহার করা যায়। শুক্রকীটনাশক কেমিক্যাল সাধারণত: দুই ভাবে কাজ করে।

প্রথমত: ফোম, ক্রীম বা জেলির মত, যা পুরুষের শুক্রকীটগুলোকে যোনিপথে অগ্রসর হতে বাধা দেয়।

দ্বিতীয়ত: শুক্রকীটগুলো ধ্বংস করে। জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য শুক্রকীট ধ্বংস পদ্ধতির ব্যবহার অতি প্রাচীন। নিরাপদ ও সহজ ব্যবহার প্রণালীর কারণে শুক্রকীটনাশক জন্মনিয়ন্ত্রণে একটি অতি প্রচলিত পদ্ধতি। যদিও শুক্রকীটনাশক পদ্ধতি এককভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে কনডমের সাথে ব্যবহার করলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

শুক্রকীটনাশক সহায়ক পদ্ধতি হিসেবেই বেশী প্রচলিত। বিভিন্ন শুক্রকীটনাশকের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার বিধি রয়েছে। ব্যবহারকারীকে আগে ভালভাবে ব্যবহার বিধি জেনে নিয়ে সেটা ব্যবহার করা উচিৎ। প্রায় সব শুক্রকীটনাশক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। তাই শুক্রকীটনাশক ব্যবহারের আগে ব্যবহারকারীকে অবশ্যই সেই সময়সীমা জেনে নিতে হবে। যে সব মহিলা সহবাসের পর যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেলতে অভ্যস্ত তারা যদি কোন শুক্রকীটনাশক ব্যবহার করেন তবে ৮ ঘন্টার মধ্যে তা করতে পারবেন না। কারণ তাতে শুক্রকীট নাশকের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় বা কমে যায়।

শুক্রকীটনাশকের উপাদানের জন্য যাদের এলার্জি হয় এই পদ্ধতি তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। তাছাড়া যারা সহবাসের আগে এটি ব্যবহারের কথা প্রায়শই ভুলে যান তাদের জন্যও এই পদ্ধতি নিরাপদ নয়। শুক্রকীটনাশক বড়ি কোন কোন সময় ফেনায়িত না হলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে। অনাকাংখিত গর্ভসঞ্চার রোধ করার পাশাপাশি শুক্রকীটনাশক কোন কোন যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গনোরিয়া, ট্রাইকোমোনাস, হারপিস ও ক্ল্যামাইডিয়া। তাছাড়া শুক্রকীটনাশক পদ্ধতি সহবাসের সময় পিচ্ছিল করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। সহবাসের সময় কনডম ফেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি শুক্রকীটনাশক বড়ি যোনিপথে ব্যবহার করতে হবে।

টিপস ঃ

কনডম এইডসসহ সকল যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে। এইচআইভি ভাইরাস খুব ছোট হলেও ছিদ্রবিহীন অভঙ্গুর ল্যাটেক্স কনডমের ভেতর দিয়ে যেতে পারে না। তবে কনডম যদি প্রাণীদের অন্ত্রনালী দিয়ে তৈরি হয়

তবে সেটা নিরাপদ নয়। কিছু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু এর ভিতর দিয়ে যেতে পারে। কনডম সঠিকভাবে ব্যবহার করা না হলে অথবা প্রতিবার নতুন কনডম ব্যবহার না করলে কনডমের কার্যকারিতা অনেক কমে যায়।

কনডম সংক্রান্ত প্রশ্ন- উত্তর

১	কনডম কি একটি কার্যকরী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি	হ্যাঁ, তবে যদি ব্যবহারকারী প্রত্যেকবার যৌনমিলনের সময় সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করেন। কনডম সঠিকভাবে ব্যবহার করা না হলে অথবা প্রতিবার নতুন কনডম ব্যবহার না করলে কনডমের কার্যকারিতা অনেক কমে যায়।
২	যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধে কনডম কতটা কার্যকরী ?	কনডম এইচআইভি/এইডসসহ যৌনবাহিত সকল রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকরী ভুমিকা রাখতে পারে, যদি প্রতিবার যৌনমিলনের সময় সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। তবে লক্ষণীয় যে, অনেকেই কনডম সঠিকভাবে ব্যবহার করেন না বা সকল সংগীর সংগে প্রতিবার সহবাসের সময় ব্যবহার করেন না।
৩	এইডস ভাইরাস (এইচআইভি) কি কনডমের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে ?	না কনডম এইডসসহ সকল যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে। এইচআইভি ভাইরাস খুব ছোট হলেও ছিদ্রবিহীন অভঙ্গুর ল্যাটেক্স কনডমের ভেতর দিয়ে যেতে পারে না। তবে কনডম যদি প্রাণীদেহের অন্ত্রনালী দিয়ে তৈরি হয় তবে সেটা নিরাপদ নয়। কিছু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু এর ভিতর দিয়ে যেতে পারে।
৪	কনডম কি একজন পুরুষকে দুর্বল ও পুরুষত্বহীন করবে (লিঙ্গ দৃঢ় হবে না) ?	সাধারণতঃ নয়। সত্যিকার অর্থে কনডম লিঙ্গকে অধিকক্ষণ দৃঢ় রাখার অনেক কারণ আছে। কিছু কারণ শারীরিক ও কিছু মানসিক। খুব কম সংখ্যক পুরুষ কনডম ব্যবহার করার কারণে বিব্রত অবস্থায় পরেন।
৫	কনডম কি যৌনমিলনকে কম আনন্দদায়ক করে ?	কেউ কেউ কনডম ব্যবহারে কম আনন্দ পান, আবার কেউ কেউ আগের মতই বা আগের থেকে বেশী আনন্দ অনুভব করেন, কারণ কনডম ব্যবহারে গর্ভবতী হওয়া বা যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার চিন্তা থাকে না। যৌনমিলন ও বীর্যপাতের আগে আনন্দদায়ক সময়কে অধিকক্ষণ স্থায়ী করে।
৬	কিভাবে একজন মহিলা তার যৌনসঙ্গীকে কনডম	একজন মহিলা তার যৌনসঙ্গীকে কনডম ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য নিম্নের কথাগুলো বলতে পারেন ঃ

	ব্যবহারে সাহায্য করতে পারেন ?	• কনডম গর্ভরোধ এবং এইচআইভি/এইডস সহ আরো অনেক যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে, এমনকি জীবনও বাঁচাতে পারে। • সামান্য অভ্যাসের ফলে কনডম সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় এবং যৌন মিলন হতে পারে আরও আনন্দদায়ক। • অনেক দম্পতি কনডম ব্যবহার করেন। এটা কেবল পতিতাদের জন্য নয়। • সে জানে যে তার সঙ্গী তাকে জেনে শুনে সংক্রমিত করবে না কিন্তু অনেকে নিজের অজ্ঞাতেই এইডসসহ অনেক দুরারোগ্য যৌনরোগে ভোগেন। • অনেকে কনডম ব্যবহারে অধিক সময় ধরে যৌনমিলন করতে পারেন ফলে তা দুজনের জন্যই আনন্দদায়ক হয়। • পুরুষদের কনডম ব্যবহারে উৎসাহিত করা সহজ নয়, এবং কোন একটা উপায় সবসময় কাজ করে না। তবুও প্রতিটি উপায়ই চেষ্টা করতে হবে কারণ চেষ্টা না করার ঝুঁকি অনেক বেশী।
৭	কনডম কি যৌনমিলনের সময় ছিড়ে যেতে পারে ?	অল্প কিছু ক্ষেত্রে যৌনমিলনের সময় কনডম ছিড়ে যেতে পারে। তবে সঠিক নিয়মে কনডম ব্যবহার করলে কনডমের ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যৌন মিলনের পূর্বে রতিক্রিয়া যোনিপথকে সিক্ত করে, যা কনডম ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। কনডমের বাহিরের আবরণের পানিভিত্তিক পিচ্ছিলকারক ব্যবহার এ ব্যাপারে সাহায্য করে। বিঃ দ্রঃ কখনই তৈলভিত্তিক পিচ্ছিলকারক যেমন- পেট্রোলিয়াম জেলী, ত্বকের ক্রিম ব্যবহার করা উচিত নয়। এরা ল্যাটেক্স রাবারকে তাড়াতাড়ি নষ্ট করে এবং এর ফলে কনডম ছিড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
৮	যৌনবাহিত রোগের প্রতিরোধের জন্য কি পায়ুপথে মিলন ও মুখ গহ্বরে মিলনের সময়ও কি কনডম ব্যবহার করা উচিত ?	হ্যাঁ, যে কোন যৌনক্রিয়ায় যেখানে লিঙ্গ আরেক জনের শরীরের যে কোন অংশে প্রবেশ করে সেইসব ক্ষেত্রে যৌনবাহিত রোগ একজনের শরীর থেকে আরেক জনের শরীরে ছড়াতে পারে। যে সব গ্রহীতার যৌনবাহিত রোগ আছে বা যৌনবাহিত রোগ আছে এমন কারো সাথে যে কোন ধরনের যৌনমিলনের সময় অবশ্যই কনডম ব্যবহার করা উচিত।

পাঠ-১২

খাবার বড়ি

খাবার বড়ি কি?

মুখে খাওয়ার জন্য নিরোধক বড়ি। ইহা এক প্রকার এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন দ্বারা তৈরী হয়। বাজারে স্বল্পমাত্রায় এবং সাধারণ মাত্রায় এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন এর দ্বারা তৈরী মিশ্র খাবার বড়ি পাওয়া যায়।

চিত্র ঃ খাবার বড়ি

খাবার বড়ির প্রকারভেদ

বড়ির ধরণ		হরমোনের মাত্রা	মন্তব্য
মিশ্র (Combined) খাবার বড়ি। প্রতিটি বড়িতে একই মাত্রায়	স্বল্প মাত্রার মিশ্র বড়ি (Low dose pill)	• ৩০-৩৫ মাইক্রোগ্রাম এস্ট্রোজেন। • ১৫০ মাইক্রোগ্রাম প্রজেস্টেরন।	বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে স্বল্পমাত্রার বড়িটির নাম হলো "সুখী"। এতে ৩০ মাইক্রোগ্রাম ইথিনাইল ইষ্ট্রাডিয়ল (এস্ট্রোজেন) এবং ১৫০ মাইক্রোগ্রাম লেভোনরজেষ্ট্রিল (প্রজেস্টেরন) রয়েছে।

এষ্টোজেন ও প্রজেষ্টেরন থাকে।	সাধারণ/উচ্চ মাত্রার মিশ্র বড়ি (Standard dose pill)	• এষ্ট্রোজেন ৫০ মাইক্রোগ্রাম • প্রোজেষ্টেরন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম	সাধারণ মাত্রার বড়ির নাম '(C-5 Combination-5)' 'ওভরাল' (Ovral), লিনডিয়ল।
প্রজেষ্টেরন নির্ভর খাবার বড়ি (শুধু মাত্র প্রজেষ্টেরন হরমোন থাকে।)	মিনিপিল (Mini Pill)	০.০৭৫ মিলিগ্রাম প্রজেষ্টেরন (নরজেস্ট্রিল) বা সমক্ষমতা সম্পন্ন, অন্যান্য প্রজেষ্টেরন যথা- নরএথিনড্রন বা ডেসোজেসট্রেল	এখানে কোন এষ্ট্রোজেন হরমোন থাকে না। সে কারণে যে সব মা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের জন্য এ বড়ি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ এই হরমোন মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ ও গুণাবলীর ওপর কোন প্রভাব ফেলে না। এটি বাজারে "মিনিকন" পিল নামে পাওয়া যায়।

খাবার বড়ি কিভাবে কাজ করে ?

- ডিম্বস্ফোরণ হয় না (এষ্ট্রোজেন এর প্রভাবে)
- জরায়ুর ভিতরের আস্তরন সার্বিকভাবে তৈরী হয় না ফলে নিঃসৃত ডিম্বকে গ্রহণ করতে (প্রজেষ্টেরনের প্রভাবে)।
- জরায়ুর মুখের শ্লেষ্মা ঘন হয়ে যায়। যার ফলে পুরুষের শুক্রকীট জরায়ুতে ঢুকতে পারে না।

কোন মহিলাদের খাবার বড়ি দেয়া যাবে না

- স্তনদানকারী মা। ছোট বাচ্চার বয়স ৬ মাসের কম।
- উচ্চ রক্তচাপ-রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি:মি: মারকারী এর উপর।
- মারাত্মক রক্তস্বল্পতা।
- স্তনে চাকা।
- গর্ভধরণ সন্দেহ করা হলে।
- রোগের কারণে (মেডিকেল ইংগিত) ঃ
    - ➢ বহুমূত্র
    - ➢ গত ১ বছরের মধ্যে জন্ডিস

- হৃদরোগ
- স্ট্রোক
- মৃগী রোগ
- যক্ষ্মা
- অজানা কারণে যৌন পথে রক্তক্ষরণ
- রক্তে জমাট বাধা রোগ।

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার খাবার বড়ি

নাম	**গক্রিয় উপাদান**	**বড়ির সংখ্যা**	**উৎপাদক**
সরকারী কর্মসূচীতে সরবরাহকৃত			
১. সুখী (স্বল্প মাত্রা)	লেভোনরজেস্ট্রিল ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল ৩০ মাইক্রোগ্রাম, ফেরাস ঠিউমারেট ৭৫ মিলিগ্রাম	২৮	জার্মানী, কানাডা
সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী কর্তৃক বাজারজাতকৃত			
২. ফেমিকন (স্বল্প মাত্রা)	নরজেস্ট্রিল ০.৩ মিলিগ্রাম, ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল ০.০৩ মিলিগ্রাম, ফেরাস ফিউমারেট ৭৫ মিলিগ্রাম	২৮	মিনটেক্স ল্যাবরেটরি ইউ.এস.এ
৩. নরডেট-২৮ (স্বল্প মাত্রা)	লেভোনরজেস্ট্রিল ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল ৩০ মাইক্রোগ্রাম, ফেরাস ফিউমারেট ৭৫ মিলিগ্রাম	২৮	জার্মানী
৪. মিনিকন (শুধুমাত্র প্রজেস্টরন যুক্ত বড়ি)	নরজেস্ট্রিল ০.০৭৫ মিলিগ্রাম	২৮	যুক্তরাষ্ট্র

অন্যান্য কোম্পানী কর্তৃক বাজারজাতকৃত			
৫. মারভেলন (স্বল্প মাত্রা)	ডেসোজেস্ট্রেল ০.১৫ মিলিগ্রাম, ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল ০.০৩ মিলিগ্রাম	২১	অরগানন (বাংলাদেশ) লিঃ
৬. লিনডিয়ল (সাধারণ মাত্রা)	লিনেসস্ট্রেনাল ২.৫ মিলিগ্রাম, ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল ০.০৫ মিলিগ্রাম	২২	অরগানন (বাংলাদেশ) লিঃ
৭. ওভষ্ট্যাট গোল্ড (স্বল্প মাত্রা)	লিনেসস্ট্রেনাল ০.৭৫ মিলিগ্রাম, ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল ০.০৩৭ মিলিগ্রাম	২২	অরগানন (বাংলাদেশ) লিঃ
৮. নরডেট (স্বল্প মাত্রা)	লেভোনরজেস্ট্রিল ০.১৫ মিলিগ্রাম, ইথিনাইল ইস্ট্রাডিয়ল ০.০৩ মিলিগ্রাম	২১	ওয়েথ ফার্মা জার্মানী

পাঠ-১৩
খাবার বড়ি গ্রহীতার ইতিহাস গ্রহণ, শারীরিক পরীক্ষা, বড়ি খাওয়ার নিয়মাবলী এবং পরামর্শদান

- যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট এর সহিত সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- গ্রহীতার ইতিহাস এবং পরীক্ষা (৮ নং পাঠ অনুযায়ী---- পৃষ্ঠা/ বই ছাপানোর সময় পৃষ্ঠা নং বসাতে হবে) করে বড়ি দেয়া যাবে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

  তারপর নিচে দেয়া ধাপ অনুসারে অগ্রসর হতে হবে ঃ

ক্র. নং	যে সব বিষয় দেখতে হবে/ করতে হবে	১	২	৩
১)	ক্লায়েন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন			
২)	খাবার বড়ি সম্পর্কে ক্লায়েন্ট কতটুকু জানে তা জেনে নিন			
৩)	খাবার বড়ির প্যাকেট দেখিয়ে সুবিধা, অসুবিধা ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন			
৪)	ইতিহাস গ্রহণ করুন (বাছাইকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী*)			
৫)	শারীরিক পরীক্ষা করুন (বাছাইকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী*)			
৬)	কোন বিরুদ্ধ ইঙ্গিত না পাওয়া গেলে ক্লায়েন্টকে অন্য পদ্ধতির জন্য পরামর্শ দিন			
৭)	কোন বিরুদ্ধ ইঙ্গিত পাওয়া গেলে ক্লায়েন্টকে বড়ি বিতরণ করুন			
৮)	নির্দেশিকা অনুযায়ী বড়ি খাওয়ার নিয়ম বলে দিন			
	পরবর্তী উপদেশ দিন ঃ			
৯)	ছোট খাটো অসুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন এবং দরকার হলে ক্লিনিকে আসতে বলুন			
১০)	জটিলতার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ক্লিনিকে আসতে বলুন			
১১)	বেশ কয়েকটি বড়ি হাতে থাকতে ক্লিনিকে আসতে বলুন অথবা স্থানীয় কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে বড়ির প্যাকেট নিতে বলুন			
১২)	ক্লায়েন্টের নিকট হতে ফিডব্যাক নিন।			

গ্রহীতাকে বড়ি খাওয়ার নিয়মাবলী জানান এবং পরামর্শ প্রদান করুন ঃ

বড়ি খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া একজন মহিলাকে প্রথমে তাকে একটি খাবার বড়ির প্যাকেট দেখান এবং খাওয়ার নিয়মাবলী বলুন এবং পরামর্শ দিন।

চিত্র ঃ খাবার বড়ি

ব্যবহারের নিয়ম ও পরামর্শ

- সব সময় কমপক্ষে এক প্যাকেট খাবার বড়ি এবং কয়েকটা কনডম হাতের কাছে রাখুন।
- স্বামী বাড়ীতে থাক বা না থাক প্রতিদিন একই সময় একটি করে বড়ি খান।
- মাসিকের প্রথম দিন একটি সাদা বড়ি দিয়ে বড়ি খাওয়া শুরু করুন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের কাজ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে।
- প্যাকেটের তীর চিহ্ন অনুসরণ করে প্রতিদিন একই সময় একটি করে বড়ি খান।
- সমস্ত সাদা বড়ি খাওয়ার পর বাদামী বড়ি খেয়ে যান।
- বাদামী বড়ি খাওয়ার সময় আপনার মাসিক হবে (প্রথমে মাসে ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৩ দিনে মাসিক শুরু হতে পারে।)
- প্যাকেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত বড়ি খেয়ে যান।
- প্রথম প্যাকেট শেষ হওয়ার পরের দিন, আরেকটি নতুন প্যাকেটের সাদা বড়ি দিয়ে শুরু করুন।
- আর যদি একদিন বড়ি খেতে ভুলে যান, তাহলে যখনই মনে পড়বে তখনই একটি বড়ি খাবেন এবং ঐ দিনের বড়িটি যথা সময়ে খাবেন।
- যদি পর পর ২ দিন বড়ি খেতে ভুলে যান তাহলে মনে পড়ার সাথে সাথে ২টি বড়ি খাবেন এবং তার পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে ২টি বড়ি খাবেন। প্যাকেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সব বড়ি খেতে হবে। এবং পাশাপাশি কনডম ব্যবহার করতে হবে বা স্বামীর সাথে সহবাসে বিরত থাকতে হবে। মাসিক শুরু হলে পুনরায় নতুন পাতা থেকে বড়ি খেতে শুরু করতে হবে।

- যদি তিন দিন বড়ি খেতে ভুলে যান তবে বড়ি খাওয়া বন্ধ করুন। পুরাতন প্যাকেটটি ফেলে দিন এবং পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত অন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করুন যেমন- কনডম বা স্বামীর সাথে সহবাসে বিরত থাকুন। পরের মাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকে নতুন প্যাকেটের সাদা বড়ি খেতে শুরু করুন।

  যারা তিন দিন বড়ি খেতে ভুলে যান তাদের জন্য খাওয়ার বড়ি সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি কি না তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই ধরনের মহিলাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি (যেমন- আই ইউ ডি বা ইনজেকশন) আরো উপযুক্ত হবে।
- যদি পাতলা পায়খানা এবং বমি হয় তাহলে বড়ি খেয়ে যান কিন্তু মাসিক না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত যে কোন একটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করুন। যেমন- কনডম।

খাবার বড়ির সুবিধা

- সঠিকভাবে বড়ি খেলে কার্যকারিতা ৯৭-৯৯.৯% ভাগ। অনাকাঙ্খিত গর্ভসঞ্চার খুবই কম হয়।
- কোন প্রকার অতিরিক্ত সতর্কতা ছাড়াই যে কোন সময় যৌন সহবাস করা যায়।
- মাসিক নিয়মিত হয়।
- মাসিকের রক্তস্রাবের পরিমাণ কম হয় যার ফলে রক্তস্বল্পতা রোধ করে।
- মাসিকের সময় ব্যথা থাকলে তা কমে যায়।
- নিয়মিত বড়ি খাওয়ার ফলে অনেক মহিলার স্বাস্থ্য ভাল হয়।
- বাদামী রঙের আয়রণ বড়ি খাওয়ার ফলে রক্তস্বল্পতা কমে যায়।
- স্তনের জন্য বিপজ্জনক- এমন ব্যাধির (ফাইব্রো সিষ্টিক পরিবর্তন) সম্ভাবনা কমায়।
- ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার এবং ডিম্বাশয়ের সিস্টের ঝুঁকি কমায়।
- জরায়ুর ভেতরের আবরন বা ঝিল্লীর (এন্ডোমেট্রিয়ামের) ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।
- পেলভিসে সংক্রমণ জনিত প্রদাহের (পি আই ডি) আক্রমণ থেকে কিছুটা রক্ষা করে।
- যদি দম্পতি আরেকটি শিশু নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করার পর পরই গর্ভধারণ করতে পারেন।

খাবার বড়ির অসুবিধা

- প্রতিদিন নিয়মিত খেতে হয়।

- মাসিক স্রাবের পরিমাণ কমিয়ে দেয় বলে কিছু মহিলার মনে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়।
- নিয়মিত সরবরাহ থাকতে হয়।
- বুকের দুধ কমে যেতে পারে।
- যৌনপথের পিচ্ছিলতা কমে যেতে পারে।
- বিমর্ষতা দেখা দিতে পারে।
- ছোট-খাট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন- বমি বমি ভাব, মাথা ধরা, স্তনে ব্যথা।

পাঠ-১৪

বন্ধ্যাত্ব ও এর ব্যবস্থাপনা

বন্ধ্যাত্ব কি?

যদি কোন দম্পতি এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে সন্তান ধারণের চেষ্টা করেও অথবা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করেও সন্তান ধারণ করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে বন্ধ্যাত্ব বলে।

বন্ধ্যাত্ব প্রজননতন্ত্রের এমন একটি অসুখ বা সমস্যা যার ফলে শরীর গর্ভধারণের মতো সবচেয়ে মৌলিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গর্ভধারণ একটি জটিল প্রক্রিয়া যা নির্ভর করে অনেক বিষয়ের উপর, যেমন-

- পুরুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক শুক্রাণু
- পুরুষের বীর্য নারীর যোনীপথে প্রবশে
- নারীর সুস্থ ও স্বাভাবিক ডিম্বাণু
- স্বাভাবিক ও খোলা যোনী পথ
- স্বাভাবিক জরায়ু ও ডিম্ববাহী নালী- যা শুক্রাণুকে ডিম্বানুর কাছে পৌঁছায়
- শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কাছাকাছি আসার পর শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারার ক্ষমতা
- নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুতে গ্রথিত হতে পারার ক্ষমতা
- ভ্রুণের যথেষ্ট গুণগত মান যা গর্ভকাল পূর্ণ সময় পর্যন্ত বহাল থাকার জন্য প্রয়োজন।
- সুস্থ ও স্বাভাবিক ভ্রুণ এবং নারীর শরীরে স্বাভাবিক হরমোনের পরিবেশ থাকা যা ভ্রুণের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

এর যে কোন একটির সমস্যা দেখা দিলে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

বন্ধ্যাত্বের সংজ্ঞা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বন্ধ্যাত্ব নিম্নে বর্ণিত উপায়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

প্রাইমারী বা প্রাথমিক বন্ধ্যাত্ব (Primary Infertility) ঃ যখন কোন দম্পতি কোন ধরণের জন্মনিরোধক ব্যবহার ছাড়া এক বছর এক সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করার পরও কোন সন্তান লাভে সক্ষম নয়।

সেকেন্ডারী বা অর্জিত বন্ধ্যাত্ব (Secondary Infertility) ঃ কোন দম্পতি দাম্পত্যজীবনের কোন এক সময় গর্ভসঞ্চার করেছিল বা পূর্ববর্তী কোন সময় সন্তান ধারণ করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে কোন জন্মনিরোধক ব্যবহার না করে দাম্পত্যজীবন যাপন করার **১২** মাসের মধ্যে গর্ভধারণে সক্ষম নয়।

বন্ধ্যাত্ব কেন হয়?

কোন মানুষের ডায়াবেটিস বা রক্তের ক্যান্সার হলে আমরা যেমন সেই মানুষটিকে দোষী করতে পারি না, একইভাবে যিনি বন্ধ্যাত্বের শিকার তাকেও দোষ দেয়া যায় না। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ৩০% ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষের কারণে; ৩০% ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীর কারণে; ৩০% নারী ও পুরুষ উভয়ের কারণে বন্ধ্যাত্ব হয়ে থাকে; ১০% ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষ কারো কোন সমস্যা পাওয়া যায় না (Unexplained Infertility)।

বন্ধ্যাত্বের কারণ

(ক) পুরুষের কারণে বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণসমূহ ঃ

- পুরুষের বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণ শুক্রাণুর অনুপস্থিতি (Azoospermia)- বীর্যপাত স্বাভাবিক এবং বীর্য দেখতে স্বাভাবিক হলেও অনেক বীর্যে একটিও শুক্রাণু থাকে না।
- শুক্রাণুর কমতি (Oligospermia) অল্প কিছু শুক্রাণু তৈরী হয়।
- কখনও কখনও শুক্রাণুর নড়া চড়া খুব ধীর গতির হতে পারে (Asthenospermia)
- শুক্রাণু বিকলাঙ্গ হতে পারে বা আকৃতিগত ত্রুটি থাকলে অথবা শুক্রাণুগুলো ডিম্বানুর কাছে পৌঁছানোর আগেই মারা যেতে পারে।
- উভয় দিকের প্রজনন নালী বন্ধ হলে
- নপুংশকতাও (Impotence-পুরুষাঙ্গ উত্থিত না হওয়া) বন্ধ্যাত্বের কারণ।
- কদাচিৎ ক্রোমোজোম ঘটিত অসুখের কারণেও পুরুষের বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

(খ) মহিলাদের কারণে বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণ সমূহ ঃ

- নারীর বন্ধ্যাত্বের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো ডিম্বাণু তৈরী বা ডিম্বস্ফুটন না হওয়া।

অন্যান্য কারণগুলো হলো-

- ডিম্ববাহী নালী বন্ধ হয়ে যাওয়া (আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দুই দিকের ডিম্বনালী বন্ধ থাকলে)।
- পেলভিক এডহেশন (Pelvic adhesion) এর ফলে ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বনালীতে যেতে না পারলে, বিশেষ করে পিআইডি, আরটিআই/এসটিডি হলে পেলভিক এডহেশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
- জরায়ুর জন্মগত ত্রুটি, ক্রোমোজোমের সমস্যা ইত্যাদি।
- মাসিকের অনিয়ম
- দীর্ঘমেয়াদী অসুখ (যক্ষা, ডায়বেটিস)

(গ) যৌন মিলনে ত্রুটিজনিত ঃ ত্রুটিপূর্ণ যৌন মিলন

- আদৌ যৌন সঙ্গম ঘটেনি বা যৌন সঙ্গমে ব্যথাজনিত সমস্যা থাকলে
- যৌন মিলনের হার কম এবং মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ে মিলন না হলে
- পিচ্ছিল পদার্থ ব্যবহারের কারণে শুক্রাণুর মৃত্যু।

বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্ণয়

যদি একটি দম্পতি পূর্ণ এক বছর একসঙ্গে বসবাস করে নিয়মিত ভাবে অরক্ষিত সহবাস করার পরেও (কোন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ না করে) গর্ভধারণ করতে না পারেন তবেই বন্ধ্যাত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। এছাড়া প্রজননতন্ত্রে কোন অসুবিধা বা টিউমার থাকলে, মাসিকের অনিয়ম থাকলে, কোন দীর্ঘ মেয়াদী অসুখ থাকলে, স্বামী-স্ত্রীর বয়স বেশী হলে, স্বামী স্ত্রী একই স্থানে থাকতে না পারলে, সন্তান গ্রহণের জন্যে সত্বর চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। চিকিৎসক স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিস্তারিত ইতিহাস গ্রহণ করেন। যেমন- নিয়মিত সঠিক ভাবে সহবাস করেন কি না, মাসিকের ইতিহাস অন্যকোন সমস্যা আছে কি না এবং উভয়ের শারীরিক পরীক্ষা করেন (শরীরের সুস্থতা যাচাই, যথা-যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস ইত্যাদি অসুখ আছে কি না এবং বন্ধ্যাত্বের কোন শারীরিক কারণ আছে কি না)। যদি এতে কোন কারণ পাওয়া না যায় তবে নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা করতে দেন। নারীর প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ডিম্বাণু তৈরী হয় কি না তার পরীক্ষা (সাধারণতঃ আলট্রাসনোগ্রাম ও হরমোন পরীক্ষা), ডিম্ববাহী নালী ও জরায়ু স্বাভাবিক কি না তার জন্য পরীক্ষা (হিসটেরোসালফিংগোগ্রাম বা ল্যাপারোস্কপি)। বীর্য পরীক্ষা হলো পুরুষের প্রাথমিক পরীক্ষা। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় ডিএন্ডসি আজকাল সাধারণত করা হয় না, বরং এতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। পুরুষের পরীক্ষা নারীর পরীক্ষার চেয়ে সহজ, কম ব্যয় ও কম কষ্ট সাপেক্ষ। তাই নারীর কোন উপসর্গ বা লক্ষণ না থাকলে প্রথমে পুরুষের পরীক্ষা করা উচিত।

বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধ

বন্ধ্যাত্ব সাধারণত প্রতিরোধ করা যায় না। তারপরেও সুস্থ, স্বাভাবিক ধর্মীয় জীবন যাপন করার পাশাপাশি কিছু কিছু আচরণ বন্ধ্যাত্বের সম্ভাবনা কমাতে পারে। এইগুলো সমানভাবে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য-

- ওজন ঠিক রাখা। ওজন অতিরিক্ত বেড়ে বা কমে গেলে নানাবিধ হরমোনজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- ধুমপান, তামাক সেবন, মদ্যপান নেশাজনিত সামগ্রির ব্যবহার পরিহার/ত্যাগ করা এসবের ব্যবহারের ফলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমে যায় এবং গর্ভপাতের ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মের হার বেড়ে যায়।

- প্রয়োজন ছাড়া ঔষধ না খাওয়া।
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।
- স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক না রাখা। যৌনবাহিত রোগ বা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের ফলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বিভিন্ন কারণে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে সুতরাং এসব সংক্রমণ থেকে বেঁচে থাকা বা সত্বর চিকিৎসা করা দরকার। প্রয়োজনে দ্বৈত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে কনডম গ্রহণ করতে হবে।
- সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া। যক্ষা, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগের ফলে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। এর প্রতিরোধ, নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণ বন্ধ্যাত্বের সম্ভাবনা কমায়।

চিকিৎসা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও কখনও অপারেশন করা হয়। এছাড়া বীর্যের সমস্যার কারণে স্বামীর বীর্য সরাসরি জরায়ুর ভিতরে স্থাপন করা যায় (Intrauterine Insemination)। কদাচিৎ টেষ্ট টিউব বেবী (Assisted Reproductive Technique) এর প্রয়োজন হতে পারে। চিকিৎসা প্রাপ্তদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ দম্পতিই সফলভাবে সুস্থ শিশু পেতে পারেন।

প্রাথমিকভাবে মাসিক চক্রের নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত সহবাস (মাঝের ১০ দিন), নারী বা পুরুষের ওজন নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ রোগের (যেমন- যক্ষা, ডায়াবেটিস) চিকিৎসার ফলে অনেকেই গর্ভধারণ করেন। পুরুষের চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে- ধুমপান বা মাদকসেবন বন্ধ করলে অনেকের বীর্যের অবস্থার উন্নতি হয়। যৌন সমস্যার সমাধান যেমন নপুংশকতা, অপরিপক্ক বীর্যপাত হয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকলে বিভিন্ন আচরণগত উপদেশ দেয়া হয় ও ঔষধ ব্যবহার করা হয়। শুক্রাণুর অনুপস্থিতি বা স্বল্পতা অপারেশনের মাধ্যমে কোন কোন সময় সারানো হয়। বিভিন্ন ঔষধের সাহায্যে নারীর ডিম্বাণু তৈরী এবং ডিম্বস্ফুটনের ব্যবস্থা করা হয়। এসব ঔষধে উপকারের পাশাপাশি কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এবং ঝুঁকি আছে। এগুলো সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। কখনো কখনো ডিম্বকোষ, ডিম্ববাহী নালী বা জরায়ুর অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে। জরায়ুতে বীর্যস্থাপন (Intrauterine Insemination) পদ্ধতিতে স্বামীর বীর্য বিশেষভাবে তৈরী করে নিয়ে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জরায়ুর ভিতরে স্থাপন করা হয়। স্বামীর বীর্যে শুক্রাণুর স্বল্পতা, শুক্রাণুর ধীরগতিতে নড়াচড়া করা বা কখনো অজানা কারণে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সহায়তার মাধ্যমে গর্ভধারণ (Assisted Reproductive Technique)

এর কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণঃ (In-vitro Fertilization (IVF) বা Cytoplasmic Sperm Injection ICSI) এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত এই পদ্ধতি "টেষ্ট টিউব বেবি" পদ্ধতি নামে

পরিচিত। পদ্ধতিটি সময় সাপেক্ষ, ব্যয় বহুল এবং কষ্টসাধ্য। ঝুঁকিও বেশী। সফলতার হার তুলনামুলকভাবে কম (চারজন চেষ্টা করলে একজন সফল হবার সম্ভাবনা)। নারীর ডিম্ববাহী নালী বন্ধ থাকলে বা শুক্রাণু খুব কম হলে সাধারণত এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। ডিম্বাণু তৈরীর সমস্যা বা অজানা কারণে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসাও কখনো কখনো এই পদ্ধতিতে করা হয়।

(IVF) পদ্ধতিতে ঔষধের মাধ্যমে নারীর কয়েকটি ডিম্বাণু তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়। ডিম্বস্ফোটনের ঠিক আগে পুর্ণাঙ্গ ডিম্বাণুকে নারীর শরীর থেকে বের করে নিয়ে ল্যাবরেটরীতে ইনকিউবেটরে রাখা হয়। পাশাপাশি পুরুষের বীর্য সংগ্রহ করে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক শুক্রাণুগুলো বেছে নিয়ে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। তারপর একটি পেট্রিডিশে (থালার মতো ছোট কাচের পাত্র) ডিম্বাণু ও শুক্রাণুগুলো বিশেষ তরল পদার্থের মধ্যে রেখে দেয়া হয়। এভাবে দেহের বাইরে একটি শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলো (৩-৫ দিন পরে) ২ বা ৩টি নিষিক্ত ডিম্বাণুকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে সরাসরি জরায়ুর ভিতরে স্থাপন করা হয়।

(ICSI) পদ্ধতি সাধারণত: শুক্রাণু একেবারেই কম থাকলে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক শুক্রাণুকে সুক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিম্বাণুর ভিতর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে, পেট্রিডিশে, সুক্ষ্ম পিপেটের সাহায্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। নিষিক্ত ডিম্বানুগুলোকে ইনকিউবেটরে রাখা হয় এবং ৩-৫ দিন পর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি জরায়ুতে স্থাপন করা হয়।

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা কে করেন এবং কোথায় হয়

একজন চিকিৎসক বন্ধ্যাত্বের সেবা প্রাথমিকভাবে শুরু করতে পারেন। যেমন:

- বন্ধ্যাত্বের সাধারণ কারণ নির্ণয়, সাধারণ অসুখ বা রোগ (যক্ষা, ডায়াবেটিস) নির্ণয়, চিকিৎসা করা বা রেফার করা।
- গর্ভ ধারণ করার লক্ষ্যে মাসিক চক্রের কোন সময়ে সহবাস করা জরুরী এই সম্বন্ধে উপদেশ
- ধুমপান, মদ্যপান ও নেশাগত দ্রব্য সেবন ত্যাগ করতে সাহায্য করা এবং উৎসাহ যোগানো
- ইতিহাস, শারীরিক পরীক্ষা ও সাধারণ ল্যাবরেটরী পরীক্ষায় সমস্যা ধরা পড়লে ধাত্রী বিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে বা বন্ধ্যাত্ব/ হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করা প্রয়োজন।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিভিন্ন জেলার সদর হাসপাতাল, কোন কোন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে (MCWC) তে, কিছু কিছু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ধাত্রী বিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কার্য্যে নিয়োজিত আছেন, তারা তাদের দক্ষতা ও প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে নানাবিধ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বিশেষভাবে বন্ধ্যাত্বের উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ তারাই বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করেন।

বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ববোধ

আমদের দেশসহ প্রায় সব দেশেই কোন দম্পতির বন্ধ্যাত্বের জন্য এককভাবে স্ত্রীকেই দায়ী করা হয়। ফলে নারীর জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। এমনও দেখা গেছে কোন দম্পতি সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলেই কোন ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই স্ত্রীকে দায়ী করে স্বামী পুনরায় বিয়ে করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। কিন্তু বর্তমান আর্থসামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সাথে সাথে প্রজননে অক্ষমতার জন্য আর নারীকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। এ ক্ষেত্রে স্বামী কিংবা স্ত্রী যে কেউ দায়ী হতে পারে অথবা উভয়েরই অসুবিধা থাকতে পারে। আজ সারা বিশ্বে বন্ধ্যাত্ব নামক সমস্যা প্রকট। আর এর সমাধানের জন্য চাই ব্যাপক সচেতনতা। এই সমস্যাকে কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকিয়ে না রেখে সকলকেই সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এর জন্য যেমন একজন চিকিৎসকের দায়িত্ব রয়েছে, তেমন রয়েছে একজন স্বাস্থ্যকর্মী বা সমাজকর্মীর। আর সব থেকে বেশী দায়িত্ব পালন করতে পারে স্বামীরা অথবা পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। প্রয়োজনে স্বামীরা স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের মাধ্যমে প্রজনন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিবে এবং বাস্তব জীবনে তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে চেষ্টা করবে। এর পরও সফল না হলে চিকিৎসার জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়েই ডাক্তারের পরামর্শ নিবে এবং বন্ধ্যাত্ব এর দায়-দায়িত্ব দু'জনেই সমানভাবে ভাগ করে নিবে।

যা জানা থাকা ভালো

প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়। এর জন্য নারী বা পুরুষ কাউকে দোষী করা যায় না।

- শতকরা প্রায় দশজন দম্পতির জীবনে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা দেখা দেয়। বন্ধ্যাত্ব পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের উপর সমান প্রভাব ফেলে ও বিচলিত করে।
- বেশির ভাগ বন্ধ্যাত্বের সমস্যা সাধারণ চিকিৎসা যেমন- (ঔষধ বা অপারেশন) দ্বরা নিরাময় করা যায়।
- বন্ধ্যাত্বের অত্যাধুনিক চিকিৎসা যেমনঃ আইভিএফ (টেষ্ট টিউব বেবী) খুব কম সংখ্যক দম্পতির জন্য প্রয়োজন হতে পারে।
- সন্তান ধারণ জীবনের জন্য প্রয়োজন। তবে সন্তান যে হতেই হবে ব্যাপারটি এমন নয়। নিজেদের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে চিকিৎসক, স্বামী/স্ত্রী, পরিজন, প্রতিবেশী ও সমাজের সবার সহযোগীতায় এরা সুখী, স্বাভাবিক ও অর্থবহ জীবন যাপন করতে পারেন।

পাঠ-১৫

খাবার বড়ি ব্যবহারকারীদের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, জটিলতা ও ব্যবস্থাপনা

জন্মনিয়ন্ত্রণের মিশ্র বড়ির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার ব্যবস্থাপনা ঃ

সমস্যা	যা অনুসন্ধান করতে হবে	সমাধান
১। মাসিক স্রাব বন্ধ	ক) গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তিনি কিভাবে বড়ি খাচ্ছেন। বড়ি খেতে ভুলে গেলে অথবা প্রতিদিন একই সময় বড়ি না খেলে, গর্ভধারণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।	খ) প্রতি দিন নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে বড়ি খাওয়ার পরামর্শ দিন এবং বড়ি খেতে ভুলে গেলে কি নিয়মে বড়ি খেতে হবে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিন।
	খ) গ্রহীতা গর্ভবতী কি না তা লক্ষণ দেখে এবং শারীরিক পরীক্ষার সাহায্যে নির্ধারণ করতে হবে।	খ) গর্ভবতী হলে বড়ি খেতে নিষেধ করতে হবে এবং প্রসবপূর্ব যত্নের জন্য ক্লিনিকে পাঠাতে হবে। গর্ভবর্তী না হলে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, এতে কোন সমস্যা হবে না।
	গ) স্বল্পমাত্রার বড়ি (৩৫ মাইক্রোগ্রাম বা তার কম) খাচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করতে হবে।	গ) সঠিক নিয়মে বড়ি খেয়ে থাকলে গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে এতে উদ্বেগের কিছু নেই। এরপরও গ্রহীতা আশ্বস্ত না হলে তাকে স্বল্পমাত্রার বদলে তিন চক্র সাধারণ মাত্রার বড়ি ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে।
	ঘ) বড়ি খাওয়া বন্ধ করেছেন কি না তা গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।	ঘ) নিশ্চিত হতে হবে যে গ্রহীতা গর্ভবতী নয়। গর্ভবতী না হলে বুঝতে হবে যে, মিশ্র বড়ি খাওয়ার আগে মাসিক অনিয়মিত থেকে থাকলে, বড়ি খাওয়া বন্ধ করলে আবার মাসিক অনিয়মিত হবে। এমন কি তা ফিরে আসতে কয়েকমাস লাগতে পারে। গ্রহীতা চাইলে তাকে অন্য একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

২। ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব বা দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব।	ক) গ্রহীতা মিশ্র বড়ি অল্পদিন আগে শুরু করেছেন কি না।	ক) গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, বড়ি শুরু করার প্রথম তিন চার মাস পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।
	খ) গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তিনি একটি বা তার বেশী বড়ি খেতে ভুলে গেছেন কি না, অথবা তিনি একেক দিন একেক বড়ি খান কি না।	খ) হ্যাঁ হলে, মাসিক চক্রের মাঝখানে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা কমানোর জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বড়ি খাবার পরামর্শ দিন এবং বড়ি খেতে ভুলে গেলে কি নিয়মে বড়ি খেতে হবে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিন।
	গ) গ্রহীতার প্রচন্ড বমি অথবা ডায়রিয়া হয়েছিল কি না তা জিজ্ঞেস করতে হবে।	গ) বমি বা ডায়রিয়া হয়ে থাকলে আশ্বস্ত করতে হবে যে, সে জন্য রক্তে বড়ির কার্যকর মাত্রা অর্জিত হয়নি। গ্রহীতাকে বমি এবং ডায়রিয়া না সারা পর্যন্ত বড়ির পাশাপাশি কনডম ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে হবে।
	ঘ) পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে, গ্রহীতা গর্ভধারণ করেননি বা গর্ভপাত হয়নি এবং টিউমার, যৌনাঙ্গে প্রদাহিক ব্যাধি বা অন্য কোন স্ত্রীরোগ নেই।	ঘ) স্ত্রীরোগজনিত সমস্যা থাকলে পরামর্শের জন্য চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে।
	ঙ) উপরের কোনটিই নয়।	ঙ) যদি কোন স্ত্রীরোগ, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা অন্যান্য কোন কারণ সনাক্ত করা না যায় তা হলে ধরে নিতে হবে যে, জরায়ূর ভেতরের দেয়ালের আবরণ অপর্যাপ্ত হবার কারণে এমনটি হচ্ছে। এক্ষেত্রে গ্রহীতাকে অধিক প্রজেষ্টেরন সমৃদ্ধ (নরজেসট্রিল বা লেভেনরজেসট্রিল) বড়ি খাবার পরামর্শ দিতে হবে। গ্রহীতা যদি তা

		খেতে থাকেন তাহলে তাকে কয়েক চক্রের জন্য স্বল্পমাত্রার বদলে সাধারণ মাত্রার (৫০ মাইক্রোগ্রাম এস্ট্রোজেন) বড়ি ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে হবে। তারপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব স্বাভাবিক হয়ে গেলে আবার স্বল্পমাত্রার বড়িতে ফিরে আসা যাবে। যদি আাবারো এরকম লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে গ্রহীতাকে সাধারণ মাত্রার বড়িই খাবার পরামর্শ দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মাত্রার বড়িতে এরকম হলে প্রতিদিনের নিয়মিত বড়ির সঙ্গে আরো একটি করে বড়ি রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খেয়ে যেতে বলতে হবে। সেক্ষেত্রে গ্রহীতা যাতে অবশ্যই ধুমপান না করেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৩। বমি বমি ভাব	ক) হাতের কাছের সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে মহিলা গর্ভবতী কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	ক) গর্ভবতী হলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করে গর্ভকালীন যত্নের জন্য ক্লিনিকে প্রেরণ করতে হবে।
	খ) গ্রহীতা সকালে অথবা খালি পেটে খায় কি না দেখতে হবে।	খ) বমি বমি ভাব কমাতে হলে রাতের খাবারের সাথে বড়ি খেতে হবে। সাধারণতঃ বড়ি ব্যবহারের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই বমি বমি ভাব কমে যায়।
	গ) বমি বমি ভাবের অন্য কোন কারণ আছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে।	গ) রোগ সংক্রমণ (পিত্তথলির সংক্রমণ, হেপাটাইটিস, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস) হয়েছে কি না পর্যালোচনা করতে হবে।
	ঘ) উপরের কোন কারণই বমি বমি ভাবের জন্য দায়ী নয়।	ঘ) এ পদ্ধতি পরিবর্তন করে গ্রহীতার জন্য উপযোগী অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে সাহায্য করতে হবে।

৪। মাথা ধরা	ক) গ্রহীতার নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে কি না বা সাইনাসে স্পর্শে বেদনা আছে কি না নির্ধারণ করতে হবে।	ক) সাইনোসাইটিস থাকলে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে।
	খ) গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তার কখনো উচ্চ রক্তচাপ ছিল কি না?	খ) উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস থাক বা না থাক রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে। রক্তচাপ বেশী হলে "উচ্চ রক্তচাপ" অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।
	গ) পেশী সংকোচন এবং মাইগ্রেনজনিত মাথা ব্যথা সনাক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। পেশী সংকোচনজনিত মাথা ব্যথা সাধারণতঃ মাথার সামনে বা ভিতরের দিকে হয়, দুই পাশে সমানভাবে চাপের মত অনুভূত হয়। অন্যদিকে মাইগ্রেন মৃদু থেকে মারাত্মক হতে পারে। কপালের পাশে তীব্র ব্যথা হতে পারে এবং বমি বা বমি বমি ভাব হতে পারে। রোগী মাথা ব্যথা যে হবে তা পূর্ব থেকেই টের পান। **মাইগ্রেন এর পূর্ব লক্ষণ নিম্নরূপ ঃ** কোন কোন রোগ স্নায়বিক বিভিন্ন উপসর্গে ভোগেন, যেমন- ● দৃষ্টি সমস্যা- ঝলকানো আলো, সব জিনিস দুটো	গ) স্নায়ুবিক উপসর্গ উপস্থিত থাকলে বুঝতে হবে এটি মাইগ্রেনজনিত ব্যথা। গ্রহীতার স্ট্রোক হবার ঝুঁকি বিদ্যমান। অবশ্যই ধূমপান বা তামাক পাতা সেবন না করার পরামর্শ দিতে হবে। স্নায়ুবিক উপসর্গ থাকলে খাবার বড়ি বন্ধ করতে হবে। ইনজেকশন বা অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে হবে। যদি কোন মহিলা স্নায়ুবিক উপসর্গ ছাড়া মাথা ব্যথার কথা বলেন তাহলে খাবার বড়ি চালানো যায়। গ্রহীতাকে মাথা ব্যথা কখন, কবে ও কত সময় ধরে হয়েছিল ইত্যাদি মনে রাখার পরামর্শ দিতে হবে।

	করে দেখা বা দেখতে না পাওয়া। • হাত-পা অবশ বোধ করা। • কথা বলা বা স্মৃতি শক্তির সমস্যা।	
	ঘ) গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তাঁর বড়ি খাওয়া শুরু করার পর থেকে মাথা ধরা বেড়েছে কি না।	ঘ) মাথা ধরা বেড়ে থাকলে এ পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ না থাকলে বা স্নায়ুবিক উপসর্গ বেশী না হলে মিশ্র বড়ি খাওয়া চালিয়ে যাওয়া যায়।
৫। উচ্চ রক্তচাপ	জিজ্ঞেস করতে হবে গ্রহীতার উচ্চ রক্তচাপ প্রথমবারের মতো ধরা পড়লো কি না। ক) যদি রক্তচাপ ১৪০-১৫৯/৯০-৯৯ মি:মি: মার্কারীর মধ্যে হয়।	ক) যদি গ্রহীতার রক্তচাপ ১৪০-১৫৯/৯০-৯৯ মিলিমিটার মার্কারীর মধ্যে হয় তবে বড়ি খাওয়া চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে।
	খ) যদি রক্তচাপ ১৬০/১০০ মিলিমিটার মার্কারীর উপরে হয়।	খ) যদি রক্তচাপ ১৬০/১০০ মি:মি: এর উপরে হয়, হবে তাকে মিশ্র বড়ি না দিয়ে এস্ট্রোজেনবিহীন কোন পদ্ধতি যেমন- প্রজেস্টিন নির্ভর ইনজেকশন বা অন্য কোন পদ্ধতি নিতে পরামর্শ দিতে হবে।
	গ) যদি পরবর্তী নিয়মিত সাক্ষাতে রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি:মি: এর নিচে হয়।	গ) যদি পরবর্তী নিয়মিত সাক্ষাতে রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি:মি: এর নিচে হয় তবে বড়ি খাওয়া চালিয়ে যেতে বলুন।
	ঘ) যদি পরবর্তী নিয়মিত সাক্ষাতে রক্তচাপ পুনরায় ১৪০-১৫৯/৯০-৯৯ মিলিমিটার মার্কারীর মধ্যে হয়।	ঘ) যদি পরবর্তী নিয়মিত সাক্ষাতে রক্তচাপ পুনরায় ১৪০-১৫৯/৯০-৯৯ মি:মি: এর মধ্যে হয় তবে গ্রহীতাকে মিশ্র বড়ি খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দিতে হবে কারণ বড়ি তার

		জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নয়। কিন্তু সে যদি বড়ি খাওয়া চালিয়ে যেতে চান তাহলে প্রতিটি নিয়মিত সাক্ষাতে রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে।
৬। স্তন ভারী বোধ হওয়া এবং স্পর্শ বেদনা।	ক) গর্ভধারণের ইতিহাস গ্রহণের মাধ্যমে এবং প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে নির্ধারণ করতে হবে গ্রহীতা গর্ভবতী কি না।	ক) মহিলা গর্ভবতী হলে বড়ি ব্যবহার বন্ধ করে গর্ভকালীন যত্নের জন্য ক্লিনিকে পাঠাতে হবে। স্তনের স্পর্শ বেদনা যদি গর্ভধারণের কারণে না হয়ে থাকে, তাহলে সাধারণত বড়ি শুরু করার তিন-চার মাসের মধ্যে তা কমে যায়।
	খ) গ্রহীতার স্তনে চাকা অথবা বোঁটা থেকে পুঁজ বের হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ রকম হলে ক্যান্সার হওয়ার সন্দেহ থাকে।	খ) শারীরিক পরীক্ষায় যদি স্তনে চাকা বা পুঁজ নি:সরণ থেকে ক্যান্সারের সন্দেহ হয় তাহলে বড়ি বন্ধ করে তাকে অন্য একটি পদ্ধতি পছন্দ করতে সাহায্য করতে হবে। তাকে চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে।
	গ) যদি গ্রহীতা বুকের দুধ খাওয়ান এবং স্তনে স্পর্শ বেদনা থাকে, তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে স্তনে সংক্রমণ হয়েছে কি না।	গ) স্তনে জীবাণু সংক্রমণ না থাকলে স্তন স্বাভাবিক রাখার জন্য উপযুক্ত পোশাকের পরামর্শ দিতে হবে। স্তনে প্রদাহ থাকলে হালকা গরম সেক দিতে হবে এবং স্তন্যদান চালিয়ে যেতে হবে। সংক্রমণ হয়ে থাকলে চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে।
৭। বিমর্ষতা	ক) গ্রহীতাকে বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞেস করতে হবে। পারিবারিক, আর্থিক বা সামাজিক কারণের জন্য বিমর্ষতা হতে পারে।	ক) উপযুক্ত পরামর্শ দিতে হবে এবং পরবর্তী সাক্ষাতে বিমর্ষতার পরিবর্তন যাচাই করতে হবে।
	খ) অন্য কোন কারণ না পাওয়া গেলে, জিজ্ঞেস করতে হবে	খ) মিশ্র বড়ি খাওয়ার পর থেকে যদি বিমর্ষতা বেড়ে থাকে, তাহলে তাকে হরমোন ছাড়া অন্য

	জন্মনিয়ন্ত্রণের মিশ্র বড়ি খাওয়ার পর থেকে বিমর্ষতা বেড়েছে কি না।	পদ্ধতি গ্রহণ করতে সাহায্য করতে হবে। যদি মিশ্র বড়ি খাওয়ার কারণে বিমর্ষতা না বেড়ে থাকে, তাহলে বড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়।
৮। অনাকাঙ্খিত ওজন বৃদ্ধি বা ওজন হ্রাস।	ক) গ্রহীতার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অপরিমিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ওজনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে।	ক) গ্রহীতাকে উপযুক্ত খাদ্য, পুষ্টি এবং ব্যায়াম সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে।
	খ) খাদ্যাভ্যাস ঠিক থাকা সত্ত্বেও যদি রুচি ও ওজন বৃদ্ধির অভিযোগ হয় তাহলে এই বর্ধিত ওজন তার কাছে অনাকাঙ্খিত কি না তা জিজ্ঞেস করতে হবে।	খ) গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, সকল হরমোন নির্ভর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিরই ওজনের উপর কিছুটা প্রভাব রয়েছে। তবে মিশ্র খাবার বড়িতে যে মাত্রায় হরমোন থাকে তা খুবই সামান্য এবং ওজন বৃদ্ধিতে এর প্রভাব নগণ্য।
৯। ক্লোজমা বা গর্ভাবস্থায় মুখের ত্বকের রঙের পরিবর্তন।	ক) অন্যান্য কারণ অনুসন্ধান করতে হবে যেমন গর্ভাবস্থা, কড়া রোদে থাকা, পারদ মিশ্রিত ক্রীম ব্যবহার করা ইত্যাদি।	ক) ক্রীম না মাখতে বা কড়া রোধে না যেতে পরামর্শ দিতে হবে। সাম্প্রতিক গর্ভাবস্থার ইতিহাস থাকলে তিনমাস অপেক্ষা করার পরামর্শ দিতে হবে।
	খ) রিং ওয়ার্ম বা অন্য কোন চর্মরোগ থাকতে পারে।	খ) উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য রেফার করতে হবে।
	গ) কোন কারণ পাওয়া না গেলে এবং অবস্থার উন্নতি না হলে।	গ) কোন কারণ পাওয়া না গেলে এবং মুখের ত্বকে রং এর পরিবর্তন গ্রহীতার কাছে অসহনীয় হলে এবং তা খাবার বড়ির সাথে সম্পৃক্ত হলে গ্রহীতাকে অন্য একটি পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করতে হবে।
১০। ব্রণ	ক) গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তিনি কয়বার মুখ ধুয়ে থাকেন।	ক) তাকে দিনে দুইবার লেবুর রস মিশ্রিত পানি দিয়ে মুখ ধুতে বলতে হবে, মুখে তেল বা ক্রীম মাখতে নিষেধ করতে হবে, বেশী করে পানি

		খেতে বলতে হবে এবং নিয়মিত ভাবে হাতের নখ কাটতে পরামর্শ দিতে হবে।
	খ) গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, বর্তমানে তিনি শারীরিক বা মানসিক চাপের মধ্যে আছেন কি না।	খ) থাকলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে।
খাবার বড়ি মহিলাদের দুর্বল করে না। উপরন্তু, খাবার বড়ি খাওয়ার পর মহিলারা আরো শক্তি সামর্থ্য হন কেননা এটা তাদের রক্তস্বল্পতা দূর করে। খাবার বড়ি খেলে প্রতি মাসিকের সময় কম রক্তস্রাব হয় এইভাবেই খাবার বড়ি মহিলাদের রক্তস্বল্পতা দূরীকরণে সহায়তা করে থাকে।		

পাঠ-১৬

খাবার বড়ি ব্যবহারকারীদের ফলো-আপের সহায়ক তালিকা

খাবার বড়ি ব্যবহারকারীদের ফলো-আপের সহায়ক তালিকা

যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রহীতার সহিত সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

১। মহিলা কি প্রত্যেক দিন তার স্বামী বাড়ীতে থাক বা না থাক বড়ি খাচ্ছেন ? বড়ি খেতে মাঝে মাঝে ভুলে যান কি ?

যদি গ্রহীতা একটি বড়ি খেতে ভুলে যান তাহলে মনে পড়ার সাথে সাথে সেটি খেয়ে নিবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঐ দিনের নির্দিষ্ট বড়ি ও খাবেন। অর্থাৎ ঐ দিন দুইটি খাবেন। যদি পর পর দুই দিন বড়ি খেতে ভুলে যান, তাহলে মনে পড়ার সাথে সাথে দুইটি বড়ি খাবেন ও পরের দিন ২টি বড়ি খাবেন এবং পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট বড়ি খাবেন ও পাশাপাশি কনডম ব্যবহার করবেন। পর পর ৩ দিন বড়ি খেতে ভুলে গেলে বড়ির কার্যকারিতা বজায় থাকবে না এবং সম্ভবতঃ মাসিক শুরু হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বড়ি খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে কনডম ব্যবহার করবেন।

২। মহিলা কি প্রায় প্রচন্ড মাথা ব্যথায় ভুগছেন বা চোখে ঝাপসা দেখেন ?

রক্তস্বল্পতা থাকলে Iron এবং Folic Acid দিয়ে চিকিৎসা করুন এবং পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ দিন। রক্তচাপ মেপে নিন। যদি রক্তচাপ ১৪০/৯০ মিলি মিটার মার্কারী (mm Hg) এর বেশী হয় তাহলে মহিলাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন।

৩। মহিলার চোখ, চামড়া ও প্রস্রাব হলুদ হয়েছিল কি ?

চোখ, চামড়া ও প্রস্রাব হলুদ হলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করার পরামর্শ দিন এবং অন্যান্য পদ্ধতি যেমন- আই ইউ ডি, কনডম বা ফেনা বড়ি ব্যবহার করার পরামর্শ দিন। জন্ডিস হওয়ার পর কমপক্ষে ১ বৎসর মহিলার খাবার বড়ি খাওয়া উচিত না।

৪। অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট হয় বা হাঁপিয়ে যান কি ?

মহিলা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন কি না তা দেখতে হবে। রক্তস্বল্পতা থাকলে Iron এবং Folic Acid দিয়ে চিকিৎসা করুন। তাছাড়া মহিলাকে পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ দিন। রক্তাস্বল্পতা না থাকা যদি অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট হয় বা হাঁপিয়ে যায় তাহলে মহিলাকে বড়ি খাওয়া বন্ধ করতে বলুন। অন্যান্য পদ্ধতির পরামর্শ দিন এবং তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন।

৫। মহিলার প্রচন্ড বুকে ব্যথা, কাশি এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয় কি ?

মহিলাকে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন এবং বড়ি বন্ধ করে দিন।

৬। স্তনে কোন চাকা আছে কি ?

চাকা থাকলে, মহিলাকে তাৎক্ষণিকভাবে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন।

৭। মাসিক পর পর দু'মাস বন্ধ আছে কি ?

থাকলে, পিভি পরীক্ষা করুন। জরায়ূর আকার বড় হলে এবং জরায়ূর মুখ নরম থাকলে বুঝবেন যে মহিলা গর্ভবতী। বড়ি খাওয়া বন্ধ করার পরামর্শ দিন। প্রেগনেন্সি টেষ্ট করান, প্রয়োজন হলে এম, আর- এর পরামর্শ দিন।

সাবধানে পিভি পরীক্ষা করুন। যদি মহিলার অতিরিক্ত ব্যথা হয় তাহলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন। ডিম্বনালীতে গর্ভসঞ্চার হতে পারে। পেলভিক প্রদাহ থাকলে এ্যামপিসিলিন ক্যাপসুল এবং মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করুন।

৮। মহিলার মাসিক কি অনিয়মিত বা সহবাসের পর যোনিদ্বার দিয়ে প্রায়ই রক্তক্ষরণ হয় কি ?

মহিলাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন। (টিউমারের লক্ষণ)

৯। মহিলা কি পায়ের পিছনের মাংসপেশীতে কয়েকদিন স্থায়ী প্রচন্ড ব্যথায় ভুগছেন ?

তাৎক্ষণিকভাবে মহিলাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিন। (শিরাতে রক্ত জমাট বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা)

১০। মহিলা কি অতিরিক্ত পিপাসাবোধ করেন ও রাতে বেশী পরিমাণে ঘন ঘন প্রস্রাব করেন ? অথবা প্রস্রাব করার পর প্রস্রাবের স্থানে পিপড়া জমা হতে দেখেছেন ?

মহিলার বহুমূত্র হতে পারে। তাৎক্ষনিকভাবে ডাক্তারের কাঠে পাঠিয়ে দিন।

১১। মহিলার হাত পা জ্বালা করে কি ? চোখ মুখ পোড়ায় ?

মহিলা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রক্তস্বল্পতা থাকলে Iron এবং Folic Acid ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করুন। তাছাড়া মহিলাকে আয়রন এবং ভিটামিন "বি" যুক্ত খাবারের পরামর্শ দিন। মহিলাকে প্রচুর পরিমাণ পানি খেতে বলুন এবং সঙ্গে শাকসবজি খেতে বলুন।

১২। মহিলার কাছে ৩ মাসের জন্য যথেষ্ট বড়ি আছে কি না ?

গ্রহীতার ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষা করে বড়ি দেয়া যাবে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। বড়ি না থাকলে কমিউনিটি প্যারামেডিক তা সরবরাহ করবেন।

পাঠ-১৭

জন্মনিরোধক ইনজেকশন পদ্ধতি

ভূমিকা ঃ

বর্তমানে প্রচলিত জন্মরোধক পদ্ধতি সমূহের মধ্যে হরমোন ইনজেকশন অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি। আমাদের দেশে এক ধরনের ইনজেকশন আছে; ডিএমপিএ বা ডিপোপ্রভেরা। এই ইনজেকশন দেয়ার পর তিন মাস এর কার্যকারিতা বজায় থাকে।

১৯৬০ সালের আগ থেকে ডিএমপিএ উপাদানটি বিভিন্ন রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন- এন্ডোমেট্রিওসিস, গর্ভপাতের আশংকা, এন্ডোমেট্রিয়াল কারসিনোমা, রেনাল ক্যান্সার ইত্যাদি। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৬৩ সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি হিসেবে ডিএমপিএ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে ১৯৭৫ সাল থেকে এটি চালু করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সুইডেন, বেলজিয়াম ইত্যাদি উন্নত দেশসহ পৃথিবীর প্রায় ৯০ টি দেশে জন্মরোধক হিসেবে এই ইনজেকশন অনুমোদিত হয়েছে। ১৯৯২ সালের ২৯ শে অক্টোবর মাসে ডিএমপিএ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন লাভ করেছে। নরিষ্টারেট (নেট-এন) ইনজেকশনও ১৯৬৩ সাল থেকে জন্মরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে বহু দেশেই এই ইনজেকশন জন্মনিরোধক হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে সে পদ্ধতি ১৯৮০ সাল থেকে গৃহীত হয়েছে। সমস্ত বিশ্বব্যাপী ৩ কোটিরও বেশী মহিলা জন্মরোধক ইনজেকশন ব্যবহার করছেন। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও জন্মনিরোধক ইনজেকশনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডিএমপিএ সাদা রং- এর দ্রবীভূত তরল পদার্থ। এটি প্রতি ডোজ বা মাত্রায় ১৫০ মি:গ্রা: ডিপো-মেড্রোক্সি প্রজেষ্টেরন এসিটেট হরমোন কার্যকরী ঔষধ হিসেবে থাকে এবং ১ মি:লি: ভায়ালে সরবরাহ করা হয়। নেট-এন তৈল জাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত। এর প্রতি ডোজ বা মাত্রায় ২০০ মি:গ্রা: নরএথিষ্টেরোন ইনানথেট হরমোন কার্যকরী ঔষধ হিসেবে থাকে। এটি ১ মি:লি: এম্পুলে সরবরাহ করা হয়।

চিত্র : ইনজেকশন

জন্মরোধক ইনজেকশন কিভাবে কাজ করে

- ডিম্বাশয়ে ডিম্ব পরিপক্ক হতে বাঁধা দেয়।
- জরায়ূর মুখে ঘন শ্লেষ্মা তৈরী করে যার ফলে পুরুষের শুক্রকীট জরায়ূতে ঢুকতে পারে না।
- জরায়ূর ভেতরের দেয়ালকে (এন্ডোমেট্রিয়াম) বদলে দেয়। যার ফলে নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুর গায়ে বসতে পারে না।
- ডিম্বনালীতে ডিম্বের চলাচলের গতি পরিবর্তন করে।

ইনজেকশন দেয়ার উপযুক্ত সময়

মাসিকের পর ঃ

- মাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকে ৭ দিনের মধ্যে।
- গর্ভবতী নয় এটা নিশ্চিত হলে যে কোন সময় (যেমন- গত মাসিকের পর সহবাস না করে থাকলে, অন্য কোন কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে থাকলে ইত্যাদি)। যদি মাসিক স্রাব বন্ধ হয়ে থাকে বা ষষ্ঠ দিন অথবা তারপর মাসিক চক্রের যে কোন দিন ইনজেকশন শুরু করতে চান তাহলে পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করতে হবে অথবা সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বুকের দুধ খাওয়ানো অবস্থায় ঃ

- সন্তান প্রসবের ৬ সপ্তাহ পর যদি আংশিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ান বা বাচ্চাকে অন্য খাবার দেয়া হয়।
- সন্তান প্রসবের ৬ সপ্তাহ পর যদি সন্তান পুরোপুরি শুধুমাত্র বুকের দুধ পায় এবং মাসিক না হয়ে থাকে।
- সন্তান প্রসবের ৬ মাস পরেও যদি মাসিক না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ইতিহাস গ্রহণের ও শারীরিক পরীক্ষায় এবং প্রয়োজন বোধে প্রেগন্যান্সি টেষ্ট বা আলট্রাসনোগ্রাম দ্বারা গ্রহীতা গর্ভবতী নয় এটা নিশ্চিত হওয়ার পর ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

বুকের দুধ না খাওয়ালে ঃ

- সন্তান প্রসবের পরপরই বা প্রথম ৬ সপ্তাহের মধ্যে।
- ৬ সপ্তাহের পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে গ্রহীতা গর্ভবতী নন।

গর্ভপাতের পর ঃ

- গর্ভপাতের সঙ্গে সঙ্গে অথবা এমআর করার পর পরই।
- পরবর্তীতে যে কোন সময় যদি নিশ্চিত হওয়া যায় গ্রহীতা গর্ভবতী নয়।

অন্যান্য পদ্ধতি বন্ধ করার পর ঃ

- অন্য পদ্ধতি বন্ধ করার পর পরই।

ব্যবহারের নিয়ম ঃ

- ডিপো-প্রভেরা ইনজেকশন প্রথমবার মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকে আরম্ভ করে প্রথম সাত দিনের মধ্যে নিতে হবে। পরবর্তী ইনজেকশনগুলো তিন মাস (৯০ দিন) পর পর নিতে হয়।
- বিশেষ কারণে কখনো কখনো পরবর্তী ইনজেকশন নির্দিষ্ট তারিখের ১৪ দিন আগে অথবা পরে নেয়া যায়। (যেমন- রোজা রাখা)

পাঠ-১৮

ইনজেকশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, জটিলতা এবং ব্যবস্থাপনা

সুবিধাসমূহ ঃ

- অত্যন্ত কার্যকরী (প্রায় ১০০ ভাগ) এবং নিরাপদ জন্মরোধক পদ্ধতি।
- ব্যবহার পদ্ধতি খুব সহজ। ডি এম পি এ ৩ মাস পর পর এবং নেট-এন ২ মাস পর পর নিতে হয়।
- গোপনীয়তা রক্ষা করে নেয়া যায়।
- খাবার বড়ির ন্যায় প্রতিদিন খাওয়ার ঝামেলা থাকে না।
- সহবাসের সাথে এর ব্যবহারের কোন সম্পর্ক নেই।
- যে সমস্ত মায়েরা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান তারাও ইনজেকশন নিতে পারেন।
- এতে ইস্ট্রোজেন নেই বলে ইস্ট্রোজেনজনিত জটিলতা যেমন- রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা দেখা যায় না এবং যে সব ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন ব্যবহার নিষিদ্ধ সেখানেও ডিএমপিএ বা নেট-এন ব্যবহার করা যায়।
- জরায়ূর বাহিরে গর্ভসঞ্চারের (একটোপিক প্রেগন্যান্সি) ঝুঁকি কমায়।
- যে কোন বয়সের সক্ষম মহিলারাই ইনজেকশন নিতে পারেন।
- ডাক্তার ছাড়াও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীগণ এই ইনজেকশন দিতে পারেন।
- প্রজেস্টেরন ইনজেকশনে খাবার বড়ির মতই কিছু আনুষঙ্গিক সুবিধা আছে যেমন-

- অনেক সময় মাসিক বন্ধ করে দেয় বলে রক্তস্বল্পতা কমায়।
- স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ (পিআইডি) এর মত জটিলতার সম্ভাবনা থেকে কিছুটা রক্ষা করে।
- কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার স্ত্রীরোগের অবস্থার উন্নতি করতে পারে, যেমন- এন্ডোমেট্রিওসিস, ডিম্বাশয়ের সিস্ট ইত্যাদি।

অসুবিধাসমূহ ঃ

- জন্মনিরোধক ইনজেকশন গ্রহীতাদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই মাসিকের পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এটাই ইনজেকশন বন্ধ করার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দেখা দেয়। মাসিকের এই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে- অনিয়মিত রক্তস্রাব, ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব, দীর্ঘদিন মাসিক বন্ধ থাকা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তস্রাব বেশী হওয়া। যদিও অতিরিক্ত রক্তস্রাব খুব কম হয়ে থাকে।

- ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পর পুনরায় সন্তান ধারণ করতে সাধারণত: ৬-১২ মাস সময় লাগতে পারে। গ্রহীতা ইনজেকশন বন্ধ করার পর শতকরা ৯২-৯৭ জন ২ বছরের মধ্যে গর্ভবতী হয়ে থাকেন।
- একবার ইনজেকশন দিলে এটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত এর কার্যকারিতা থেকে যায়।
- কেউ কেউ ইনজেকশন নিতে ভয় পান।
- ইনজেকশন নিজে নেয়া যায় না। এ জন্য ৩ অথবা ২ মাস পরপর ক্লিনিকে যেতে হয়।
- কোন কোন মহিলার ক্ষুধা বৃদ্ধির কারণে, ওজন বেড়ে যায়; স্তন ভারী এবং ব্যথা অনুভূত হয়ে থাকে। ওজন বৃদ্ধি ঘটে ক্ষুধা বৃদ্ধির কারণে শরীরে পানি জমার জন্য নয়।
- কোন কোন গ্রহীতার মাথা ধরে, মেজাজ খিটখিটে হয়, স্বামী সহবাসের ইচ্ছা কমে যায় এবং মাথা ঝিম ঝিম করে। উল্লেখ্য যে, ইনজেকশনের এসব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার হার অন্যান্য হরমোন জনিত গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারে সৃষ্টি প্রতিক্রিয়ার হারের চাইতেও কম।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলার্জি দেখা দিতে পারে। এজন্য গ্রহীতাদের ইনজেকশন নেয়ার পর ২০ মিনিটের আগে ক্লিনিক ত্যাগ না করার পরামর্শ দিতে হয়।
- রক্তে HDL (High Density Lipoprotein) কোলেষ্টেরোলের পরিমাণ অনেক হ্রাস পেতে পারে।
- দীর্ঘদিন ডি এম পি এ ব্যবহার অস্থিমজ্জার ঘনত্ব কমে যেতে পারে।

কোন কোন মহিলাদের ইনজেকশন দেয়া যাবে

ক্র.নং	উপযুক্ততা	যৌক্তিকতা
১।	কমপক্ষে একটি জীবিত সন্তান থাকতে হবে।	ইনজেকশন বন্ধ করার পর অনেক ক্ষেত্রে গর্ভধারণে দেরী হতে পারে বলে যাদের কোন সন্তান নেই, তাদের ইনজেকশন না দেয়াই ভাল।
২।	কম বয়সী বা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের পূর্বে পরবর্তী সন্তান জন্মদান বিলম্বিত করার জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অথবা যাদের দুই বা তার বেশী সন্তান কিন্তু স্থায়ী পদ্ধতি নিতে আগ্রহী নন।	ইনজেকশন অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি বলে সন্তান জন্মদানে বিলম্বিত করার জন্য ব্যবহার করা যায়। বেশী বয়সের মহিলারাও ইনজেকশন ব্যবহার করতে পারেন।
৩।	যে সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকরী গর্ভরোধক পদ্ধতি	ইনজেকশনে ইস্ট্রোজেন নেই বলে ইহার

	প্রয়োজন অথচ ইস্ট্রোজেন ব্যবহার নিষিদ্ধ (যেমন- Venous thrombosis থাকলে, তাদের জন্য ইনজেকশন উপযোগী)।	ইস্ট্রোজেনজনিত জটিলতাও নেই।
৪।	যদি খাবার বড়ি নিয়মিত খেতে ভুলে যায় অথবা বড়ি ব্যবহারের অসুবিধা হয় বা বড়ি ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়।	ইনজেকশন খাবার বড়ির মত প্রতিদিন খেতে হয় না বলে ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে না এবং একবার নিলে ২-৩ মাস কার্যকরী হয়।
৫।	বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো অবস্থায় জন্মরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাইলে।	জন্মরোধক ইনজেকশন বুকের দুধ কমায় না (দ্রষ্টব্য- যদি কোন মহিলা পুরোপুরিভাবে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান, কোন তোলা খাবার না খাওয়ান এবং মাসিক না হয়ে থাকে তবে সন্তান হবার পর ৬ মাস পর্যন্ত কোন প্রকার পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না)।
৬।	গ্রহীতার রক্তস্বল্পতা থাকলে।	ইনজেকশন ব্যবহারের ফলে রক্তস্বল্পতা দূর হয় মাসিক বন্ধ থাকার কারণে।
৭।	আই ইউ ডি ব্যবহারে তলপেট প্রদাহের ঝুকি থাকলে।	ইনজেকশন ব্যবহারে তলপেটে প্রদাহের সম্ভাবনা নেই বরং এর ব্যবহারের ফলে তলপেটে প্রদাহ কম হয়।
৮।	যারা এন্ড্রোমেট্রিওসিসে ভুগছে।	এন্ড্রোমেট্রিওসিসের চিকিৎসায় এই ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়।

কোন কোন মহিলাদের ইনজেকশন দেয়া যাবে না

ক্র.নং	সতর্কতা	যৌক্তিকতা
১।	নিঃসন্তান	সন্তান ধারণে দেরী হতে পারে।
২।	গর্ভাবস্থায় বা গর্ভবতী বলে সন্দেহ থাকলে।	গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩।	অস্বাভাবিক রক্তস্রাব (যার কারণ জানা যায়নি) থাকলে।	যৌনাঙ্গের কোন ক্ষত বা ক্যান্সার থাকলে অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হতে পারে। কাজেই অস্বাভাবিক রক্তস্রাবের সঠিক কারণ না জেনে ইনজেকশন দেয়া ঠিক নয়।

৪।	স্তনে কোন চাকা (ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকলে)	সন্দেহজনক কোন চাকা থাকলে তার কারণ নির্ণয় করতে হবে। হরমোন ব্যবহারে এ জাতীয় চাকা বেড়ে যেতে পারে।
৫।	মস্তিস্ক, হৃদপিন্ড বা ফুসফুসে রক্ত জমাট বাধা সংক্রান্ত কোন অসুখ থাকলে।	জন্মরোধক ইনজেকশন যদিও রক্ত জমাট বাধার প্রবণতা বাড়ায় না, তবুও হৃদরোগ এবং সক্রিয় রক্ত জমাট বাধা সংক্রান্ত কোন অসুখ থাকলে ইনজেকশন না দেয়াই উচিত।
৬।	বর্তমানে জন্ডিস বা লিভারের গুরুতর অসুখ থাকলে বা গত ১ বছরের মধ্যে অসুখের ইতিহাস থাকলে।	জন্মরোধক ইনজেকশন যকৃতের কাজের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে।
৭।	অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে।	জন্মরোধক ইনজেকশন ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণকে কষ্টসাধ্য করতে পারে। যাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে তারা ব্যবহার করতে পারেন। ডায়াবেটিস রোগীর জন্য গর্ভধারণ আরো বিপজ্জনক।
৮।	এক সন্তানের মায়ের ক্ষেত্রে সন্তানের বয়স দেড় মাসের কম হলে।	সন্তানের বয়স দেড় মাসের কম হলে কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। এক সন্তানের মায়েরা তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় সন্তান নিতে চাইলে ইনজেকশন তাদের জন্য আদর্শ পদ্ধতি নয় কারণ ইনজেকশন বন্ধ করার পরও অনেক সময় গর্ভধারণ করতে সময় লাগতে পারে।
৯।	আগামী তিন মাসের মধ্যে সন্তান নিতে চাইলে।	আগামী তিন মাসের মধ্যে সন্তান নিতে চাইলে কোন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রয়োজন হবে না। আর ইনজেকশন তো নয়ই কারণ ইনজেকশন বন্ধ করার পরও অনেক সময় গর্ভধারণ করতে সময় লাগতে পারে।

কোন গুজব সম্পর্কে জানতে চাইলে তার প্রকৃত তথ্য দেয়া ঃ

১। **প্রচলিত গুজব-** ইনজেকশন বুকের দুধ কমায় বা সন্তানের ক্ষতি করতে পারে।

প্রকৃত তথ্য- ইনজেকশন বুকের দুধ কমায় না। বুকের দুধের সাথে যে, সামান্য পরিমাণ ঔষধ নি:সৃত হয় তা সন্তানের কোন প্রকার শারীরিক ক্ষতি করে না।

২। **প্রচলিত গুজব-** ইনজেকশন নিলে ক্যান্সার হয়।

প্রকৃত তথ্য- অনেক গবেষণার পরও দেখা গেছে যে, ইনজেকশন নেয়ার ফলে ক্যান্সার হয় না। বরং ইনজেকশন নিলে মাসিক বন্ধ থাকে বলে রক্তস্বল্পতা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মাসিকের সময় ব্যথা হয় না।

৩। **প্রচলিত গুজব-** ইনজেকশন নিলে সন্তান ধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

প্রকৃত তথ্য- ইনজেকশনে সন্তান ধারণ ক্ষমতা নষ্ট করে না। ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পর পুনরায় গর্ভধারণ কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পর সন্তান ধারণ করতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ৬ মাস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আড়াই বছর সময় লাগতে পারে। তবে ৯২-৯৭ ভাগ ক্ষেত্রে ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার ২ বছরের মধ্যে মহিলারা সন্তান ধারণ করতে সক্ষম হন।

ইনজেকশনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ ঃ

১। ছোট খাট সমস্যা যেমন- ওজন বেড়ে যাওয়া, তলপেট ভারী লাগা,
পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, মানসিক দুশ্চিন্তা।

২। মাসিকের পরিমাণ কমে যাওয়া বা বন্ধ হওয়া।

৩। অনিয়মিত বা ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হওয়া।

৪। অতিরিক্ত অথবা দীর্ঘস্থায়ী রক্তস্রাব হওয়া।

৫। ইনজেকশনের জায়গায় প্রদাহ।

৬। শ্বাস কষ্ট ও অল্প পরিশ্রমে বুক ব্যথা হওয়া।

৭। ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পর গর্ভবতী না হওয়া।

প্রথম দু'ধরনের সমস্যাই বেশী দেখা দেয় এবং এগুলোই গ্রহীতার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং জটিলতার ব্যবস্থাপনা

অনেক সময় এক বা একাধিক সমস্যা একই সাথে একজন গ্রহীতার মধ্যে দেখা দিতে পারে। কিন্তু কোন গ্রহীতার ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার উদ্ভব হবে সেটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়।

অবস্থা/সমস্যা	সমাধান
ছোট খাট সমস্যা যেমন- ওজন বেড়ে যাওয়া, তলপেট ভারী ভারী লাগা, পেট ব্যথা, মাথা ধরা, মানসিক দুশ্চিন্তা।	মনোযোগ সহকারে গ্রহীতার সব সমস্যার কথা শুনতে হবে। গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে সাধারণতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই এসব উপসর্গ দূর হয়ে যাবে।
মাসিক বন্ধ থাকা	গ্রহীতাকে আস্বস্ত করতে হবে যে, ইনজেকশন গ্রহীতাদের মধ্যে মাসিক না হওয়া স্বাভাবিক। এতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। গ্রহীতা গর্ভবতী কি না নিশ্চিত হতে হবে। যদি কিছুদিন পরও মাসিক বন্ধ থাকে এবং আশ্বস্ত করার পরও গ্রহীতা উদ্বিগ্ন থাকেন তবে পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করতে হবে অথবা পদ্ধতি পরিবর্তন করে তাকে খাবার বড়ি বা অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতে হবে।
দুই মাসিকের অন্তর্বর্তীকালে রক্তস্রাব হওয়া বা ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব	গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, সাধারণতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই এ সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কেননা সাময়িকভাবে ইনজেকশনে এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েক মাস পরেও এ অবস্থা চলতে থাকলে গ্রহীতাকে আয়রণ ট্যাবলেট এবং প্রতিদিন ১টি করে সাধারণ/স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি ২১ দিন পর্যন্ত খাবার জন্য সরবরাহ করতে হবে।
অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়া	ভালোভাবে প্রশ্ন করে জানতে হবে গ্রহীতার অন্য কোন অসুবিধা যেমন- চাকা চাকা রক্তস্রাব, তলপেটে

	ব্যথা, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব ইত্যাদি আছে কি না। যদি থাকে তাহলে গ্রহীতাকে চিকিৎসকের নিকট রেফার করতে হবে। অন্য কোন অসুবিধা না থাকলে গ্রহীতাকে ১টি করে স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি ২১ দিন পর্যন্ত খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে এবং বড়ি সরবরাহ করতে হবে।
ইনজেকশনের স্থানে সংক্রমণ হওয়া	ডাক্তারের নিকট যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে হবে। এবং তাকে সাময়িকভাবে কনডম ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে।
চোখ এবং চামড়া অথবা এর যে কোন একটি হলুদ বর্ণ ধারণ করা	গ্রহীতাকে ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করতে বলতে হবে এবং তাকে ডাক্তারের নিকট পাঠাতে হবে। পরবর্তী ইনজেকশন নেয়ার তারিখ পার হয়ে গিয়ে থাকলে কনডম ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিতে হবে এবং এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
ক) শ্বাসকষ্ট ও অল্প পরিশ্রমে বুকে ব্যথা হওয়া। খ) ঘন ঘন প্রচন্ড মাথা ব্যথা হওয়া এবং চোখে ঝাপসা দেখা। গ) পায়ের পেছনে প্রচন্ড ব্যথা হওয়া এবং তা কয়েকদিন স্থায়ী হওয়া।	গ্রহীতাকে ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার উপদেশ দিতে হবে এবং তাকে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য পাঠাতে হবে। পরবর্তী ইনজেকশন নেয়ার তারিখ পার হয়ে গেলে কনডম ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিতে হবে এবং তা সরবরাহ করতে হবে।
ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পরও গর্ভবতী না হওয়া	গ্রহীতাকে বুঝাতে হবে ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পরও সাধারণতঃ পুনরায় গর্ভবতী হতে ৬-১২ মাস সময় লাগতে পারে।
অন্য কোন অসুবিধা দেখা দেয়া, যেমন- বহুমূত্র	এ রোগ থাকলেও যদি তা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে তবে ইনজেকশন ব্যবহার করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে গ্রহীতাকে ভালোভাবে ফলোআপ করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে (এফডব্লিউভি বা ডাক্তার কর্তৃক) ব্যবস্থাপনাঃ

অবস্থা/সমস্যা	সমাধান
১। মাসিক বন্ধ (Amenorrhoea)	• গ্রহীতার সঙ্গে সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। • মাঠকর্মী, গ্রহীতা নিজেই অথবা অন্য কেউ কোন চিকিৎসা বা ব্যবস্থা দিয়ে থাকলে তা জানতে হবে। • গ্রহীতা গর্ভবতী নয় এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যদি গর্ভবতী হয়ে থাকেন তবে গ্রহীতা চাইলে এমআর করিয়ে নিতে পারেন। • গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, মাসিক বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বরং রক্তস্রাব বন্ধের ফলে রক্তস্বল্পতা দূর হয়। • মাসিক বন্ধ থাকায় গ্রহীতা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলে তার সাথে বিকল্প জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু মাসিক বন্ধ থাকায় গ্রহীতা কিছু মনে না করলে সে ইনজেকশন ব্যবহার করতে পারেন।
২। ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব (Spotting)	• গ্রহীতার সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। • মাঠকর্মী, গ্রহীতা নিজেই অথবা অন্য কেউ কোন চিকিৎসা বা ব্যবস্থা দিয়ে থাকলে তা জানতে হবে। • এটা নিশ্চিত হতে হবে যে তার অনিয়মিত রক্তস্রাবের অন্য কোন কারণ নেই। যেমন- যোনীপথে সংক্রমণ, জরায়ুর ক্যান্সার, গর্ভপাত, যৌন রোগ, তলপেটের প্রদাহ ইত্যাদি। এদের মধ্যে যে কোন একটি থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু কোন প্রদাহ থাকলে ইনজেকশন ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারেন। • গ্রহীতা মাসিক নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে প্রতিদিন একটি করে স্বল্পমাত্রার খাওয়ার বড়ি ১০ দিন খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে। • মাসিক স্রাব নিয়মিত না হওয়ার কারণে গ্রহীতা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লে তার সাথে বিকল্প জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও পদ্ধতি চালিয়ে যেতে চাইলে তা করতে পারেন।
৩। অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Menorrhagia)	• গ্রহীতার সঙ্গে সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। • মাঠকর্মী, গ্রহীতা নিজেই অথবা অন্য কেউ কোন চিকিৎসা বা ব্যবস্থা দিয়ে থাকলে তা জানতে হবে।

	• এটা নিশ্চিত হতে হবে যে অনিয়মিত রক্তস্রাবের অন্য কোন কারণ নেই যেমন- যোনিপথে সংক্রমণ, জরায়ুর ক্যান্সার ইত্যাদি। • রক্তস্বল্পতা আছে কি না তা দেখতে হবে এবং রক্তস্বল্পতার মাত্রা নির্ণয় করে আয়রণ টেবলেট এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং আয়রণ সম্বলিত খাবার। যেমন- শাক সবজী, কচু, কলা, দুধ, ডিম, কলিজা খাবারের পরামর্শ দিতে হবে। • অতিরিক্ত রক্তস্রাবের চিকিৎসা হিসেবে ১টি করে খাবার বড়ি ২১ দিন খেতে বলতে হবে এবং এক চক্র স্বল্পমাত্রার খাবার বড়ি সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজনে তা ২-৩ চক্র চালিয়ে যেতে হবে। তাতেও অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিয়ন্ত্রিত না হলে দৈনিক ৩০-৫০ মাইক্রোগ্রাম ইথিনাইল ইষ্ট্রাডিয়ল ৭-২১ দিন খাওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে হবে অথবা ডাক্তারের কাছে রেফার করতে হবে। • বিশেষ মেডিক্যাল অবস্থায় যে সব ক্ষেত্রে ডি এন্ড সি করা জরুরী হয়ে পড়ে তা ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে ডি এন্ড সি করার কোন প্রয়োজন নেই।

অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা ঃ

অবস্থা/সমস্যা	সমাধান
১। ওজন বৃদ্ধি (Weight gain)	• গ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা করে তার খাবার অভ্যাস বদলানোর পরামর্শ দিতে হবে। • ইনজেকশন শুরু করার পর যদি খাবার স্পৃহা বেড়ে যায় এবং তার ফলে অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি পায় তাহলে অন্য কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে।
২। ঝিমুনী (Dizziness)	• গ্রহীতার সাথে সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। • মাঠকর্মী, গ্রহীতা নিজেই অথবা অন্য কেউ কোন চিকিৎসা দিয়ে থাকলে তা জানতে হবে।

	• অন্যান্য কারণ যেমন- রক্তস্বল্পতা, উচ্চ বা নিম্ন রক্তচাপ, রক্তে কম শর্করা আছে কি না নির্ণয় করে তাদের চিকিৎসা দিতে হবে। • যদি অন্য কোন কারণ না থাকে এবং ঝিমুনি ভাব যদি কম থাকে তাহলে আশ্বস্ত করতে হবে। এতে কাজ না হলে নন-হরমোনাল অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিতে হবে।
৩। মানসিক অবসাদ (Depression)	• গ্রহীতার সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। • পারিবারিক, অর্থনৈতিক, বৈবাহিক, সামাজিক কোন সমস্যা আছে কি না জানতে হবে। • ইনজেকশন নেয়ার পর মানসিক অবসাদ বৃদ্ধি পেলে অন্য কোন নন-হরমোনাল পদ্ধতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিতে হবে। কিন্তু যদি অবসাদ বৃদ্ধি না পেয়ে থাকে তাহলে ইনজেকশন চালিয়ে যেতে হবে। • গ্রহীতার সাথে কথা বলে জানতে হবে যে তার অবশভাব, দুর্বলতা, চোখের অসুবিধা ইত্যাদি উপসর্গও সঙ্গে আছে কি না। এ রকম থাকলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রজনিত সমস্যা আছে কি না তা দেখতে হবে, থাকলে ইনজেকশন বন্ধ করতে হবে এবং এর বিকল্প হিসেবে নন-হরমোনাল কোন পদ্ধতি নিতে পরামর্শ দিতে হবে।
৪। মাথা ধরা (Headache)	• মাথা ধরার অন্য কোন কারণ থাকলে তার জন্য পরামর্শ দিতে হবে। • মাথা ধরার জন্য সাধারণ বেদনানাশক ঔষধ, যেমন- প্যারাসিটামল দেয়া যেতে পারে। • মাথা ধরা একেবারে না সারলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শের জন্য রেফার করতে হবে বা অন্য কোন নন-হরমোনাল পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে।
৫। ইনজেকশনের জায়গা পেকে যাওয়া/প্রদাহ	• ইনজেকশন প্রদানের সময় জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ না করলে ইনজেকশনের স্থান পেকে যেতে পারে। জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হলে ইনজেকশনের জায়গা ফুলে যায় এবং লাল হয়ে যায়। স্পর্শ করলে

	গরম লাগে এবং ব্যথা হয়। জীবাণু সংক্রমণ সাধারণতঃ ইনজেকশন নেয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ে থাকে। ● প্রদাহের ক্ষেত্রে চিকিৎসা হচ্ছেঃ কেটে পূঁজ বের করে সঙ্গে সঙ্গে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে। একই সময়ে ইনজেকশনের কার্যকারিতা বহাল রাখার জন্য আরও ১টি ইনজেকশন দিতে হবে। অথবা সাথে অন্য কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দিতে হবে। ইনজেকশনের জায়গা পেকে গেলে ইনজেকশনের কার্যকারিতা থাকে না এবং ঐ এলাকার জনগণের মধ্যে কর্মসূচীর প্রতি বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।
৬। জীবাণুমুক্ত প্রদাহ	● কখনো কখনো ইনজেকশনের স্থানটি লাল হয়ে যায়। কিন্তু কোন রকম ব্যথা থাকে না। এসব ক্ষেত্রে কোন রকম এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র গ্রহীতাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই লাল অবস্থা নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। চিকিৎসা হিসেবে গ্রহীতার আরামের জন্য উক্ত স্থানে হালকা গরম সে দেয়া যেতে পারে।

ফলোআপ-

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন যে সব কেন্দ্রে প্রদান করা হয়ে থাকে সেখানে যেমন- মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মডেল ক্লিনিক, জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, বেসরকারী সংস্থার ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রহীতাকে ফলোআপ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ফলোআপের সময় এই পদ্ধতির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াজনিত সমস্যার সমাধান করা এবং একে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় এবং ফলোআপের সময় পরবর্তী ইনজেকশনের সময়, স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রহীতাকে অবহিত করার মাধ্যমে ইনজেকশনের ড্রপ-আউটের হার কমানো সম্ভব।	জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশনের জন্য প্রয়োজনীয় এমএসআর এর তালিকা- ১। পভিডন আয়োডিন সলিউশন (১ লিঃ)- ১ বোতল/১০০ ডোজের ২। শোষণ তুলা (১০০ মিঃগ্রাঃ প্যাকেট)- ১০ রোল/১০০ ডোজের।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

গ্রহীতার নিকট থাকিবে

ইনজেকশন গ্রহীতা কার্ড

রেজিঃ নং ইনজেকশন গ্রহণের তারিখ ঃ কেন্দ্রের নাম ঃ

গ্রহীতার নাম ঃ বয়স ঃ

স্বামীর নাম ঃ বয়স ঃ

ঠিকানা ঃ

বাড়ী নং ঃ পাড়া ঃ

গ্রাম ঃ ইউনিয়ন ঃ

উপজেলা ঃ জেলা ঃ

ইনজেকশন প্রদানকারীর নাম ঃ

ইনজেকশনের নাম ঃ

তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তার নাম ঃ

ইনজেকশনের নাম	**পরবর্তী ইনজেকশনের তারিখ**				**অনুসরণকারীর স্বাক্ষর**
ডিপোপ্রোভেরা					

ইনজেকশন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ ইনজেকশন একটি হরমোন জাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। নিয়মিতভাবে গ্রহণ করলে জন্মরোধে ইহা অত্যন্ত কার্যকরী। ইনজেকশন নেয়ার পর যদি কোন অসুবিধা যেমনঃ খুব মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানো ও রক্তস্রাব দেখা দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিকের ডাক্তার অথবা কমিউনিটি প্যারামেডিকের পরামর্শ নিবেন।

পাঠ-১৯

আইইউডি

আইইউডি (IUD) Intra Uterine Device কথার সংক্ষেপ শব্দ। এটি মহিলাদের জরায়ূতে স্থাপনের জন্য তৈরী একটি পদ্ধতি। ১৯০৯ সালে প্রথম বৈজ্ঞানিক রিকটার সিল্ক ওয়ার্মগাট আই ইউ ডি-র বর্ণনা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে যে আই ইউ ডি ব্যবহার করা হচ্ছে: তা হলো- কপার T ৩৮০ এ। কপার-টি ৩৮০ এ এর উপরের দুই বাহুতে তামার কলার আছে। কপার যুক্ত আইইউ ডি পৃথিবীতে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

চিত্র ঃ আইইউডি

আইইউডি'র ধরণ

নাম	কার্যকারিতার মেয়াদ	মূল উপাদান
কপার-টি ৩৮০এ	১০ বছর	কপার
কপার-টি ২০০বি	৫ বছর	কপার
লেভোনরজেস্টেরোল সমৃদ্ধ আই ইউ ডি	৫ বছর	লেভোনরজেস্টিল হরমোন

আইইউডি'র গর্ভরোধ কার্যপ্রণালী

- **শুক্রকীটের উপর প্রভাব ঃ**

শুক্রকীটকে চলাচলের বাধা দেয়া (Immobilization) যেমন- যোনিপথ থেকে ফেলোপিয়ান টিউব পর্যন্ত শুক্রকীটের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে।

- **ডিম্বের উপর প্রভাব ঃ**

  ফেলোপিয়ান টিউবে ডিম্বের চলাচলের গতি হ্রাস করে।

- **নিষিক্তকরণ (Fertilization) হতে বাধা দেয়।**

- **জরায়ুর গায়ে ভ্রুনের গ্রথিত হওয়া (Implantation) রোধ করে ঃ**

  আই ইউ ডি ফরেন বডি হিসেবে কাজ করে ফলে জীবাণুমুক্ত প্রদাহের সৃষ্টি হয়, তার ফলে জরায়ুর গহ্বরের আতিথ্য বিমুখ পরিস্থিতি হয়। এভাবে ভ্রুনের গ্রথিত হওয়া রোধ করে।

কপার-টি ৩৮০এ

মেডিকেটেড আইইউডি পদ্ধতির মধ্যে কপার-টি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। ইংরেজী 'T' অক্ষরের মতো দেখতে এ পদ্ধতি পলিইথিলিন প্লাষ্টিকের তৈরী এবং এর দন্ডে তামার সূক্ষ্ম তার ও বাহুতে তামার সূক্ষ্ম পাত জড়ানো থাকে। এতে তামার মোট আয়তন ৩৮০ বর্গ মিলিমিটার। এখান থেকে কপার অণু ধীরে ধীরে জরায়ুতে নিঃসৃত হয়। কপার-টির লম্বা দন্ডের সাথে ২টি নাইলনের সুতা লাগানো থাকে। কপার-টি ৩৮০ এ খুবই কার্যকরী। কপার-টি ৩৮০ এর প্রথম বছরে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা শতকরা ০.৭ ভাগ মাত্র।

কপার-টি ৩৮০ এ মেয়াদকাল ও প্রাপ্তিস্থান ঃ

- কপার-টি ৩৮০এ ১০ বছর পর্যন্ত রাখা যায়।
- বাংলাদেশে প্রায় সব পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, এনজিও ক্লিনিক, বৃহত্তর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং মডেল ক্লিনিকে পাওয়া যায়। এছাড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা সদর হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকেও পাওয়া যায়। অনেক স্বীকৃত বেসরকারী সংস্থায়ও এই সেবা পাওয়া যায়।

আইইউডি কার জন্য উপযোগী

- শুধুমাত্র যে সব মহিলার কমপক্ষে একটি জীবিত সন্তান আছে এবং দীর্ঘ দিনের জন্য গর্ভরোধ করতে চান।
- যে সব মহিলা হরমোন সমৃদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না।

আইইউডি প্রয়োগের সময় ঃ

- আইইউডি শুধুমাত্র হাসপাতাল, ক্লিনিকে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার বা কমিউনিটি প্যারামেডিক দ্বারা পরানো যাবে।
- মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকে আরম্ভ করে প্রথম সাত দিনের মধ্যে আই ইউ ডি প্রয়োগ করতে হয়। পরামর্শ দেবার সময় মহিলাকে বলতে হবে যে মাসিক চলাকালীন সময়ও যদি তিনি ক্লিনিকে আসতে চান তিনি অবশ্যই আসতে পারেন। এতে লজ্জিত অথবা চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। গর্ভবতী নয় এটা নিশ্চিত হওয়ার পর মাসিক চক্রের যে কোন দিন আই ইউ ডি প্রয়োগ করা যায়।
- যদি মহিলা অন্যান্য পদ্ধতি (যেমন- কনডম, ইনজেকশন, বড়ি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে থাকেন তাহলে যে কোন সময় আই ইউ ডি প্রয়োগ করা যায় অর্থাৎ মহিলা গর্ভবতী নয় নিশ্চিত হওয়ার পর আই ইউ ডি প্রয়োগ করার আগে কমিউনিটি প্যারামেডিক সাধারণভাবে পি.ভি পরীক্ষা করবেন এবং জরায়ূর আকার সাবধানে যাচাই করবেন। কারণ মহিলা গর্ভবতী হলে জরায়ু নরম থাকবে, আর মাসিকের সময় ছাড়া অন্য সময় সারভিক্সের মুখ কিছুটা শক্ত থাকে।
- সাধারণতঃ এম আর অথবা গর্ভপাতের ২ সপ্তাহ পর আই ইউ ডি প্রয়োগ করা হয়। তবে ৩-৫ দিন পর প্রয়োগ করলে জরায়ু থেকে আই ইউ ডি বের হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কিছুটা কম থাকে। যদি কমিউনিটি প্যারামেডিক মনে করেন যে, ক্লায়েন্ট সময় মত ক্লিনিকে ফিরে আসবেন না তাহলে যিনি এম আর করেন তিনি যদি নিশ্চিত হন যে এম আর সঠিকভাবে করা হয়েছে তাহলে তিনি এম আর করার সঙ্গে সঙ্গে আই ইউ ডি প্রয়োগ করতে পারেন।
- বাচ্চার জন্মের পর পরই আই ইউ ডি প্রয়োগ করা যায় তবে সেই সময়ে যদি প্রয়োগ না হয় তাহলে বাচ্চার বয়স দেড় মাস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- মাসিক না হলেও যাদের বাচ্চার বয়স ৬ মাসের চেয়ে কম এবং যারা বাচ্চাকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান তাদের আইইউডি প্রয়োগ করা যাবে। ৬ মাসের পরেও মাসিক না হওয়া অবস্থায় মহিলার ইচ্ছা অনুযায়ী আই ইউ ডি প্রয়োগ করা যায় তবে পরের তিন মাস প্রতি মাসে অনুসরণ করতে হবে। কারণ আই ইউ ডি প্রয়োগ করার সময় গ্রহীতা গর্ভবতী ছিলেন না নিশ্চিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।
- আই ইউ ডি প্রয়োগের পর তলপেটে ও কোমড়ে ব্যথা হতে পারে। সাধারণতঃ প্যারাসিটামল বড়ি ৫০০ মি.গ্রা. ১টা করে দিনে ৩ বার খেলে ব্যথা কমে যায়।
- আই ইউ ডি প্রয়োগের পর সহবাস থেকে বিরত থাকার বাধ্যবাধকতা নেই তবে সহবাসে ৭ দিন বিরতি দিলে ইনফেকশনের ঝুকি কমে।

- প্রত্যেক মাসে মাসিকের পর আই ইউ ডি সূতা যোনিপথে আছে কি না মহিলাকে পরীক্ষা করতে হবে।
- মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আই ইউ ডি বদল করে নিতে হবে। যদি কোন মহিলা কপার টি ৩৮০এ ১০ বছর ব্যবহার করার পর খুলে আবার নতুন একটা পরতে চান, তবে জরায়ূর অবস্থা ভাল থাকলে খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নতুন একটা পরতে পারবেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে নুতন আর একটা প্রয়োগ করার আগে কিছুদিন বিরতি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।
- যখন মহিলা আই ইউ ডি খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন তখন ক্লিনিকে গিয়ে শুধুমাত্র একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, পরিবার কল্যান পরির্দশিকা বা কমিউনিটি প্যারামেডিক দ্বারা আই ইউ ডি খুলে ফেলা যায়। আই ইউ ডি খুলে নেয়ার ১ বছরের মধ্যে শতকরা ৮৫-৯০ ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভধারণ করতে পারে।

আইইউডি ফলো-আপ

ক) নিয়মিত ফলো-আপ ঃ

আইইউডি ব্যবহারে কোন সমস্যা হচ্ছে কি-না এবং তা সঠিকভাবে কাজ করছে কি-না, তা জানার জন্য ৩ বার ফলো-আপ করা হয়, একে নিয়মিত ফলো-আপ বলা হয়।

১ম বার : প্রয়োগের ১ মাস পর বা প্রথম মাসিকের পর অথবা ৩-৬ সপ্তাহের মধ্যে

২য় বার : প্রয়োগের ৬ মাস পর (+/-) ১ মাস

৩য় বার : প্রয়োগের ১২ মাস পর (+/-) ১ মাস

খ) অনিয়মিত/জরুরী ফলো-আপ ঃ

যে কোন সমস্যা বা জটিলতার জন্য গ্রহীতাকে সেবাদানকারীর কাছে বা নিকটস্থ সেবা কেন্দ্রে আসতে বলতে হবে।এগুলো জরুরী ফলো-আপের অন্তর্ভুক্ত।

নিয়মিত ফলো আপে করণীয়-

- গ্রহীতার আইইউডি সংক্রান্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা জটিলতা বা কোন সমস্যা আছে কি-না তা শুনতে হবে
- গ্রহীতার কোন প্রশ্ন বা কোন কিছু জানার থাকলে তার উত্তর দিতে হবে।
- স্পেকুলাম পরীক্ষা এবং দুই হাতে যোনীপথ, জরায়ু ও তলপেট পরীক্ষা করতে হবে-
  - সূতা ঠিকমত আছে কি-না তা দেখার জন্য
  - কোন সংক্রমণ আছে কি-না দেখার জন্য

- যদি গ্রহীতা সামগ্রিকভাবে আইইউডি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে যে বিষয়গুলো পুনরায় মনে করিয়ে দিতে হবে তা হলো-
  - কি কি কারনে সেবাকেন্দ্রে আসতে হবে বা বিপদজনক লক্ষণসমূহ
  - সূতা পরীক্ষার নিয়ম
  - আইইউডি'র মেয়াদকাল অর্থাৎ কতদিন পর আইইউডি খুলতে হবে

প্রসব পরবর্তী আইইউডি ফলো-আপে করণীয়

- গ্রহীতার কোন প্রশ্ন আছে কি-না বা কোন সম্যসা আছে কি-না তা জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।
- সারভিক্স দেখারপ জন্য স্পেকুলাম পরীক্ষা করতে হবে।
- সুতা দেখা যায় কি-না তা দেখতে হবে। প্রসব পরবর্তী আইইউডি'র ক্ষেত্রে সুতা দেখা যেতে ৪০ দিন ১ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সুতা নাও দেখা যেতে পারে।
- যদি সুতা অনেক লম্বা থাকে, তবে সারভিক্সের মুখ থেকে ৩-৪ সে.মি. রেখে কেটে দিতে হবে।
- যদি সুতা দেখা না যায় এবং গ্রহীতা বলেন যে আইইউডি বের হয়ে যায়নি, তবে এ ব্যাপারে কাউন্সেলিং করতে হবে এবং আশ্বস্ত করতে হবে।
- কোন সংক্রমণ আছে কি-না দেখার জন্য পিভি পরীক্ষা করতে হবে।
- আইইউডি জনিত কোন সমস্যা হলে বা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চাইলে গ্রহীতাকে সেবাকেন্দ্রে আসতে বলতে হবে।
- যদি গ্রহীতার আইইউডি বের হয়ে যায়, তাহলে গ্রহীতাকে অন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেয়ার জন্য বলতে হবে বা যদি সে চায় তবে অন্য একটি আইইউডি (প্রসবের ৪ সপ্তাহ পর) প্রয়োগ করতে হবে।

পাঠ-২০
আইইউডি ব্যবহারের সুবিধা, অসুবিধা, কোন কোন অবস্থায় মহিলাদের আইইউডি দেয়া যায় না এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা

আইইউডি'র সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

সুবিধা

- কোন মহিলা হরমোনাল পদ্ধতি ব্যবহার করতে না পারলে তাদের জন্য আই ইউ ডি বিশেষ উপযোগী।
- ব্যবহারে বুকের দুধের কোন তারতম্য হয় না।
- কপারটি ৩৮০ একাধারে ১০ বছরের জন্য কার্যকরী।
- কোন মহিলা যদি পুনরায় গর্ভধারণ করতে চান তবে সহজেই এই পদ্ধতি বের করে নেয়া যায়।
- এই পদ্ধতিতে যৌন সঙ্গমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।
- এই পদ্ধতিতে প্রতিদিন বড়ি খেতে ভুলে যাওয়া বা সহবাসের সময় অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহারের মত ঝামেলা নেই।
- এই পদ্ধতি সহজেই প্রয়োগ করা যায়।
- এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী (৯৯.৯%)।
- অন্য পদ্ধতি যেমন- বড়ি, কনডম, ইনজেকশন ইত্যাদি ব্যবহারকারী মহিলা মাসিক চক্রের যে কোন সময়ে অন্য পদ্ধতি বাদ দিয়ে আইইউডি নিতে পারেন।
- আই ইউ ডি প্রতিটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, এনজিও ক্লিনিক, বৃহত্তর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাওয়া যায়। এছাড়া জেলা সদর হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকেও পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত সুবিধাদি থাকলে স্যাটেলাইট ক্লিনিকেও এই সেবা দেয়া যায়। অনেক স্বীকৃত বেসরকারী সংস্থায়ও এই সেবা পাওয়া যায়।

অসুবিধা

- কোন কোন গ্রহীতার ক্ষেত্রে আইইউডি প্রয়োগের পর প্রথম কয়েক মাস তলপেটে ব্যথা হতে পারে।
- জীবাণু মুক্ত উপায়ে অভিজ্ঞ প্রয়োগকারী দ্বারা পরানো না হলে অথবা পরবর্তী কালে যৌনরোগের সম্ভাবনা থাকলে তলপেটের প্রদাহ দেখা দিতে পারে।

- প্রথম কয়েক মাস রক্তস্রাব বেশী হতে পারে।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইইউডি জরায়ূ থেকে বের হয়ে আসতে পারে।
- নগণ্য ক্ষেত্রে আই ইউ ডি সহ গর্ভসঞ্চার হতে পারে।
- জরায়ূর বাহিরে গর্ভসঞ্চার হতে পারে (Ectopic pregnancy)
- মাসিকের পর সূতা পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়।
- যৌনরোগ এবং এইডস প্রতিরোধ করে না।
- কদাচিৎ জরায়ূ ছিদ্র হয়ে যেতে পারে।
- আইইউডি পরার ও খোলার জন্য অভিজ্ঞ প্রয়োগকারী প্রয়োজন।

কোন অবস্থায় মহিলাদের আই ইউ ডি প্রয়োগ করা উচিত নয়

যে সব অবস্থায় আই ইউ ডি প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ (Absolute Contra Indications)

- গর্ভাবস্থা এবং সন্দেহজনক গর্ভাবস্থা হলে।
- জরায়ূর আকার ও অবস্থান অস্বাভাবিক হলে।
- অস্বাভাবিক রক্তস্রাব, সারভিক্সে টেনাকুলাম বা ভলসেলাম লাগালে সহজেই ছিড়ে যায় এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে (সারভিক্স বা জরায়ুর ক্যান্সার বলে সন্দেহ করা হয়)।
- তলপেটে বেশী ব্যথা এবং সারভিক্সে ঘা থাকলে (তলপেটের নতুন বা পুরাতন প্রদাহের সম্ভাবনা)।
- স্থানভ্রষ্ট গর্ভের (Ecotopic Pregnancy) ইতিহাস থাকলে।
- মহিলা একটিও সন্তান প্রসব না করলে।
- কোন জীবিত সন্তান না থাকলে।

যে সব ক্ষেত্রে আইইউডি ব্যবহারের সম্ভাব্য ঝুঁকির পরিমাপ করা অবশ্যই প্রয়োজন (Relative Contra Indications) ঃ

- মাসিকের সময় খুব ব্যথা।
- খুব বেশী রক্তস্বল্পতা থাকলে (৪৫% বা ৭ গ্রাম/১০০ মি.লি. এর নিচে হলে)
- মহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন তাঁর হৃদপিন্ডের ভাল্বে কোন রোগ আছে কি না। থাকলে তাকে অন্য পদ্ধতি নেয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।
- কপারে এলার্জি থাকলে কপার-টি প্রয়োগ করা যাবে না।

উপরোল্লিখিত অবস্থায় পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা আইইউডি নেয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মহিলাকে ডাক্তারের নিকট রেফার করবেন।

বিঃ দ্রঃ যে সব মহিলাদের সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করে প্রসব করানোর ইতিহাস রয়েছে সে সব মহিলাদের আইইউডি ব্যবহার নিষেধ নয়। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা (অপারেশনের তিন মাস পর) আইইউডি প্রয়োগ করানো উচিত।

পাঠ-২১

আইইউডি প্রয়োগের জন্য কি কি সরবরাহ ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এবং প্রয়োগের পূর্বে যন্ত্রপাতিসমূহ জীবাণুমুক্তকরণ

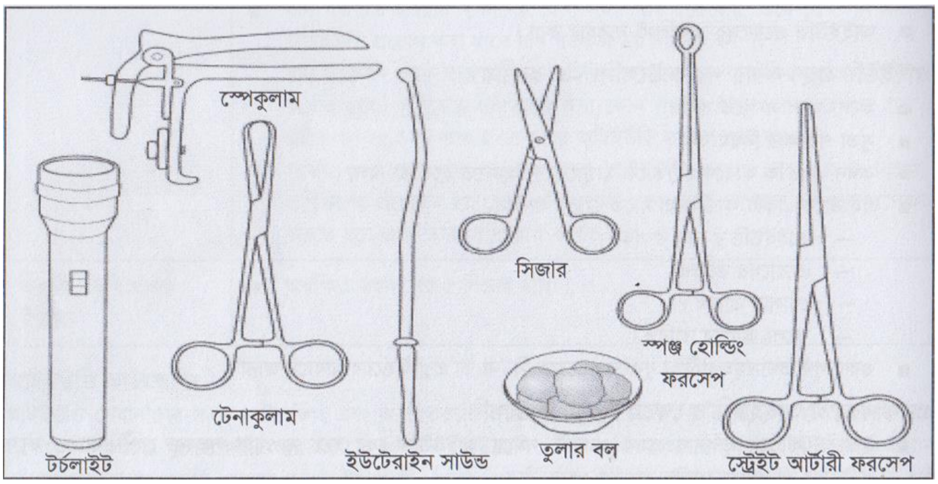

ছবি : আইইউডি প্রয়োগের যন্ত্রপাতি

আইইউডি প্রয়োগ করার ধাপগুলো নিচে দেয়া হলোঃ

প্রথম ধাপ	-	যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা
দ্বিতীয় ধাপ	-	মহিলাকে আইইউডি সম্পর্কে কাউন্সেলিং বা অবহিতকরণ
তৃতীয় ধাপ	-	ইতিহাস গ্রহণ
চতুর্থ ধাপ	-	শারীরিক পরীক্ষা (পি ভি পরীক্ষাসহ), ল্যাবরেটরী পরীক্ষা
পঞ্চম ধাপ	-	আইইউডি প্রয়োগ করা
ষষ্ঠ ধাপ	-	প্রয়োগ পরবর্তী উপদেশ দেয়া

আইইউডি প্রয়োগ করতে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি এবং সরবরাহ প্রয়োজন

জিনিসপত্র/সরবরাহ

- গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় এমন জায়গায় একটি রোগী পরীক্ষার টেবিল
- পরিস্কার তুলা (তুলা সব সময় পরিস্কার প্লাষ্টিকের ব্যাগে রাখবেন)

- জীবাণুমুক্ত করার জন্য আই ইউ ডি ষ্টেরিলাইজার
- এন্টিসেপটিক সলিউশন ঃ ৫০ মি.লি. ক্লোরহেক্সিডিন সেট্রিমাইড সলিউশন এর সাথে পানি মিশিয়ে এক লিটার করুন অথবা পভিডন আয়োডিন সলিউশন
- হাত ধোয়ার সাবান এবং ব্রাশ
- প্যাকেটে সরবরাহকৃত জীবাণুমুক্ত আইইউডি
- ২টা বালতি (একটি পরিস্কার পানির জন্য এবং আর একটি ময়লা পানির জন্য)
- মগ
- ব্যাটারিসহ চালু টর্চ লাইট
- সার্টিফিকেট, কার্ড, ক্লায়েন্ট নির্দিষ্ট ফর্ম রেজিষ্টার
- এম এস আর তালিকা

পাঠ-২২

আইইউডি প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রয়োগ পরবর্তী উপদেশ

আইইউডি কপার-টি ৩৮০-এ প্রয়োগ করা চেকলিষ্টের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

প্রথম ধাপ ঃ

১) প্রয়োজনীয় জীবাণুমুক্ত করার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করুন।

এইডস, হেপাটাইটিস-বি, পিআইডি এবং অন্যান্য সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ

২) মহিলাকে আইইউডি সম্পর্কে কাউন্সেলিং করুন ঃ

পছন্দমত পদ্ধতি বেছে নেয়ার জন্য মহিলাকে আইইউডি সম্পর্কে কাউন্সেলিং করুন।

তৃতীয় ধাপ ঃ

৩) আইইউডি ক্লায়েন্টের হিষ্ট্রি ফরম অনুযায়ী মহিলার ইতিহাস গ্রহণ করুন ঃ

মহিলার পছন্দমত পদ্ধতি নিতে পারে কি না তা জানার জন্য।

ইতিহাস গ্রহণ ঃ

সাধারণ প্রশ্ন	কারণ
➢ প্রায়ই জ্ঞান হারান বা মূর্ছা যান কি ?	ভয় পাওয়ার কারণে এবং আইইউডি প্রয়োগের সময় সারভিক্সকে ধরার ফলে মুর্ছা যেতে পারে।
➢ অল্প পরিশ্রমেই শ্বাস কষ্ট হয় বা হাঁপিয়ে যান ?	রক্তস্বল্পতা বা হৃদরোগ থাকার সম্ভাবনা।
➢ গত তিন মাসের মধ্যে মাসিক বন্ধ ছিল কি ? ➢ আপনি কি সন্দেহ করেন যে আপনি গর্ভবতী ?	গর্ভধারণের সম্ভাবনা।
➢ দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব বা সহবাসের পর কি রক্তক্ষরণ হয় ? ➢ আপনার তলপেটে কি অনবরত ব্যথা হয় ? ➢ মাসিকের সময় ৩ দিনের বেশী সময় ধরে ৫ বারের বেশী মাসিকের কাপড় বদলাতে হয় কি?	জরায়ুতে পলিপ, ফাইব্রয়েড অথবা ক্যান্সার হতে পারে।
➢ আপনার যোনিদ্বার দিয়ে দূর্গন্ধযুক্ত বা পুঁজযুক্ত স্রাব হয় ?	পি আই ডি থাকলে তা চিকিৎসা করে আইইউডি প্রয়োগ করা যায়।
➢ সিজারিয়ান অপারেশন এর দ্বারা প্রসব অথবা	আইইউডি প্রয়োগের সময় সিজারিয়ান অপারেশনের

স্থানভ্রষ্ট গর্ভের জন্য অপারেশন হয়েছিল কি ?	জায়গা ছিড়ে যেতে পারে। অপরদিকে স্থানভ্রষ্ট গর্ভের সম্ভাবনার কারণে আই ইউ ডি দেয়া উচিত হবে না।
➢ আপনার জরায়ু নীচে নেমে গিয়ে যোনিপথ দিয়ে বের হয়ে আসে ?	জরায়ু নীচে নামার কারণে আইইউডি প্রয়োগ প্রযোজ্য হবে না।
➢ আপনার স্বামীর কি একজনের বেশী স্ত্রী আছে ?	পি আই ডি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
➢ আপনার ছোট বাচ্চার বয়স কি দেড় মাসের কম?	জরায়ু নরম থাকার কারণে আই ইউ ডি প্রয়োগের সময় ছিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
➢ আপনার কি একটিও সন্তান হয় নি ?	আইইউডি প্রযোজ্য নয়। সাউন্ড করার সময় বা আইইউডি প্রয়োগ করার সময় সার্ভিক্সের ক্ষতি হতে পারে। প্রদাহ বা সংক্রমণ হওয়ার ফলে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

চতুর্থ ধাপ ঃ (শারীরিক পরীক্ষা)

৪) কি করতে যাচ্ছেন মহিলাকে ব্যাখ্যা করুন ঃ

মহিলাকে বলতে হবে যে যোনিপথ এবং জরায়ু পরীক্ষা করে আইইউডি প্রয়োগ করা হবে। মহিলার ভয় দূর করতে চেষ্টা করুন।

৫) মহিলাকে প্রস্রাব করে আসতে বলুন ঃ

জরায়ূর আয়তন সঠিকভাবে বোঝার জন্য, মূত্রথলিতে ক্ষতি না হওয়ার জন্য এবং মহিলা যেন আরাম বোধ করেন।

৬) পরীক্ষার জন্য গোপনীয়তা নিশ্চিত করুন ঃ

যেন মহিলা লজ্জা না পান।

৭) মহিলাকে আরাম করে লিথোটমি পজিশনে শোয়ান ঃ

সহজেই যোনিপথ পরীক্ষা এবং আইইউডি প্রয়োগ করার জন্য।

৮) চেকলিষ্ট অনুযায়ী হাত ধুয়ে নিন এবং জীবাণূমুক্ত বা হাই লেভেল ডিসইনফেকশন করা গ্লাভস্ পড়ুন ঃ

সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য।

৯) স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপ এর সাহায্যে ৫টি তুলার বল এবং এন্টিসেপটিক দ্রবণ দিয়ে যৌনাঙ্গের বাহিরের অংশ উপরে থেকে নিচে ৫ বার পরিস্কার করুন।

প্রতি বল শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করে ময়লার বালতিতে ফেলে দিন।

সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য (যৌনাঙ্গের বাহিরের অংশে যে জীবাণু থাকে তা যেন আঙ্গুল বা স্পেকুলামের সাহায্যে ভিতরে চলে না যায়)।

১০) দুই হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ পরীক্ষা ঃ

জরায়ুর মুখের অবস্থান (নরম অথবা শক্ত) এবং দৃঢ় অথবা নড়াচড়া করে এবং আকার, আকৃতি অনুভব করার জন্য।

বিঃ দ্রঃ যোনিপথ জীবাণুমুক্ত নয়। ব্যবহৃত গ্লাভস দিয়ে যদি জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ধরা যায় তাহলে জরায়ুতে যোনিপথের জীবাণু প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য পিভি করার পর গ্লাভস পরা হাত দিয়ে জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতির মাথা অবশ্যই ধরবেন না।

১১) কোন প্রকার প্রয়োগ নিষেধ থাকলে অন্য পদ্ধতির জন্য পরামর্শ দিন ঃ

মহিলা আইইউডি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিন্তু শারীরিক পরীক্ষা করে যদি কমিউনিটি প্যারামেডিক বুঝেন যে মহিলার জন্য এই পদ্ধতি অনুপযুক্ত তাই মহিলার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সফলতার জন্য অবশ্যই মহিলাকে অন্য পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করবেন। কোন প্রয়োগ নিষেধ না থাকলে কপার-টি প্রয়োগ করার প্রস্তুতি নিন।

১২) যোনিপথে ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম প্রবেশ করান এবং সঠিকভাবে স্থাপন করুন ঃ

যোনিপথ এবং জরায়ুর মুখের অবস্থা রক্ষ্য করুন ঃ

- সার্ভিক্স যদি নীল হয় তাহলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা আছে।
- যদি সার্ভিক্সের মুখে ঘা থাকে তাহলে মেট্রোনিডাজল বড়ি দিয়ে ১টা করে তিন বার ৭ দিন দিয়ে চিকিৎসা করুন।
- পূঁজ থাকলে পি আই ডি এর সম্ভাবনা। এই অবস্থায় কপার-টি প্রয়োগ করা যাবে না। প্রয়োজন হলে এম আর বা পি আই ডি এর চিকিৎসা করুন।

পঞ্চম ধাপ ঃ (আইইউডি প্রয়োগ করা)

১৩) স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপ এর সাহায্যে জীবাণুমুক্ত তুলা এবং এন্টিসেপটিক দিয়ে জরায়ূর মুখ ৩ বার পরিস্কার করুন ঃ

সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য (জরায়ুর মুখে যে জীবাণু থাকে তা যেন ইউটেরাইন সাউন্ড বা প্রয়োগ নলের সাথে জরায়ুতে চলে না যায়)।

১৪) ভলসেলাম বা টেনাকুলাম ফরসেপ দিয়ে জরায়ুর মুখে ধরুন (ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী দশটা এবং দু'টার অবস্থান)।

ভলসেলাম বা টেনাকুলাম ফরসেপ দিয়ে জরায়ুর মুখ ধরুন (ঘড়ির কাটা অনুযায়ী দশটা এবং দু'টার)

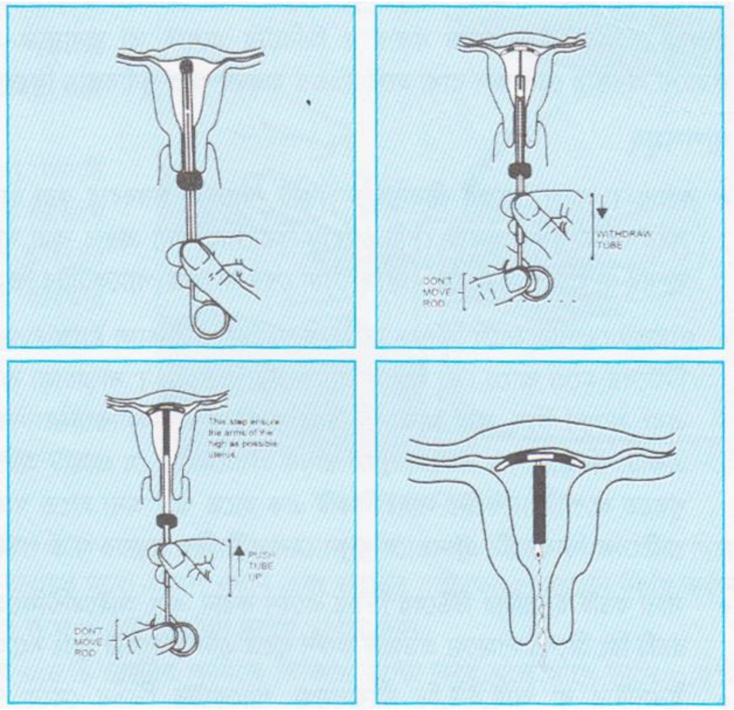

চিত্র : আইইউডি প্রয়োগের বিভিন্ন ধাপসমূহ

১৫) ভলসেলাম বা টেনাকুলাম ফরসেপ দিয়ে জরায়ুর মুখ সামনে এবং উপরের দিকে টেনে ধরুন ঃ

জোরে টান দেবেন না যাতে জরায়ুর গহ্বর সোজা হয়ে গেলে আইইউডি প্রয়োগের সময় জরায়ূ ছিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়। প্রয়োজনে আয়ার সাহায্য নিতে পারেন, টেনাকুলাম ধরার জন্য।

১৬) জরায়ুতে ইউটেরাইন সাউন্ড প্রবেশ করার ঃ

দুই হাত পরীক্ষার ফলাফলের আলোকে সাউন্ড প্রবেশ করার ইউটেরাইন সাউন্ড বের করে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির জন্য আলাদা ট্রেতে সাউন্ড রাখুন। জরায়ূর গহ্বরের গভীরতার মাপ দেখে নিন।

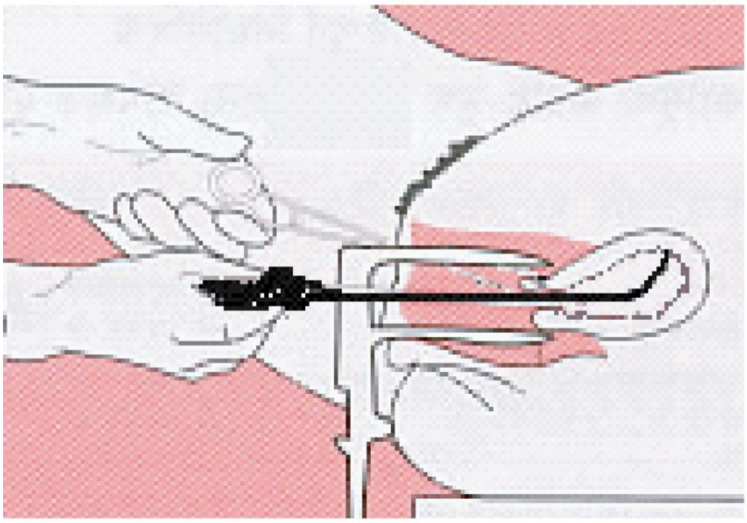

চিত্র ঃ সাউন্ডিং করে জরায়ূর গভীরতা ও অবস্থান নির্ণয় করা।

১৭) প্যাকেটের ভিতর রেখে কপার-টি এর বাহু দুটি প্রয়োগযন্ত্রের নলে প্রবেশ করান ঃ

ক) প্যাকেট শুকনো এবং সীল করা আছে কি না তা দেখুন।

খ) প্যাকেটে কোন ছিদ্র আছে কি না তা দেখুন।

গ) প্যাকেটটি না খুলেই ভেতরের কপার-টি নাড়াচাড়া করা যায়। প্যাকেট খোলার আগে নিশ্চিত হোন যে কপার-টি এর ভারটিক্যাল ষ্ট্যান্ড (লম্বা বাহু) সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ যন্ত্রের নলের মধ্যে আছে।

- প্যাকেটের স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের কাগজ উপরের দিকে রেখে প্যাকেটটি একটি পরিস্কার শক্ত সমতল স্থানে রাখুন।
- এক হাত দিয়ে প্যাকেট স্থির করে কাগজ এক হাতে ধরে অন্য হাতে স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের কাগজ উপরে উঠান।

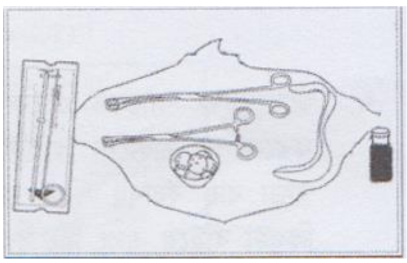

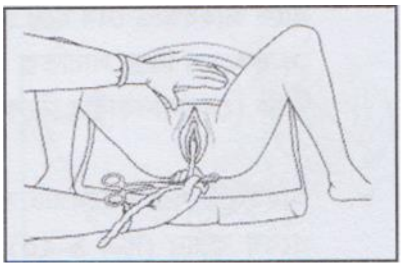

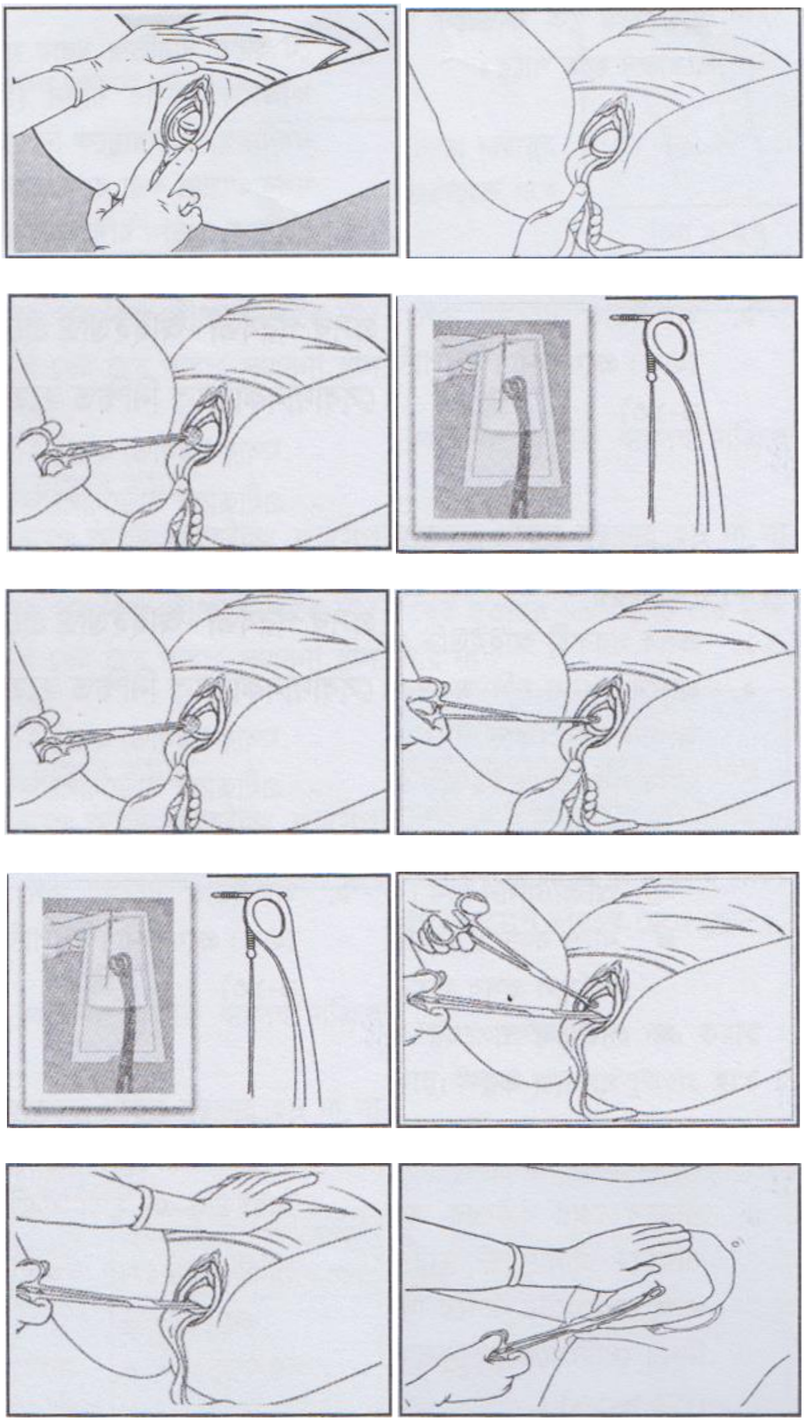

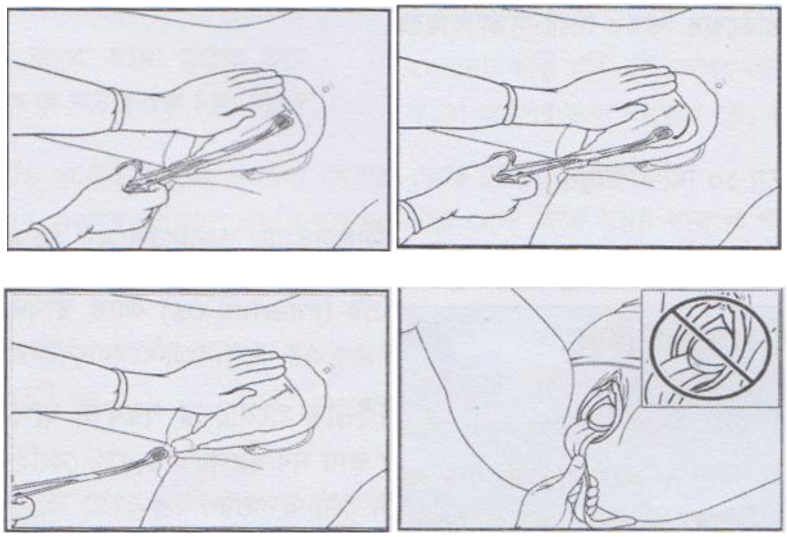

চিত্র ঃ আইইউডি প্যাকেট খোলা হতে শুরু করে আইইউডি প্রয়োগ পর্যন্ত ধাপের ছবি।

- প্যাকেটের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত অর্থাৎ নীল রঙ্গের গার্ড পর্যন্ত খুলুন।
  প্যাকেটের ভিতরের কার্ডের পেছনের দিকের শক্ত সাদা রডটি ধরে নলের মধ্যে প্রবেশ করান। লক্ষ্য রাখবেন আইইউডি প্যাকেটের খোলামুখ যেন উপরের দিকে থাকে যাতে প্যাকেট থেকে কিছু নিচে পড়ে না যায়। প্যাকেটের স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের খোলা অংশ দুপাশে এমনভাবে ভাজ করতে হবে যাতে সাদা রডটি প্যাকেটের বাইরের গায়ে না লাগে।
- এর পরে কপার-টি ৩৮০এ এর বাহু দুটি চেপে ইনসার্টের নলের মধ্যে দিতে হবে।
- কপার-টি রডটি এবং রড প্যাকেটের ভিতরে রেখে, হাত দিয়ে নলটি স্থির করে রাখুন। স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের উপর দিয়ে আপনার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী কপার-টি ৩৮০ এ বাহুর উপর বসান। বাহু দুটো চেপে কপার বেষ্টনী পর্যন্ত নলের মধ্যে প্রবেশ করান।

১৮) জরায়ু গহ্বরের মাপ অনুযায়ী কপার-টি গার্ড ঠিক করুন যেন প্রয়োগ করার সময়ে জরায়ু ছিদ্র না হয়।

১৯) গার্ড ও কপার-টি বাহুর একই সমান্তরাল অবস্থান নিশ্চিত করুন যেন কপার-টির বাহু ২টি জরায়ুর ফান্ডাসে সঠিক স্থানে অবস্থান করে।

২০) প্রয়োগযন্ত্রের রডটি নলের ভিতর টি এর গোড়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করান, যেন প্রয়োগ নল বের করার সময় কপার-টি সঠিক স্থানে থাকে। তারপর সাবধানে প্রয়োগযন্ত্রটি (নল এবং রড) কপার-টি সহ প্যাকেট থেকে বের করুন।

২১) দেহের সমান্তরাল অবস্থানে রেখে এবং যোনিপথের গায়ে বা স্পেকুলামে স্পর্শ না করে জরায়ূ ফান্ডাস পর্যন্ত কপার-টি এর প্রয়োগযন্ত্র সাবধানে প্রবেশ করান।

২২) বাম হাত দিয়ে প্রয়োগযন্ত্রের রডটি স্থির রাখুন এবং ডান হাত দিয়ে নলটি নিচের দিকে নামান।

২৩) এবার প্রয়োগযন্ত্রের নলটি আস্তে আস্তে সামান্য উপরের দিকে তুলুন যাতে করে টি এর বাহু জরায়ুর ফান্ডাসে অবস্থান করে।

২৪) রডটি বের করে আনুন।

২৫) নলটি বের করে আনুন।

২৬) ৩-৪ সে.মি. রেখে কপার-টি এর সূতা কেটে ফেলুন। সূতা কাটার সময় আর্টারী ফোরসেপ দিয়ে হাল্কা করে ধরবেন, জোরে টান দেবেন না।

২৭) টেনাকুলাম ও স্পেকুলাম বের করুন। টেনাকুলাম খুলে যদি রক্তক্ষরণ হয় তাহলে জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে সে স্থান কিছুক্ষণ চেপে রাখুন।

২৮) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ডিকন্টামিনেশন করুন। নিজেকে এবং পরবর্তী ক্লায়েন্টকে এইডস এবং অন্যান্য রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য।

ষষ্ঠ ধাপ ঃ (আইইউডি পরবর্তী উপদেশ দিন)

১) কোন ধরনের আইইউডি প্রয়োগ করা হলে এবং তার মেয়াদকাল কত বছর তা মহিলাকে আবার বলে দিন।

২) মহিলাকে বুঝিয়ে বলুন যে, প্রথম কয়েক দিন তার সামান্য তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা হলে তাঁকে প্যারাসিটামল বড়ি খেতে বলুন।

৩) প্রত্যেক মাসে মাসিক শেষে সূতা পরীক্ষা করার কথা বলুন।

বিপদজনক লক্ষণসমূহ :

যে যে কারণে একজন গ্রহীতাকে সেবাকেন্দ্র আসতে হবে তা সহজে মনে রাখার জন্য ইংরেজী PAINS শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

P- Period	;	মাসিক বন্ধ থাকা বা অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হওয়া
A – Abdomen	;	তলপেটে অস্বাভাবিক ব্যথা বা সহবাসের সময়
I – Infection	;	সংক্রমণ বা যোনিপথে অস্বাভাবিক স্রাব
N - Not Feeling	;	কিছুই ভাল না লাগা/অস্বস্থি লাগা/ জ্বর বা শীত শীত লাগা
S – String	;	সুতা হারিয়ে যাওয়া অথবা ছোট বা বড় হয়ে যাওয়া

সূতা পরীক্ষা করার নিয়ম ঃ

- প্রত্যেক মাসে মাসিকের শেষে PAINS
- সাবান ও পরিস্কার পানিতে দুই হাত ধুতে হবে।
- বসে অথবা এক পা উঁচুতে তুলে সূতা পরীক্ষা করতে হবে।
- তর্জনী যোনীপথে প্রবেশ করিয়ে আইইউডি এর সূতা অনুভব করতে হবে।
- সূতা ধরে টানাটানি করা যাবে না।
- সূতা পাওয়া না গেলে পরীক্ষার জন্য ক্লিনিকে আসতে হবে।
- সূতা না পাওয়া গেলে এবং ক্লিনিকে যেতে দেরী হলে কনডম ব্যবহার করুন।

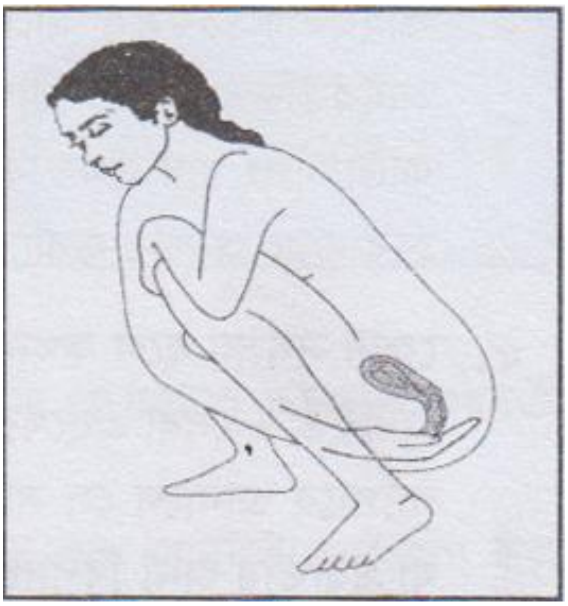

চিত্র ঃ সূতা পরীক্ষা

৪) ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা-মাসিকের সময় পরিস্কার প্যাড/কাপড় ব্যবহার করতে বলুন এবং প্যাড/কাপড় বদলানোর সময় আইইউডি পড়ে গেছে কি না তা দেখতে বলুন।

৫) মহিলাকে বলুন যে প্রথম দুই অথবা তিন মাসিক স্বাভাবিকের চাইতে বেশী দিন স্থায়ী এবং রক্তস্রাব বেশী হতে পারে।

৬) আয়রণ ও ফলিক এ্যাসিড ট্যাবলেট দিন। ডোজের নির্দেশ ঃ ১টা করে বড়ি দিনে ৩ বার ১ মাস পর্যন্ত।

৭) সহবাস সম্পর্কিত উপদেশ ঃ ইনফেকশন এড়ানোর জন্য কমপক্ষে প্রথম ৫দিন সহবাস থেকে বিরত থাকলে ভাল এবং প্রথম ২১ দিন কনডম ব্যবহার করার উপদেশ দিন।

৮) সহবাসের সময় গ্রহীতার স্বামী আইইউডি সূতার জন্য কোন অসুবিধা অনুভব করলে গ্রহীতাকে ক্লিনিকে এসে প্রয়োজন হলে সূতা ছোট করে নিতে হবে।

৯) ক্লিনিকে পুনরায় আগমন ঃ কোন রকম অসুবিধা না থাকলে আই ইউ ডি প্রয়োগের পর প্রথম পরিদর্শন হচ্ছে ১ মাস পর, এর পর ৬ মাস পর এবং ১ বছর পর আরও একবার।

১০) যে কোন অসুবিধা হলে পরীক্ষার জন্য ক্লিনিকে আসতে বলুন ঃ

- যদি সুতাটি অনুভব করা না যায় তাহলে আইইউডি অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। আইইউডি পড়ে গিয়ে থাকলে আর একটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- আইইউডিসহ গর্ভধারণ হলে অবশ্যই আইইউডি খুলে ফেলতে হবে। আইইউডি জরায়ুতে থাকা সত্ত্বেও গর্ভসঞ্চার হলে বড় জোর পিআইডি সৃষ্টি হতে পারে, এর বেশী কিছু নয়। গর্ভসঞ্চার হলেও সে সন্তান বিকৃত হবে না।
- যখন কোন মহিলা আইইউডি খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন তখন ক্লিনিকে গিয়ে শুধুমাত্র একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার বা পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা দ্বারা আইইউডি খুলতে হবে।

১১) কপার-টি ফরম এবং রেজিষ্টার পূরণ করুন।

মনে রাখবেন ঃ যে কোন সময়ে খুব বেশী ব্যথা, অতিরিক্ত স্রাব এবং সূতা পাওয়া না গেলে দেরী না করে মহিলাকে ক্লিনিকে আসতে বলুন।

পাঠ-২৩

আইইউডি ব্যবহারের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, জটিলতা ও তার ব্যবস্থাপনা

আইইউডি প্রয়োগের পরবর্তী সেবাসমূহ ও ব্যবস্থাপনা ঃ

কোন কোন মহিলা আইইউডি লাগানোর পরপরই সাময়িক ভাবে মূর্ছা যাওয়া বোধ করতে পারেন অথবা পেটে ব্যথা বা পেশীতে টান অনুভব করতে পারেন। এরকম সম্ভাবনা এড়াতে চাইলে আইইউডি প্রয়োগের ৩০ মিনিট পূর্বে গ্রহীতাকে একটি ৪০০ মি.গ্রা. আইবোপ্রোফেন ট্যাবলেট খাওয়ানো যায়। আইইউডি পরানোর পর পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১০-১৫ মিনিট গ্রহীতাকে শুয়ে থাকার জন্য উপদেশ দিতে হবে।

যদি গ্রহীতা পেটের পেশীর টানে অস্বস্থি বোধ করেন তাহলে ব্যথা নিবারণের জন্য তাকে আইবুপ্রোফেন বড়ি খেতে দিতে হবে। তবে এই সব পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য খুব সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে আইইউডি লাগাতে হয়। যদি তীব্র ব্যথা এবং পেশীর টান খুব বেশী অনুভূত হয় এবং এর সাথে যদি জরায়ু থেকে রক্তপাত শুরু হয় ও সূতাও হারিয়ে যায়, তাহলে মনে করতে হবে জরায়ু ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে বা কোন হাসপাতালে রেফার করতে হবে।

আইইউডি পরানোর পর গ্রহীতাকে ৬টি আইবুপ্রোফেন বড়ি ব্যথা হলে ভরা পেটে খাওয়ার জন্য দিতে হবে এবং সঙ্গে এন্টাসিড বড়ি খাবে। সেই সাথে ৬০টি আয়রণ ট্যাবলেট ১টি করে দিনে দুই বার খাওয়ার জন্য দিতে হবে। যদি গ্রহীতা পেপটিক আলসারের পূর্ব ইতিহাস থাকে তবে আইবুপ্রোফেন এর পরিবর্তে প্যারাসিটামল দেয়া যেতে পারে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, জটিলতা এবং ব্যবস্থাপনা

আইইউডি প্রয়োগের পর কারো কারো ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে। সমস্যা গুলোর কিছু আইইউডি'র পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং কিছু জটিলতা। নিম্নে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এবং জটিলতার তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো -

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া	জটিলতা
আইইউডি গ্রহণের কারণে এমন কিছু স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা -	আইইউডি গ্রহণের পর এমন কিছু সমস্যা হয় যার জন্য সাধারণতঃ অতিরিক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয় -
• আপনা-আপনি ভাল হয়ে যায় • গ্রহীতার স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতি করে না • গ্রহীতাকে অনেক ক্ষেত্রে আশ্বস্ত করাই যথেষ্ট	• গ্রহীতার শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হয় • অতি দ্রুত সমস্যা নির্ণয় করতে হয় এবং

- সামান্য ঔষধের দরকার হতে পারে যা পদ্ধতির সাথেই দেয়া হয়
- সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা (Intervention) গ্রহণ করতে হয় না

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, যেমন -

১. বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ
২. পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা
৩. রেফার করা
৪. পদ্ধতি খুলে ফেলা
৫. অস্ত্রোপচার করা

আইইউডি'র পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

১. আইইউডি প্রয়োগের সময়
   - সামান্য মোচড়ানো ব্যথা
২. প্রয়োগের পর প্রথম কয়েক দিন
   - সামান্য রক্তস্রাব
   - সামান্য মোচড়ানো ব্যথা
৩. প্রয়োগের পর প্রথম কয়েক মাস
   - দীর্ঘস্থায়ী মাসিক / স্রাবের পরিমাণ বেশী
   - মোচড়ানো ব্যথা
   - মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব

আইইউডি'র জটিলতা

- অস্বাভাবিক রক্তস্রাব
- তলপেটে মোচড়ানো ব্যথা
- ব্যথার ফলে অজ্ঞান হওয়া
- আইইউডি বের হয়ে যাওয়া
- জরায়ু ছিদ্র হয়ে যাওয়া
- সূতাজনিত সমস্যা
- গর্ভধারণ
- তলপেটে প্রদাহ
- যোনীপথের স্রাব

আইইউডি'র পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনা

১.মোচড়ানো ব্যথা

কখন হতে পারে -

- জরায়ু সাউন্ডিং করার সময়
- আইইউডি পরানোর পর পরই

- আইইউডি পরানোর প্রথম কয়েক দিন বা মাসের মধ্যে

ব্যবস্থাপনা

- আইইউডি পরানোর আগে এবং পরে গ্রহীতাকে এ বিষয়ে কাউন্সেলিং করুন
- প্রয়োগের সময় ধীরে ধীরে এবং নমনীয়ভাবে সাউন্ডিং করুন
- টেনাকুলাম দৃঢ়ভাবে নীচের দিকে ও বাইরের দিকে টেনে জরায়ু গহ্বর, সারভিক্সের মধ্যস্থিত পথ (Cervical Canal) এবং যোনীপথকে একই লাইনে আনুন
- হাল্কা ব্যথা নিরারণকারী ঔষধ ব্যথা না কমা পর্যন্ত খেতে দিন, যেমন -
    - আইবুপ্রোফেন ৪০০ মিলিগ্রাম, ১২ ঘন্টা পর পর ভরা পেটে
      অথবা,
    - প্যারাসিটামল ৫০০ মিলিগ্রাম ১টি বা ২টি বড়ি ৮ ঘন্টা পর পর ভরা পেটে (যদি গ্যাস্ট্রিক আলসার থাকে তবে সঙ্গে এন্টাসিড ট্যাবলেট খেতে হবে)
- আশ্বস্ত করুন
- যদি ব্যথা বেড়ে যায় বা না কমে তবে জটিলতা (আইইউডি জরায়ুর দেয়ালে গ্রথিত হয়ে যাওয়া, জরায়ু আংশিক বা পুরোপুরি ছিদ্র হয়ে যাওয়া) সন্দেহ করে রেফার করুন ।

২. সামান্য রক্তস্রাব, মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব

কখন হতে পারে -

- আইইউডি প্রয়োগের পর পরই
- আইইউডি প্রয়োগের পর প্রথম কয়েক দিন বা কয়েক মাস

ব্যবস্থাপনা

- আইইউডি প্রয়োগের আগে এবং পরে গ্রহীতাকে এ বিষয়ে কাউন্সেলিং করুন (সম্ভব হলে স্বামীসহ কাউন্সেলিং করুন)
- আস্বস্ত করুন
- গ্রহীতাকে আয়রণ সম্বলিত পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দিন
- গ্রহীতাকে প্রতিদিন ৩০০ মিলিগ্রাম করে ফেরাস সালফেট ১-২ মাসের জন্য খেতে বলুন

৪. সারভিক্সে ক্ষত

কখন হতে পারে -

- প্রসব পরবর্তী আইইউডি প্রয়োগের সময়

সম্ভাব্য লক্ষণসমূহ -

- যোনীপথে অস্বাভাবিক রক্তপাত

ব্যবস্থাপনা

- ক্ষত দেখা গেলে ক্ষতের আকার ও রক্তপাতের পরিমানের উপর ভিত্তি করে রিপেয়ার করুন

আইইউডি'র জটিলতার ব্যবস্থাপনা

১.অস্বাভাবিক রক্তস্রাব ও রক্তস্বল্পতাজনিত সমস্যা

কখন হতে পারে -

- আইইউডি পরানোর সময় গ্রহীতার রক্তস্বল্পতা থাকলে
- আইইউডি পরানোর ৩ মাসের মধ্যে ব্যবহারকারীর অত্যধিক রক্তস্রাব হলে

ব্যবস্থাপনা

- প্রয়োগের পূর্বে সঠিকভাবে গ্রহীতা বাছাই করুন
- হিমোগ্লোবিনের মাত্রা নির্ণয় করুন
- গ্রহীতাকে প্রতিদিন ৩০০ মিলিগ্রাম করে ফেরাস সালফেট ১-২ মাস খেতে বলুন
- গ্রহীতাকে আয়রণ সম্বলিত পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দিন
- নিম্নের কোন সমস্যা বা উপসর্গ আছে কি-না তা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করুন-
    - সারভিক্সের পুরাতন প্রদাহ
    - সহবাস পরবর্তী রক্তস্রাব
    - অনিয়মিত রক্তস্রাব
    - সারভিক্স বা জরায়ুতে পলিপ
    - সারভিক্স বা জরায়ুর ক্যান্সার
    - জরায়ুর টিউমার (ফাইব্রয়েড)
- সাথে ব্যথা থাকলে-
    - তলপেটে প্রদাহ আছে কি-না পরীক্ষা করুন
    - গর্ভ (জরায়ুর ভিতরে বা বাইরে গর্ভধারণ) আছে কি-না দেখুন
- গ্রহীতাকে ফলো-আপ করুন
- রক্তস্রাব অসহ্য মনে হলে আইইউডি খুলে দিন

২.তলপেটে খিঁচুনী ও মোচড়ানো ব্যথা

কখন হতে পারে -

- আইইউডি প্রয়োগের সময়
- আইইউডি প্রয়োগের পর প্রতি মাসিকের সময়
- সারভিক্স বা জরায়ুতে কোন প্রদাহ হলে
- তলপেটে প্রদাহ হলে
- আপনা-আপনি গর্ভপাত হলে
- জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণ হলে

ব্যবস্থাপনা

ক. সাধারণ ব্যবস্থা

- রক্তচাপ, নাড়ীর গতি ও তাপমাত্রা দেখুন
- তলপেটে হাত দিয়ে পরীক্ষা করুন
- স্পেকুলাম পরীক্ষার সাহায্যে সারভিক্স এবং স্রাবের অবস্থা দেখুন
- পিভি পরীক্ষা করুন এবং জরায়ুর অবস্থা দেখুন
- সূতা পরীক্ষা করুন

খ. বিশেষ ব্যবস্থা

- ব্যথা নিবারণকারী ঔষধ যেমন, আইবুপ্রোফেন (৪০০ মি.গ্রা. ভরা পেটে ১২ ঘন্টা পর পর) বা মেফেনেমিক এসিড (৫০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ৫দিন) বা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেতে দিন
- সারভিক্স ও তলপেটে প্রদাহের জন্য চিকিৎসা দিন
- প্রয়োজনে আইইউডি খুলে দিন
- জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণের ক্ষেত্রে রেফার করুন
- গর্ভপাতের পর আইইউডি খুলে ফেলুন। অসম্পূর্ণ গর্ভপাতের জন্য ডিএন্ডসি-র জন্য রেফার করুন/

৩. আইইউডি সম্পূর্ণ বা আংশিক বের হয়ে যাওয়া

কখন হতে পারে -

- মাসিকের সময়
- যথাস্থানে আইইউডি প্রয়োগ করা না হলে

আইইউডি বের হয়ে আসার লক্ষণসমূহ

- যোনীপথের অস্বাভাবিক স্রাব
- তলপেটে খিচুঁনী বা ব্যথা
- দুই মাসিকের মাঝে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব
- সহবাসের পর রক্তস্রাব
- সহবাসের সময় ব্যথা (পুরুষ বা মহিলার)
- সূতা না পাওয়া বা সূতা লম্বা হয়ে যাওয়া
- জরায়ুর মুখে বা যোনীতে শক্ত প্লাস্টিকের উপস্থিতি
- নীরবে আইইউডি বের হয়ে যাওয়ার কারণে গর্ভবতী হয়ে যাওয়া

ব্যবস্থাপনা

- আইইউডি আংশিক বের হয়ে গেলে আইইউডি খুলে দিন
- গর্ভবতী কি-না পরীক্ষা করে দেখুন
- কোন সমস্যা না থাকলে এবং গ্রহীতা চাইলে নতুন একটি আইইউডি পরিয়ে দিন এবং ৭ দিনের জন্য ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মিলিগ্রাম ১২ ঘন্টা পর পর খেতে দিন
- গ্রহীতা আইইউডি গ্রহণ করতে না চাইলে বিকল্প জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরামর্শ ও সেবা দিন।

৪.জরায়ু বা সারভিক্স ছিদ্র হয়ে যাওয়া বা গ্রোথিত হয়ে যাওয়া

সাধারণতঃ ১০০০০ আইইউডি প্রয়োগ করলে ১টির ক্ষেত্রে জরায়ু ছিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জরায়ু ছিদ্র হবার স্থানগুলো হচ্ছে -জরায়ুর ফান্ডাস, জরায়ুর বডি ও সার্ভিক্সের দেয়াল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জরায়ু ছিদ্র হওয়ার পরও সারভিক্সের বাইরে সূতা দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে জরায়ু ছিদ্র হয়েছে কি-না নির্ণয় করা বেশ দুরূহ এবং এ কারণে বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। জরায়ু বা সারভিক্স ছিদ্র হয়ে যাওয়া বা গ্রথিত হয়ে যাবার ঘটনাটি ঘটে সাধারণতঃ আইইউডি প্রয়োগের সময়। প্রসব পরবর্তী আইইউডি প্রয়োগের সময় এ দূর্ঘটনার কথা এখনো জানা যায়নি।

সম্ভাব্য উপসর্গ ও লক্ষণ

- আইইউডি প্রয়োগের জন্য সাউন্ডিং বা ইনসার্টার ঢুকানোর সময় হঠাৎ বাধামুক্ত হবার অনুভুতি
- প্রয়োগের সময় প্রচন্ড ব্যথা, রক্তপাত, নাড়ীর গতি কমে যাওয়া এবং মূর্ছা যাওয়া
- সূতা উপরের দিকে উঠে যায়
- জরায়ুর গভীরতা অস্বাভাবিক বেশী মনে হওয়া, পরবর্তীতে সূতা না পাওয়া বা গর্ভবতী হওয়া
- কারন বোঝা যায় না এমন ব্যথা

কারণ

- জরায়ুর গভীরতা মাপার (সাউন্ডিং করার) সময় ভুল করা
- জরায়ুর গভীরতা ঠিকমত না মাপা (জরায়ুর গভীরতা ৬ সে.মি. এর কম হলে কপার-টি ৩৮০ এ প্রয়োগ করা যাবে না)
- জরায়ুর গভীরতা অনুযায়ী আইইউডি ইনসার্টারে লোড না করা
- প্রয়োগকারীর অদক্ষতা বা অসতর্কতা

ব্যবস্থাপনা

- সাউন্ডিং বা প্রয়োগের সময় জরায়ু বা সারভিক্স ছিদ্র হয়ে থাকলে গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করুন এবং সমস্যা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, যেমন -

- তাৎক্ষনিক অবশিষ্ট প্রক্রিয়া স্থগিত করে নমনীয়ভাবে যন্ত্রপাতি ও আইইউডি বের করে ফেলুন
- গ্রহীতাকে বিশ্রামে রাখুন, শিরায় ড্রিপ শুরু করুন এবং গ্রহীতার ভাইটাল সাইন, পেটের টনটনে ব্যথা, Guarding ও শক্ত হয়ে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করুন
- নাড়ীর গতি বা রক্তচাপ কমে গেলে ইনজেকশন এট্রোপিন শিরায় বা মাংশপেশীতে দিন এবং নরমাল স্যালাইন দিন
- পেটে ব্যথা তীব্রতর হলে, ভাইটাল সাইনের কোন পরিবর্তন বা পেরিটোনাইটিসের কোন লক্ষণ দেখা গেলে জরুরী শল্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে যথাযথ কেন্দ্রে রেফার করুন
- প্রোফাইলেকটিক এন্টিবায়োটিক দিন
- প্রচন্ড ব্যথা হলে ব্যথানাশক ইনজেকশন দিন
- জরায়ু ছিদ্র হওয়া পরবর্তীতে নির্ণীত হলে শল্য ব্যবস্থাপনার জন্য রেফার করুন

- আইইউডি গ্রোথিত হয়ে থাকলে এন্টিবায়োটিক দিন, প্রয়োজনে এলিগেটর ফরসেপ দিয়ে বের করে আনুন অথবা রেফার করুন
- পরীক্ষায় (আলট্রাসাউন্ড / এক্স-রে) আইইউডি জরায়ুর বাইরে দেখা গেলে রেফার করুন। এক্ষেত্রে অপারেশন করে আইইউডি বের করে আনার জন্য গ্রহীতাকে সহযোগিতা করুন এবং বিকল্প জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা পরামর্শ দিন

৫.আইইউডি'র সূতাজনিত সমস্যা

আইইউডি'র সূতাজনিত বিভিন্ন সমস্যা মাঝে মধ্যেই দেখা যায়।

সম্ভাব্য উপসর্গ ও লক্ষণ

- স্বামীর বা সঙ্গীর সূতা অনুভব করা
- সূতা লম্বা হওয়া
- সূতা ছোট হওয়া
- সূতা হারিয়ে যাওয়া

সূতা না পাবার কারণ

- আইইউডি বের হয়ে যাওয়া
- সূতা পেঁচিয়ে জরায়ুর মধ্যে উঠে যাওয়া
- জরায়ু সম্পূর্ণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া
- সূতা আইইউডি থেকে খুলে বা ছিঁড়ে বের হয়ে আসা
- গর্ভধারণের ফলে সূতা উপরে উঠে যাওয়া

ব্যবস্থাপনা

- সূতার জন্য স্বামীর সমস্যা হলে -
  - আশ্বস্ত করুন: তিনি সূতার উপস্থিতি বুঝতে পারলেও তিনি ব্যথা পাবেন না
  - সূতা ছোট করে কেটে দিন
- সূতা লম্বা মনে হলে-
  - সূতা সঠিক মাপমত রেখে কেটে দিন
  - যদি সূতা বেশী লম্বা মনে হয়, তবে আইইউডি ফান্ডাস থেকে নেমে আসার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে আইইউডি খুলে দিন

- সূতা না পাওয়া
  - আইইউডি বের হয়ে গেছে কি-না তা জেনে নিন
  - স্পেকুলাম পরীক্ষা করে সুতা দেখা যায় কি-না তা দেখুন
  - গর্ভবতী কি-না পরীক্ষা করুন (পেলভিক পরীক্ষা, প্রেগনেন্সি টেষ্ট)

- জরায়ুর ভিতরে আইইউডি আছে কি-না পরীক্ষা করুন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আলট্রা-সনোগ্রাম বা এক্স-রে করতে হবে। আল্ট্রাসনোগ্রাম অনেক বেশী তথ্য দেয় (আইইউডি জরায়ুর ভিতরে বা বাইরে কোথায় কিভাবে আছে, গ্রহীতা গর্ভবতী কি-না)। যদি এক্সরে করতে হয় তবে জেনে/ বুঝে নিন যে, গ্রহীতা গর্ভবতী কি-না। গর্ভের প্রথম ৪ মাসের মধ্যে এক্সরে করলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে।
- আইইউডি-এর অবস্থান এবং গ্রহীতা গর্ভবতী কি-না এর উপরে নির্ভর করে ব্যবস্থা নিন।
- জরায়ুর ভিতর থাকলে-সাউন্ডিং করে এলিগেটর ফরসেপ বা স্ট্রেইট আর্টারি ফরসেপ বা কিউরেট দিয়ে বের করে আনুন বা ডিএন্ডসি করুন।
- জরায়ু ছিদ্র হয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে গেলে ল্যাপারোটমি করে আইইউডি বের করে দিন

- সূতা ছোট হওয়া-

- আইইউডির সুতা ছোট হলে সুতা জরায়ুর ভিতরে ঢুকে যেতে পারে বা স্বামী সুতার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেন।
- প্রয়োজনে খুলে দিন এবং নতুন আইইউডি প্রয়োগ করুন।

৬.আইইউডিসহ গর্ভধারণ

আইইউডি গর্ভধারণরোধে অত্যান্ত কার্যকর হলেও ব্যবহারকালীন সময়ে পদ্ধতির ব্যর্থতার কারনে নগন্য সংখ্যক গ্রহীতা গর্ভবতী হতে পারে। আইইউডি ফান্ডাসের কাছাকাছি স্থাপন না করা হলে অথবা আইইউডি আংশিক বা সম্পূর্ণ বের হয়ে গেলেও ব্যবহারকারী গর্ভবতী হতে পারে

সম্ভাব্য উপসর্গ ও লক্ষণ

- মাসিক বন্ধ হওয়া
- গর্ভাবস্থার অন্যান্য লক্ষণ
- সূতা হারিয়ে যাওয়া
- সূতা স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট বা লম্বা হয়ে যাওয়া

ব্যবস্থাপনা

- গর্ভাবস্থা ও Trimaster নিশ্চিত করুন। প্রথম বা দ্বিতীয় Trimaster এর গর্ভবতী হলে জাতীয় নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যবস্থাপনা দিন অথবা বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করুন।
- গ্রহীতা তলপেটের একপাশে তীব্র ব্যথা, যোনীপথে অস্বাভাবিক রক্তপাত, মাথা ঝিম ঝিম করা / মাথায় অস্বাভাবিক হালকাভাব এবং মূর্ছা গেলে জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণ হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখুন
- গর্ভধারণ জরায়ুর বাইরে না হলে এবং প্রথম Trimaster হলে-
  - কাউন্সেলিং করুন
  - তাৎক্ষনিক আইইউডি খোলা হলে সুবিধা ও ঝুঁকি উভয়ই আছে-
    - ৫০% ক্ষেত্রে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
    - ৫০% ক্ষেত্রে জীবন্ত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়
    - পদ্ধতিটি বের করার পরও ২৫-৩০% ক্ষেত্রে আপনা-আপনি গর্ভপাত হতে পারে

- আইইউডি খুলে ফেললে গর্ভপাতের আশংকা কিছুটা বৃদ্ধি পায়
- আইইউডিসহ গর্ভ থাকলে অপরিপক্ক সন্তান (Premature baby) হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিক গর্ভের চেয়ে বেশী থাকে
- জরায়ুতে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে
- ব্যবহারকারী শারীরিক এবং মানসিক অস্বস্থিতে ভুগতে পারেন
- আইইউডি'র কারণে শিশুর বিকলাঙ্গ বা অস্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই

- গ্রহীতা আইইউডি খুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে যদি সুতা দেখা যায় এবং প্রথম Trimaster হয় তাহলে সর্তকতার সাথে সুতা ধরে আইইউডি বের করে দিন। সুতা দেখা না গেলে আল্টাসনোগ্রাম করে দেখতে হবে যে, আইইউডি জরায়ুর ভিতরে আছে, না-কি বেরিয়ে গেছে। আইইউডি যদি যথাস্থানে থাকে, তবে তা খুলে দেয়ার চেষ্টা করা যাবে না।
  - গ্রহীতা আইইউডি না খুলে গর্ভাবস্থা চালিয়ে যেতে চাইলে গর্ভকালীন সেবা দিন এবং গর্ভকালে ডাক্তারের নিবির তত্তাবধানে থাকার ব্যবস্থা নিন। স্বতঃস্ফুর্ত গর্ভপাত হয়ে গেলে, সংক্রমণের লক্ষণ (জ্বর, তলপেটে ব্যথা, রক্তপাত) অথবা অন্য কোন বিপদ চিহ্ন দেখা গেলে সংগে সংগে গ্রহীতাকে সেবাকেন্দ্রে আসার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করুন। প্রসবের সময় আইইউডি খুলে দিন।

- প্রয়োগের ১২ সপ্তাহের বেশী হলে সূতা আপনা-আপনি উপরে উঠে যাবে এবং দেখা গেলেও বের করার প্রয়োজন নেই
- আপনা-আপনি গর্ভপাত শুরু হলে (তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা, রক্তস্রাব)-
  - আইইউডি খুলে দিন
  - ব্যথা নিবারণকারী ঔষধ দিন
  - অসম্পূর্ণ গর্ভপাত হলে ডিএন্ডসি (D&C) বা এমভিএ করুন
  - ৭ দিনের জন্য ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মিলিগ্রাম ১২ ঘন্টা পর পর খেতে বলুন
  - প্রতিদিন ফেরাস সালফেট ৩০০ মিলিগ্রাম করে ১-২ মাস খেতে বলুন

- গর্ভপাত করাতে চাইলে
  - আইইউডি খুলে দিন
  - ১২ সপ্তাহের মধ্যে হলে যথাযথ স্থানে প্রেরন করুন
  - ১২ সপ্তাহের বেশী হলে গর্ভ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কাউন্সেলিং করুন

৭.তলপেটে প্রদাহ

সম্ভাব্য উপসর্গ ও লক্ষণ

- তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশী
- তলপেটে পিউবিক বোনের সামান্য উপর চাপ দিলে ব্যথা এবং জোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে ব্যথা (Rebound Tenderness)
- জরায়ুর মুখ নাড়া চাড়া করলে ব্যথা (সারভাইকাল মোশন টেন্ডারনেস)

- জরায়ুমুখ দিয়ে পূঁজযুক্ত নিঃসরণ বা দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব
- চাপ দিলে জরায়ুতে ব্যথা
- এডেনেক্সাতে চাপ দিলে ব্যথা বা হাত দিয়ে বোঝা যায় এমন চাকা

ব্যবস্থাপনা

- প্রয়োজনীয় ইতিহাস নিন ও শারীরিক পরীক্ষা করুন
- দ্রুত চিকিৎসা প্রদান করুন এবং ২/৩ দিনের মধ্যে অবস্থা যাচাই করুন
- গ্রহীতা আইইউডি রাখতে চাইলে এ ক্ষেত্রে আইইউডি খুলে ফেলার প্রয়োজন নেই
- গ্রহীতার স্বামীকে চিকিৎসা নেয়ার এবং কনডম ব্যবহারের জন্য বলুন
- ২/৩ দিন পর গ্রহীতার অবস্থার উন্নতি হলে চিকিৎসা চালিয়ে যান এবং গ্রহীতাকে ফলো-আপ করুন অবস্থার উন্নতি না হলে বা আরো মারাত্মক হলে গ্রহীতাকে হাসপাতালে ভর্তির জন্য রেফার করুন।

৮.যোনীপথে স্রাব (ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ)

যোনীপথে স্রাব বাংলাদেশে মহিলাদের অত্যন্ত পরিচিত একটি সমস্যা। সুস্থ অবস্থায় একজন মহিলার কিছু পরিস্কার সাদাটে/ স্বচ্ছ আঠাল দুর্গন্ধহীন স্রাব হওয়া স্বাভাবিক। সাধারন মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে স্রাব পানির মত হয় এবং পরিমানে বৃদ্ধি পায়। যোনীপথে সংক্রমণ হলে স্রাবের পরিমাণ, ঘনত্ব, রং এবং গন্ধের পরিবর্তন ঘটে। যোনীপথে স্রাবের পাশাপাশি অন্যান্য লক্ষণ ও চিহ্ন যেমন- অস্বস্তি, যৌনাঙ্গে চুলকানি, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, মাসিকের সময় রক্তস্রাব এবং সহবাসে ব্যথা থাকতে পারে।

যোনীপথে স্রাবের প্রধান কারণসমূহ হলো -

- যোনীপথে সংক্রমণ, যেমন- ক্যানডিডিয়াসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস এবং ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস। কখনো কখনো একটিনোমাইকোসিস হতে পারে।
- জরায়ুমুখে সংক্রমণ, যেমন - গণোরিয়া এবং ক্ল্যামাইডিয়া
- যোনীপথ ও জরায়ুমুখের মিশ্র সংক্রমণ

ক.জরায়ুর মুখে সংক্রমণ (Cervicities)

সম্ভাব্য উপসর্গ ও লক্ষণ

- জরায়ুর মুখ দিয়ে স্রাব, যে স্রাবের উৎস জরায়ু
- হাল্কা স্পর্শে অথবা সোয়াব লাগানোর পর জরায়ুমুখ থেকে সহজে রক্তক্ষরণ

খ. ট্রাইকোমোনিয়াসিস এবং ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস

সম্ভাব্য উপসর্গ ও লক্ষণ

- প্রচুর জলীয় ফেনা ও দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব

গ. ক্যানডিডিয়াসিস

সম্ভাব্য উপসর্গ ও লক্ষণ

- স্রাব সাদা দইয়ের মত হয়

যৌনসঙ্গীর চিকিৎসা

যোনীপথে স্রাবের রোগীর যৌনসঙ্গীকে জানাতে হবে এবং তার চিকিৎসা করতে হবে। উভয়ের চিকিৎসা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকতে বলতে হবে।

পাঠ-২৪
স্থায়ী পদ্ধতি

স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণেচ্ছুক ক্লায়েন্টদের অবহিতকরণ এবং পরামর্শদান

কাউন্সেলিং ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তির কোন কিছু গ্রহণ, বর্জন, পছন্দ বা তার অপছন্দের স্বাধীনতা আছে। যে কোন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের বেলায় এ সত্যটি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবুও যেহেতু স্থায়ী পদ্ধতি সেহেতু অবহিতকরণ এবং পরামর্শদানের গুরুত্ব অনেক বেশী। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপার নয়। একজন গ্রহীতার স্বেচ্ছা সম্মতি এক্ষেত্রে অতি প্রয়োজন। এটা সারা দুনিয়ার স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশেও এই নীতিমালা মেনে চলা হয়।

একজন ইচ্ছুক গ্রহীতা ক্লিনিকে আসার পূর্বে সবকিছু নাও জানতে পারেন বা তাকে যে ব্যক্তি নিয়ে আসে তিনি সব কথা তাকে নাও বলতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় গ্রহীতাকে একটা ইনজেকশন দেয়া হবে বা কোন কিছু কাটা হবে না এসব বলে নিয়ে আসা হয়। তবে যে কথা বলেই আনা হোক না কেন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করার আগে অবশ্যই তাকে সেই পদ্ধতির ভাল-মন্দ সব দিক সম্পর্কে জানানো প্রয়োজন।

তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার তা হলো কাউন্সেলিং এর সেশন শেষে ঐ মূহুর্তে গ্রহীতা যদি কোন পদ্ধতি গ্রহণে অনিচ্ছুক হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, কমিউনিটি প্যারামেডিক হিসেবে আপনার কাজ এখনও শেষ হয়নি। কেননা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা পরামর্শদাতার উচিত নয়। সব কিছু জেনে শুনে গ্রহীতা যে কোন পদ্ধতি নিলে তা দীর্ঘদিন ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য ধৈর্য্যসহকারে সহানুভূতির সাথে পরামর্শ দিতে হবে।

পরামর্শের ক্ষেত্রে ৩টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন ঃ

১) কাউন্সেলিং এর উপযোগী পরিবেশ
২) আদর্শ কাউন্সেলর বা পরামর্শদাতা
৩) বিষয়ের উপর খোলাখুলি আলোচনা

১। উপযোগী পরিবেশ ঃ

ভাল কাউন্সেলিং এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। যেমন-

- আলোচনা বা কাউন্সেলিং কক্ষ যেন নিরিবিলি হয়। অর্থাৎ আলোচনার গোপনীয়তা যেন বজায় থাকে। গ্রহীতা ব্যতীত অন্যান্য লোকজন (তিনি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন), কারণে অকারণে

সেখানে না যাওয়া এবং সার্জন বা অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক সেশন সংক্ষিপ্ত করে তাড়াতাড়ি গ্রহীতাকে পাঠানোর তাগিদ না দেয়া।

- গ্রহীতা ও পরামর্শদাতার বসবার জায়গা যেন কাছাকাছি হয়।
- প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য শিক্ষা উপকরণ পোষ্টার, ফ্লিপচার্ট, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনার একঘেয়েমি দূর করা।

২। আদর্শ কাউন্সেলর বা পরামর্শদাতার বৈশিষ্ট্য ঃ

- মনে রাখা দরকার যে, একজন আদর্শ বা ভাল কাউন্সেলরের উপর ক্লিনিকের সুনাম, গ্রহীতার সন্তুষ্টি এবং গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে, সুতরাং একজন কাউন্সেলর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানাবেন।
- একজন ভাল কাউন্সেলর বা পরামর্শদাতার প্রধান গুণ হলোঃ সকল গ্রহীতাকেই সমান মর্যাদা দেয়া, তার মতামত এবং অভিজ্ঞতার গুরুত্ব দেয়া। গ্রহীতার আনন্দ, বেদনা, বিরক্ত, লজ্জা এবং রাগের অভিব্যক্তি সম্পর্কে ভালভাবে উপলব্ধি করা এবং সেই অনুযায়ী আলোচনার বিষয় বা ধারা নির্ধারণ করা।
- ধৈর্যশীল, বিনয়ী, নমনীয়, সহযোগী এবং সহনশীল মনোভাব প্রকাশ করা।
- গ্রহীতা যাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। নিজে বেশী বলার চেয়ে গ্রহীতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।
- সহজ সরল শব্দের ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং যথাসম্ভব ইংরেজী শব্দ পরিহার করা। সবচেয়ে ভাল হয় যদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাসিক ঋতুস্রাব, যৌন মিলন, গর্ভধারণ, গর্ভপাত এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, উপকরণ সম্পর্কে গ্রহীতা যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে সেটা জেনে নিয়ে সেই ভাষা ব্যবহার করা যায়।
- ফ্লিপচার্ট বা বই, মডেল অথবা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা।
- ফিডব্যাক গ্রহণ করা।

৩। খোলাখুলি আলোচনা ঃ

কি আলোচনা হবে, কতক্ষণ আলোচনা হওয়া উচিৎ সেটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। যোগাযোগ যেন দ্বিমুখী হয় সেটা কমিউনিটি প্যারামেডিক নিশ্চিত করবেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন বাদ না পড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

ক্লায়েন্টের সঙ্গে সু-সম্পর্ক স্থাপন ঃ

- প্রথমে গ্রহীতাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে, সে কার সঙ্গে ক্লিনিকে এসেছে, বাড়ী থেকে কিভাবে এসেছে, আসতে কোন কষ্ট হয়েছে কি না, বাড়ীতে কে কে আছে, ছেলে মেয়ে ক'জন, তারা কে কি করছে এ সকল প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

ক্লায়েন্ট বিশ্লেষণ ঃ

গ্রহীতা কারো সঙ্গে এলে তাকে কি বলে এনেছে সেটা শোনা এবং যদি কোন পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলে থাকে, তা হলে সে সম্পর্কে কতটুকু বলা হয়েছে সেটা জানা।

গ্রহীতা জন্ম নিয়ন্ত্রণের কি কি পদ্ধতির কথা শুনেছে, কি কি ব্যবহার করেছে, সেটা জেনে নেয়া এবং অন্যান্য পদ্ধতির ভাল-মন্দ, ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে কি না সেটা সেই সকল পদ্ধতির ভাল-মন্দ দিক, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, সফলতা ও ব্যর্থতা কতটুকু সে সম্পর্কে আলোচনা করা।

বার্তা প্রদান ঃ

- স্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে পুরুষ গ্রহীতার জন্য ভ্যাসেকটমী ও মহিলা গ্রহীতার জন্য টিউবেকটমীর ব্যবস্থা আছে। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণেচ্ছুক ক্লায়েন্টদের পূর্ণ বিবরণী ফরম পূরণ করা থেকে শুরু করে ল্যাবরেটরী টেষ্ট (রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা), ইনজেকশন, এনেসথেসিয়া, অপারেশনের স্তর, ব্যথা বা কষ্ট, ক্লিনিকে থাকা, ঔষধ খাওয়া, কবে বা কখন বাড়ী ফিরতে পারবে, বাড়ী ফিরে অপারেশনের জায়গার যত্ন নেয়া, নিয়মিত ঔষধ খাওয়া, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, সেলাই কাটা, অসুবিধা হলে কোথায়, কার সাথে যোগাযোগ করবে, পরবর্তী পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, অপারেশন পরবর্তী যৌন মিলন এবং ফলোআপ এর প্রতিটি বিষয় যথাসম্ভব এবং সাবলীলভাবে আলোচনা করা।
- পদ্ধতি গ্রহণে গ্রহীতার মনে ভয় বা সন্দেহ আছে কি না এবং থাকলে সেটা কি ধরনের তা আলোচনা করা।
- অন্য অস্থায়ী পদ্ধতি, তার কার্যকারিতা এবং কোথায় পাওয়া যাবে তা জানিয়ে দেয়া।
- গ্রহীতা আরো কিছু জানতে চায় কি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা।
- গ্রহীতা যদি স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশন করতে চায় তাহলে তাকে অবহিত সম্মতিপত্রে লিখিত বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়ে তার স্বাক্ষর/টিপসই নেয়া।

- আলোচনা শেষে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তার সাথে কথা বলে ভাল লেগেছে একথা বলে পরবর্তী পর্যায়ে তাকে কোথায় যেতে হবে তা বলে দিতে হবে এবং সম্ভব হলে সেখানে পৌছে দিয়ে একটি কাউন্সেলিং সেশন শেষ করা যেতে পারে।

স্থায়ী পদ্ধতি (Sterilization) ঃ

স্থায়ী পদ্ধতির অর্থ হলো যে সকল দম্পতির কাংখিত সন্তান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আর কোন সন্তান নিতে চান না তাদের অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা রোধ করা।

স্থায়ী পদ্ধতি দুই প্রকার ঃ

ক) পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি বা ভ্যাসেকটমী (Vasectomy)

খ) মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি বা টিউবেকটমী (Tubectomy)

পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি বা ভ্যাসেকটমী

পুরুষের অন্ডকোষ শুক্রকীট তৈরী হয়। শুক্রকীটবাহী নালীকে ভ্যাস ডিফারেন্স বলে। পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনে দুটো নালীর একটু করে অংশ বেঁধে কেটে দেয়া হয়। একে ভ্যাসেকটমী বলে। ভ্যাসেকটমী বা পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতিতে পুরুষের শরীর থেকে শুক্রকীট বেরিয়ে যেতে বাধা দেয় যার ফলে আর শুক্রকীট আসতে পারে না। ভ্যাসেকটমী করার পরও স্বাভাবিক নিয়মে বীর্যপাত হয়। তাতে কোন শুক্রকীট থাকে না। যার ফলে গর্ভসঞ্চার হতে পারে না।

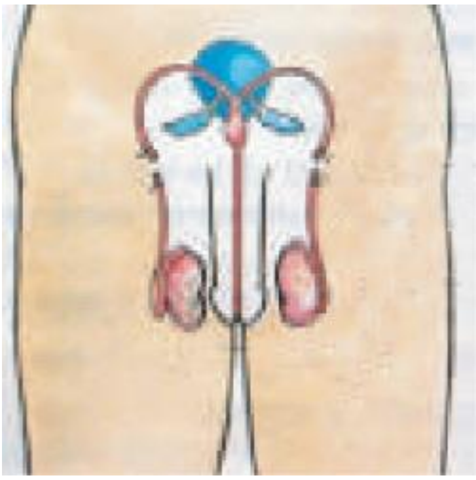

চিত্র ঃ ভ্যাসেকটমী পদ্ধতি

পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি বিষয়ক তথ্যাদি

- ভ্যাসেকটমী একটি স্থায়ী পদ্ধতি
- ভ্যাসেকটমী পুরুষের জন্য একটি সাধারণ ছোট অপারেশন যা করতে ১০/১৫ মিনিট সময় লাগে।
- অপারেশনের পর পর ক্লায়েন্ট বাড়ী যেতে পারে।
- ভ্যাসেকটমী অপারেশনের পর ১-২ দিন আঁটসাট ভাবে পরিস্কার আন্ডার ওয়্যার পরলে ভাল হয়। ভ্যাসেকটমী অপারেশনের পর ৫-৭ দিন সাইকেলে চড়া অথবা অনেক দূর হাঁটা থেকে বিরত থাকতে হয়।
- অপারেশনের পর ১ সপ্তাহ কোন ভারী কাজ করা উচিত নয়।
- অপারেশনের পর ১ সপ্তাহ যৌন সহবাস থেকে বিরত থাকা উচিত।
- বর্তমানে বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে ভ্যাসেকটমী করা হয় তাকে ছুরিবিহীন (No-Scalpel Vasectomy) ভ্যাসেকটমী বলা হয়। এ পদ্ধতিতে অপারেশন করতে কোন ছুরির প্রয়োজন হয় না। এটি চীনের বিখ্যাত সার্জন অধ্যাপক লী শানকুয়া আবিস্কার করেন। এটি খুবই সহজ পদ্ধতি। ক্লায়েন্টের কোন কষ্ট হয় না। সময় কম লাগে। কোন জটিলতা হয় না বললেই চলে। কার্যকারিতা ট্রাডিশনাল ভ্যাসেকটমী থেকে বেশী।

সুবিধা

অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণের কোন ভয় থাকে না। ফলে অপারেশন করানোর পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনে আনন্দ বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

অসুবিধা

এই পদ্ধতি হল স্থায়ী পদ্ধতি। যদি কোন কারণে দম্পতির মতামতের পরিবর্তন হয় বা সন্তান মারা যায়, তাহলে ভ্যাসেকটমী অপারেশন থেকে তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সহজে সম্ভব হয় না।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

- অন্ডকোষের চামড়া থেতলিয়ে যেতে পারে।
- সামান্য ফুলেও যেতে পারে।
- অপারেশনের জায়গায় সংক্রমণ হতে পারে। কখনো খুব সামান্য রক্তক্ষরণ হতে পারে।
- সামান্য ব্যথা হতে পারে।

জটিলতা

- হেমাটোমা (অপারেশনের জায়গায় যথেষ্ট রক্ত জমে যাওয়া) হতে পারে।
- চামড়ার কাটা কয়েকদিনের মধ্যেই মিলিয়ে না যাওয়া।
- সংক্রমণ হওয়া (অপারেশনের জায়গায় পেঁকে যাওয়া বা পুঁজ হওয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা হওয়া)।
- এপিডিডাইমিসের (অন্ডকোষ থেকে যে মোটা নালী শুরু হয়) সংক্রমণ বা প্রদাহ।

বিলম্বে জটিলতা

স্পার্ম গ্র্যানুলোমা হওয়া

অন্ডকোষে দীর্ঘদিন যাবত ব্যথা হওয়া।

মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি বা টিউবেকটমী

মহিলাদের জরায়ুর দুই পাশে দুইটি ডিম্ববাহী নালী থাকে। এই দুটো নালী দিয়ে জরায়ুতে ডিম্ব আসে। এই দুইটি ডিম্ববাহী নালীকে মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের সময়ে বেঁধে কেটে দেয়ার ফলে ডিম্ব এবং শুক্রকীট একত্রে মিলিত হতে পারে না এবং গর্ভধারণও হয় না।

চিত্র ঃ টিউবেকটমী

টিউবেকটমির পরে

মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি বিষয়ক কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

- টিউবেকটমী অপারেশনের আগে গ্রহীতাকে টি টি টিকা নিতে হবে (এক মাস পর পর ২ ডোজ)
- মহিলাকে অপারেশনের সময় ব্যথা নিবারনের ঔষধ দেয়া হয়।

- অপারেশন করতে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগে।
- অপারেশনের দিন বা পরের দিন রোগী বাড়ী ফিরে যেতে পারে।
- ৭ দিন পর্যন্ত মহিলাকে তার ক্ষতস্থান শুকনা রাখতে হবে।
- অপারেশনের ৭ দিন পর ক্ষতস্থানের সেলাই কাটার জন্য ক্লিনিকে বা কমিউনিটি প্যারামেডিক এর নিকট মহিলাকে যেতে হবে।
- ১৫ দিন সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ৩ (তিন) সপ্তাহ কোন ভারী জিনিস বহন করতে পারবেন না। তলপেটে যাতে চাপ না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- হালকা ধরনের কাজ খুব তাড়াতাড়িই শুরু করতে পারবেন।
- অপারেশনের পর মহিলার মাসিক আগের মতই হবে।

সুবিধা

- অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণের কোন ভয় থাকে না। ফলে অপারেশন করানো পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনের আনন্দ বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

অসুবিধা

- এই পদ্ধতি হলো একটি স্থায়ী পদ্ধতি। যে কোন কারণে একজন মহিলার মতামত যদি পরিবর্তন হয় বা কোন কারণে তার সন্তান মারা যায় তাহলে টিউবেকটমী অপারেশন থেকে তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব না। কিন্তু কোন দুর্ঘটনার কারণে যদি গ্রহীতার সন্তান মারা যায় তবে দেশের প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় গ্রহীতাকে পূর্বাবস্থায় নেয়ার সরকারের চেষ্টা রয়েছে। দেশে বর্তমানে ৫ (পাঁচ) টি কেন্দ্রে টিউবেকটমী পুনঃ জোড়া লাগিয়ে সন্তান ধারণ ক্ষমতা ফিরে পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এবং জটিলতা

- সঠিকভাবে অপারেশন করা হলে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এবং জটিলতা খুবই কম, তবুও কিছু জটিলতা হতে পারে। যেমন- শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া, রক্তক্ষরণ, জীবাণু সংক্রমণ ইত্যাদি। তাছাড়াও অপারেশন করার সময় প্রস্রাবের থলী বা পেটের ভিতরের নাড়ী ভুলক্রমে কেটে যেতে পারে।

সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

- অপারেশনের পর পরই ক্ষতস্থানে সামান্য ব্যথা থাকবে।
- বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে।

কোন কোন অবস্থায় স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশন করা যাবে না ?

কয়েকটি কারণে স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশন করা নিষিদ্ধ। মোটামুটিভাবে এসব কারণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) সামাজিক কারণসমূহ ঃ

- যাদের বিয়ে হয়নি।
- মহিলার বয়স যদি ৪৫ বছরের উপরে হয়।
- বেশী বয়স্ক পুরুষ গ্রহীতার বেলায় তার স্ত্রীর বয়স বা তার নিজের স্বাস্থ্য ও সন্তান জন্মদান সক্ষমতার বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।
- যাদের দুটি জীবিত সন্তান নেই অথবা সন্তান সংখ্যা দুটি হলে, শেষ সন্তানের বয়স ২ বছর এর কম তাদের স্থায়ী পদ্ধতি করা উচিত নয়।
- বিধবা, ত্যাজ্য ও বিপত্নীকগণ এ অপারেশনের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- স্বামী বা স্ত্রী যে কোন একজনের এ ধরনের অপারেশন সাফল্যের সাথে হয়ে থাকলে অন্যজনের অপারেশন করা যাবে না। (যদি একাধিক স্ত্রী না থাকে)
- পরিবার পরিকল্পনার কোন পদ্ধতি ব্যবহার ছাড়াই দম্পতির বিগত ৫ বছর কোন সন্তান না হয়ে থাকলে সম্ভবতঃ আর অপারেশন প্রয়োজন হবে না।
- দম্পতির মধ্যে স্ত্রীর ঋতুচক্র বা মাসিক ১ বছরের বেশী বন্ধ (মেনোপজ) হয়ে থাকলে দুজনের কারো অপারেশন করা যাবে না।

খ) মেডিক্যাল কারণসমূহ ঃ

স্থায়ী পদ্ধতির জন্য অযোগ্য ঃ

১। মানসিক রোগ থাকলে

সাময়িকভাবে অযোগ্য ঃ

২। যদি জ্বর থাকে (৩৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা বেশী)

৩। যদি জন্ডিস থাকে বা গুরুতর লিভারের রোগ থাকে।

৪। হিমোগ্লোবিন যদি ৭ গ্রাম% বা ৪৫% এর নিচে থাকে।

৫। যদি কোন অনিয়ন্ত্রিত পুরাতন রোগ যেমনঃ যক্ষা, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমুত্র, হৃদরোগ, হাঁপানী, থ্রম্বোসিস ইত্যাদি থাকে, তাহলে এসব রোগের চিকিৎসার জন্য পরামর্শ ও অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের উপদেশ দিতে হবে। কোন গ্রহীতার উচ্চ রক্তচাপ,বহুমুত্র রোগ বা প্রস্রাবে যদি এলবুমিন থাকে, তাহলে এসব রোগীর অপারেশন একেবারে নিষিদ্ধ নয়। বরং ঐসব রোগীর গর্ভধারণই এসব রোগের চেয়ে মারাত্মক হতে পারে। তবে রোগের প্রকোপ যদি খুব বেশী হয়, তাহলে তাদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া উচিত। সম্ভব হলে এসব রোগীর প্রাথমিক রোগের চিকিৎসা করে অপারেশন করা যায়।

৬। শরীরের যে অংশে অপারেশন করা হবে সেখানে যদি চর্মরোগ থাকে।

৭। গ্রহীতার তলপেটের ভিতর যদি কোন প্রদাহ (পি আই ডি) থাকে।

৮। গ্রহীতা যদি গর্ভবতী হন, তাহলে তার অপারেশন করা যাবে না। গর্ভ যদি অল্পদিনের হয়, তাহলে নিয়মানুযায়ী এম আর করে অপারেশন করা যায়। (স্থায়ী পদ্ধতি ক্যাম্পের জন্য ইহা প্রযোজ্য নয়)।

স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের প্রধান জটিলতাসমূহ (Complication) ঃ

টিউবেকটমী অথবা ভ্যাসেকটমী অপারেশনের সময় অথবা পরে যে সব জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো নিম্নরুপ ঃ

১) স্থানীয় অবশকরণের ঔষধ প্রয়োগের দরুন জটিলতা
২) শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিলতা
৩) হৃদযন্ত্র ও রক্ত চলাচল সংক্রান্ত জটিলতা
৪) পরিপাকতন্ত্র সম্পর্কিত জটিলতা
৫) সংজ্ঞাহীন দূরীকরণ।

স্থানীয় অবশকরণের ঔষধ প্রয়োগের দরুন জটিলতা

ক.১ মৃদু জটিলতা

- ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, অস্থিরভাব, চিন্তাগ্রস্থ বা বমি বমি ভাব।
- মৃদু জটিলতা দেখা দিলে সাধারণতঃ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। শুধু রোগীকে আশ্বস্ত করতে হয়।

ক.২ মারাত্মক জটিলতা

- খিঁচুনী (Convulsion)
  - ❖ শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ পরিস্কার রাখুন। প্রয়োজন হলে সাকশন যন্ত্র ব্যবহার করুন।
  - ❖ এ রকম হলে শিরায় ৫ মি.গ্রাম ডায়াজিপাম ইনজেকশন দিতে হবে। (প্রয়োজনে এ ঔষধ দ্বিতীয় বার দেয়া যায়)।
  - ❖ অক্সিজেন দিতে হবে।
- আরও মারাত্মক অবস্থার জন্য মাংশপেশী শিথিলকারী এর প্রয়োজন হতে পারে এবং সাথে সাথে রিসাসসিটেটর (এ্যাম্বু ব্যাগ) এর মাধ্যমে প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে ঃ

- ❖ এ্যাম্বু ব্যাগের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ঃ

- ❖ কার্ডিও পালমোনারী রিসাসিটেশন করতে হবে।

ঘ. গ্রহীতার মারাত্মক এনাফাইল্যাকটিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ঃ

- ❖ এক্ষেত্রে গ্রহীতার শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে আসতে পারে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ইডিমা (Oedema) দেখা দিতে পারে। রক্তচাপ কমে গিয়ে অভিঘাত বা শকের চিহ্ন/লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা ঃ এডরিনালিন (১ঃ১০০০) এর এ্যাম্পুল (১ মি.লি.) শিরায় দিতে হবে। হাইড্রোকর্টিসন ইনজেকশন দিতে হবে অথবা ডেক্সামেথাসন ইনজেকশন ১ এ্যাম্পুল শিরায় দিতে হবে। রোগীর পায়ের দিকটা একটু উপরে তুলে দিতে হবে। এছাড়া অন্যান্য লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিলতা

ক. মৃদু জটিলতা

জিহ্বা ঃ

সাধারণত জিহ্বা পিছনের দিকে উল্টে গিয়ে শ্বাসনালীতে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।

ফ্যারিংস ঃ

মিউকাস বা বমি এমনকি (নকল দাত খুলে ফ্যারিংস আটকে দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে)

ল্যরিংস ঃ

কখনও কখনও ল্যারিংস এ সম্পূর্ণ সংকোচন বা স্পাজম হতে পারে। এক্ষেত্রে গলার মধ্যে কোন শব্দ হয় না। আবার কখনও কখনও ল্যারিংস এর সংকোচন অসম্পূর্ণ হতে পারে। এক্ষেত্রে গলার মধ্যে গড় গড় শব্দ হতে পারে।

ট্রাকিয়া বা ব্রংকাই ঃ

খাবার, বমি বা বাইরে থেকে কোন কিছু গিয়ে এসব জায়গায় আটকে যেতে পারে।

শ্বাসনালীর নিচের অংশে সংকোচন বা ব্রংকোস্পাজম ঃ

ঘটনাচক্রে পরিপাকতন্ত্রের এসিড বা ভূক্ত খাদ্য দ্রব্য, সুপারী প্রভৃতি শ্বাসনালীর নিচের অংশে ঢুকে যেতে পারে। একারণেও শ্বাসনালীর এ অংশে সংকোচন দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

মাথা পিছন দিকে বাঁকা করতে হবে। একটি ভাজ করা গজ এবং আঙ্গুলের সাহায্যে শ্বাসনালীতে যদি কোন বাঁধা থাকে, তাহলে সেই বাঁধাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এবং রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে। খুব বিরল ক্ষেত্রে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন হতে পারে।

অপ্রতুল শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

কয়েকটি কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে যেমন-

- শ্বাসনালীতে বাতাস চলাচলে বাধা ঃ খুব বেশী পরিমাণে ঘুমের ঔষধ দিলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।
- রোগীর যদি নিউমোনিয়া, নিউমোথোরাক্স রোগ থাকে তাহলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের অপ্রতুলতা সৃষ্টি হতে পারে।
- রোগীর রক্তস্বল্পতা, অতিরিক্ত রক্তপাত বা হৃৎপিন্ডের কাজে বিঘ্ন ঘটলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের অপ্রতুলতা দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

- কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস বা সাহায্যকৃত শ্বাস-প্রশ্বাস

- অক্সিজেন
- কারণসমূহের চিকিৎসা ঃ যেমন- যদি প্যাথেডিন ইনজেকশন দেয়ায় ঘুমের ভাব বেশী হয় তাহলে ন্যালোকসন ইনজেকশন দিতে হবে।

হৃদযন্ত্র ও রক্ত চলাচল সংক্রান্ত জটিলতা

ক. **নাড়ীর গতি ঃ**

- বেড়ে যেতে পারে (ট্যাকিকারডিয়া), নাড়ীর গতি মিনিটে ১০০ বার এর উপরে।
- কমে যেতে পারে (ব্রাডিকার্ডিয়া), নাড়ীর গতি মিনিটে ৬০ বার এর নিচে।

খ. **রক্তচাপ (ব্লাডপ্রেসার) ঃ**

- বেড়ে যেতে পারে
- কমে যেতে পারে

গ. **হৃদস্পন্দন (হার্টবিট) ঃ**

- এরিদমিয়া বা আলাদা হৃদস্পন্দন হতে পারে। হৃৎপিন্ড থর থর করে কাঁপতে পারে।
- রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা

- শিরার মধ্যে দিয়ে ফ্লুইড, রক্ত বা রক্তের বিকল্প কোন তরল পদার্থ দিতে হবে।
- হাইড্রোকরটিসন ইনজেকশন শিরায় দিতে হবে
- গ্রহীতার পায়ের দিকটা উপরে তুলে দিতে হবে
- অক্সিজেন দিতে হবে।

ঘ. **হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হৃদযন্ত্র বন্ধের (Cardiac Arrest) কয়েকটি লক্ষণ ঃ**

- রোগী মলিন ও নীল হয়ে যাবে।
- বড় বড় ধমনী যেমন ক্যারোটিড ধমনীতে কোন পালস পাওয়া যাবে না। হৃৎপিন্ডের কোন শব্দ পাওয়া যাবে না।
- চোখের মনি দ্রুত প্রসারিত হয়ে যাবে (ডাইলেটেড পিউপিলস)।
- শ্বাস-প্রশ্বাস থাকবে না।

ব্যবস্থাপনা

সি পি আর প্রয়োগ করতে হবে। এ বি সি দক্ষতা প্রয়োগ করতে হবে।

ক) শ্বাসনালী বা এয়ারওয়ে ঃ

- রোগীকে চিৎ করে সমতল বিছানা বা মেঝেতে শোয়াতে হবে।
- রোগীর মাথাটা একটু পেছনের দিকে টেনে দিতে হবে।
- চোয়ালটা সামনের দিকে টেনে ধরতে হবে।
- থুতনিটাকে উপরের দিকে টেনে ধরতে হবে। এ ব্যবস্থাপনায় জিহ্বা উল্টে গিয়ে শ্বাস-পশ্বাস এর রাস্তা বন্ধ হলে তা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- মুখের মধ্যে যদি কোন লালা বা শ্লেষ্মা থেকে থাকে তাহলে তা আঙ্গুলের সাথে গজ জড়িয়ে নিয়ে মুছে ফেলতে হবে। (সাকশন মেশিন বা এম আর সিরিঞ্জ ও রাবার ক্যাথেটার দিয়ে মুখ থেকে শ্লেষ্মা টেনে বের করে আনা যায়) সাকশন মেশিন থাকলে তা ব্যবহার করতে হবে। রোগী যদি বমি করে, তাহলে তাকে একপাশে কাত করে শোয়াতে হবে এবং সাকশন দিতে হবে।

খ. শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

- এয়ার টিউব মুখের মধ্যে দিয়ে গলায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। এরপর আম্বুব্যাগ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আম্বুব্যাগ না থাকলে মুখ থেকে মুখে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. রক্তসঞ্চালন ঃ

উপরের প্রক্রিয়া চালানোর সময় সাহায্যকারী অবশ্যই ক্যারোটিড পালসের দিকে দৃষ্টি রাখবেন। যদি ক্যারোটিড পালস পাওয়া না যায়, তাহলে কার্ডিও পালমোনারী রিসাসিটেশন শুরু করতে হবে। যদি কার্ডিও পালমোনারী রিসাসিটেশন বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ না থাকে, তাহলে এ ধরনের প্রচেষ্টা নেয়া যাবে না।

হৃদযন্ত্রের ম্যাসেজে কাজ হচ্ছে কি না তা কেমন করে বোঝা যাবে ঃ

১) রোগীর রং পরিবর্তন হয়ে উন্নতির দিকে যাবে (নীলাভ ভাব কমতে থাকবে)

২) ক্যারোটিড ধমনীর পালস হাত দিয়ে অনুভব করা যাবে।

৩) চোখের মনি আলোয় সংবেদনশীল হবে

৪) শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে আসবে।

কোন কোন কারণে হৃদযন্ত্রের ম্যাসেজ বিফল হয় ঃ

১) শ্বাস প্রশ্বাসে প্রয়োগ অপ্রতুল হলে হৃদযন্ত্রের ম্যাসেজ বিফল হতে পারে। হৃদযন্ত্রে এবং মস্তিস্কে যদি খুব কম পরিমাণে অক্সিজেন বিশোধিত রক্ত ফিরে আসে তাহলে হৃদযন্ত্রের ম্যাসেজে কাজ হয় না।

২) যদি নরম বিছানা অথবা স্প্রিং এর বিছানা হয় তাহলে হৃদযন্ত্রের ম্যাসেজে কোন কাজ নাও হতে পারে।

প্রতুল বা প্রয়োজনীয় ম্যাসেজ ও অক্সিজেন সরবরাহের পর সম্ভাব্য অবস্থা ঃ

- হৃৎপিন্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়।
    - যদি রক্তচাপ কম থাকে, তাহলে রিদম অনুযায়ী ম্যাসেজ করেই যেতে হবে।
    - শিরার মধ্যে স্যালাইন দিতে হবে।
    - হৃদপেশী সংকোচনের জন্য এডরিনালিন ইনজেকশন দিতে হবে।
    - হাইড্রোকরটিসন ইনজেকশন শিরায় দিতে হবে।
- হৃৎপিন্ডের গতি দ্রুত ও অনিয়মিত হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সোডিবাইকার্ব ইনজেকশন দিতে হবে।

পাঠ-২৫

অটোক্লেভ

জীবাণুমুক্তকরণ অটোক্লেভ পদ্ধতি

বিভিন্ন দ্রব্য/উপকরণ জীবাণুমুক্তকরণ সময়কাল ঃ

অটোক্লেভ করার জন্য চাপ, সময় ও তাপ সম্বন্ধে নিশ্চিত হউন।

দ্রব্যের নাম	তাপমাত্রা	চাপ (পাউন্ড)	সময় মিনিটে (সঠিক তাপমাত্রা ও চাপ উঠার পর)
লিনেন (এবডমিনাল সীট, গজ, তুলা, মাস্ক, ক্যাপ, গাউন ইত্যাদি)	১২১ ডিগ্রী সেঃ (২৫০ ডি. ফাঃ)	১৫-২০	৩০
রাবারের দ্রব্য (গ্লাভস্, ক্যাথেটার, রাবার টিউব ইত্যাদি)	১২১ ডিগ্রী সেঃ (২৫০ ডি. ফাঃ)	১৫-২০	২০
কাপড়ে আবৃত যন্ত্রপাতি	১২১ ডিগ্রী সেঃ (২৫০ ডি. ফাঃ)	১৫-২০	৩০
অনাবৃত যন্ত্রপাতি	১২১ ডিগ্রী সেঃ (২৫০ ডি. ফাঃ)	১৫-২০	২০
কাঁচের দ্রব্যাদি	১২১ ডিগ্রী সেঃ (২৫০ ডি. ফাঃ)	১৫-২০	২০

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে সাধারণ যে অটোক্লেভটি ব্যবহার করা হয় তার নাম হচ্ছে অল আমেরিকান প্রেসার ষ্টীম স্টেরিলাইজার। এই অটোক্লেভটি তিন সাইজের পাওয়া যায়। মডেল হচ্ছে ১৯১৫ এক্স, ১৯২৫ এক্স এবং ১৯৪১ এক্স (ছোট, মাঝারী ও বড়)।

চিত্র ঃ অটোক্লেভ

অটোক্লেভের বিভিন্ন অংশের নাম

১। হাতলযুক্ত অটোক্লেভ লিড বা ঢাকনা/ঢাকনার সঙ্গে সংযুক্ত আর ৪টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। যেমন-ঢাকনার বাহিরের দিকে রয়েছে-

ক) এয়ার ষ্টীম কন্ট্রোল ভাল্ব ঃ অটোক্লেভের পানি ফুটতে আরম্ভ করলে এই ভাল্ব দিয়ে বাষ্প বের হয়। প্রয়োজনে উপরের ছোট অংশটি বন্ধ করে রাখা হয়। এই ভাল্বটি খাড়াভাবে থাকলে বাষ্প বের হয় এবং বন্ধ করে দিলে সমান্তরাল অবস্থায় থাকে।

খ) সেফটি ভাল্ব ঃ অটোক্লেভের ভিতর যদি বাষ্পের চাপ খুব বেশী হয় তবে আপনা আপনিই এই ভাল্ব দিয়ে বাষ্প বের হয় যার ফলে বিষ্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে না।

গ) ষ্টীম প্রেসার গজ ঃ এটা ঘড়ির মত একটি ডায়াল যাতে অটোক্লেভের ভিতরের চাপ দেখা যায়।

ঘ) হোস পাইপ ঃ ঢাকনার ভিতরে একটি লম্বা পাইপের মত সংযুক্ত আছে তার নাম হচ্ছে হোস পাইপ বা বাতাস বের হওয়ার টিউব।

চিত্র ঃ অটোক্লেভ-এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ

২। অটোক্লেভের ভিতর রয়েছে বড় একটা ড্রেসিং কনটেইনার (Dressing Container) অথবা ইনার কনটেইনার উইথ চ্যানেল (Inner container with channel) ঃ এর ভেতর সব ধরনের ড্রাম, যন্ত্রপাতি, লিনেন ইত্যাদি রাখা হয় অটোক্লেভ করার জন্য চ্যানেল এ হোস পাইপ ঢুকান হয়ে থাকে।

৩। ইনার কনটেইনার এর নিচে থাকে একটা ছিদ্রযুক্ত এ্যালোমিনিয়ামের চাকতি (Perforrated Aluminium Disk)। ড্রেসিং কনটেইনারের ভিতর যাতে পানি না ঢুকে সেই জন্য এই চাকতি বা প্লেটটি ব্যবহার করা হয়।

৪। সব চাইতে বড় অংশ হচ্ছে আটটি নাটসহ অটোক্লেভের প্রধান অংশ (Main body with 8 wingnuts, Bakelite knobs) ঃ সব যন্ত্রপাতি ড্রেসিং কনটেইনার রাখা হয়।

অটোক্লেভ চালাবার চেকলিষ্ট

ক্র.নং	যে সব বিষয় দেখতে হবে/ করতে হবে	০	১
১।	অটোক্লেভ ব্যবহার করার আগে যা পরীক্ষা করতে হবে ঃ		
	• অটোক্লেভের সমস্ত যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না		
	• বন্ধ করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা আছে কি না		
	• Air Steam Control Valve ঠিকমত কাজ করে কি না		
	• বাষ্প লিক করে কি না		
	• কোথাও কোন ফাটল থাকলে অটোক্লেভ ব্যবহার করা যাবে না		
	সব কিছু ঠিক থাকলে অটোক্লেভ চালাবার জন্য প্রস্তুত করুন ঃ		
২।	অটোক্লেভের ঢাকনা খুলুন		
৩।	তারপর ইনার কনটেইনার সরিয়ে দিন		
৪।	নির্ধারিত পরিমাণ পরিস্কার পানি (সম্ভব হলে বিশুদ্ধ পানি) ষ্টেরিলাইজার এর ভিতর ঢালুন। লক্ষ্য রাখতে হবে পানির পরিমাণ যাতে এক ইঞ্চির কম অথবা দুই ইঞ্চির বেশী না হয়		
৫।	তারপর ছিদ্রযুক্ত এ্যালোমিনিয়াম র‌্যাক টা ভিতরে দিন (Aluminium Rack)		
৬।	তার উপর ইনার কন্টেইনার বসান		

৭।	জীবাণুমুক্ত করার উপকরণাদি ষ্টেরিলাইজিং ড্রামে (Sterilizing Drum) সাজিয়ে দিন এবং এর ছিদ্র খোলা রাখুন। তারপর ড্রামটি ইনার কন্টেইনার এর ভিতরে দিন। যন্ত্রপাতির মাঝে বাষ্প যাতে অবাধে চলাফেরা করতে পারে সে ব্যাপারে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে		
৮।	ড্রাম এবং ড্রামের উপর লিফটার (Lifter) রাখুন। ষ্টেরিলাইজিং ড্রাম এর ঢাকনার উপরে অটোক্লেভ টেপ তারিখ লেখাসহ লাগান		
৯।	উপকরণাদিসহ ইনার কন্টেইনার অটোক্লেভে দেয়ার পর ঢাকনার বাতাস বের হওয়ার টিউবটিকে ইনার কন্টেইনার চ্যানেলে ঢুকিয়ে দিন		
১০।	ঢাকনার এবং বডির যে অংশ একত্রে থাকবে তাতে সামান্য সেলাই মেশিনের তেল বা Vaseline লাগান		
১১।	তারপর ঢাকনার উপর চিহ্নটি অটোক্লেভের বডির উপরের অংশে চিহ্নটির সঙ্গে একই লাইনে রেখে ঢাকনা বন্ধ করুন		
১২।	তারপর উইং নাটসগুলো দুই হাত দিয়ে বিপরীত দিক থেকে লাগান। কোন রেঞ্জ ব্যবহার করা যাবে না		
১৩।	এবার অটোক্লেভটি একটি ষ্টোভ এর উপর বসান এবং এয়ার ষ্টীম কন্ট্রোল ভাল্ব (Air Steam Control Valve) খাড়াভাবে রাখুন		
১৪।	কেরোসিন চুলা বা চার বার্নার ষ্টোভ জ্বালিয়ে তাপ দিতে শুরু করুন		
১৫।	বাষ্প বের হওয়ার পর ষ্টীম কন্ট্রোল ভাল্ব ৪ মিনিট খোলা রেখে তারপর ভাল্বটি সমান্তরালভাবে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিন। বাষ্পদাহ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে ভাল্ব নাড়াচাড়া করবেন না, একটি কাঠি ব্যবহার করুন। বাষ্প দেখে বুঝবেন যে তাপমাত্রা ২৫০ ডিগ্রী ফাঃ অথবা ১২০ সে. এ রয়েছে		
১৬।	ষ্টীম গজ (Steam Gauge) এর দিকে লক্ষ্য রাখুন। যখন চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫-২০ পাউন্ডে পৌঁছাবে তখন বুঝবেন যে জীবাণুমুক্তকরণ শুরু হয়েছে। ঘড়ি দেখে সময় নির্ধারণ করুন		
১৭।	ষ্টোভের আগুন নিয়ন্ত্রণ করে ১৫-৩০ মিনিট এই চাপ ১৭-১৯ পাউন্ডে বজায় রাখুন। রাবারের দ্রব্যাদি যেমন- গ্লাভস্, ক্যাথেটার এর বেলায় ২০ মিনিট নির্ধারণ করুন		

১৮।	অটোক্লেভিং হয়ে গেলে সাবধানে এয়ার ষ্টীম কন্ট্রোল ভাল্বটি খাড়া করে দিয়ে বাষ্প বের করে চাপ শূন্যে নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে		
১৯।	চাপ শুন্যে নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন (যাতে বাষ্প হাতে না লাগে)		
২০।	দেরি না করে ঢাকনা খুলুন। দেরী হলে ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হতে পারে ফলে ঢাকনা খুলতে অসুবিধা হবে। খোলার সময় শুধুমাত্র হাতল ধরবেন, কখনও প্রেসার গজ ধরে টানবেন না		
২১।	জীবাণুমুক্তকরণ লিফটার জার এবং লিফটার ফরসেপ সরিয়ে দিন। শুধুমাত্র জারের বাইরের গা এবং ফরসেপের হাতল স্পর্শ করুন। ড্রেসিং ড্রাম সরিয়ে নিয়ে এর ছিদ্র বন্ধ করে দিন		
২২।	অটোক্লেভ টেপে তারিখ লেখা নিশ্চিত করুন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে অটোক্লেভের জীবাণুমুক্ত উপকরণাদি ব্যবহার করা ভাল, তবে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। এই কারণেই টেপ এ তারিখ লিখে রাখা প্রয়োজন		
২৩।	ব্যবহারের পর অটোক্লেভের অবশিষ্ট পানি সরিয়ে নিন অটোক্লেভ মুছে দিন যাতে পানি লেগে না থাকে		
২৪।	কোরোসিন এর চুলার তাপ দিয়ে যদি অটোক্লেভ এর গা কাল হয়ে যায় তবে মেজে পরিস্কার করতে হবে		

SAB অটোক্লেভ মেশিন চালানোর নির্দেশাবলী

(এই অটোক্লেভটি উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়)

- অটোক্লেভের ফিলামেন্ট (ভিতরের গোল প্লট) পর্যন্ত পানি ভর্তি করুন।
- খাচা ও ড্রামগুলো ভিতরে বসিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিন।
- অটোক্লেভের নিচে চার বার্নার ষ্টোভ ধরিয়ে দিন।
- মিটারে বাষ্পের চাপ লক্ষ্য করুন। লিনেন, গজ ও যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে চাপ ১.৫-২.০ বে.মি. ৩০ মিনিট পর্যন্ত স্থির রাখুন।
- অতঃপর সুইচ অফ করে অথবা ষ্টোভ সরিয়ে নিয়ে তাপ সঞ্চার বন্ধ করুন।
- ভিতরের বস্তুসমূহ শুকাবার জন্য নিচের বল ভাল্বটি খুলে পানি ও বাষ্প বের করে দিন এবং প্রেসার ০.২ বে.মি. হতে নেমে আসলে ভাল্বটি পুনরায় বন্ধ করে দিন।
- এরপর এয়ারষ্টীম আউটলেটটি খুলে দিন। এতে বাষ্প বেরুবে।
- চাপ শুন্যে নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর অটোক্লেভের ঢাকনা খুলুন। ড্রাম বের করে নিন।
- গ্লাভস আলাদা করে অটোক্লেভ করতে হবে।
- গ্লাভস্‌গুলো জোড়া জোড়া করে ছোট ছোট কাপড়ের মধ্যে ভরে ড্রামে দিতে হবে এবং গ্লাভসের ক্ষেত্রে সময় লাগবে ১.৫ বে.মি. প্রেসার উঠার পর বিশ মিনিট।
- অটোক্লেভ করার জন্য চাপ, সময় ও তাপ সম্বন্ধে নিশ্চিত হউন।

পাঠ-২৬

অস্ত্রোপচার কক্ষ প্রস্তুতি

১। অস্ত্রোপচার কক্ষ ঠিক আছে কি না দেখুন (দরজা জানালার নেট আছে, যথেষ্ট আলো প্রবেশ করে, পানির সরবরাহ ঠিক আছে, ইমারজেন্সী লাইট আছে/লাইটে ব্যাটারী কার্যকরী কিনা ইত্যাদি) মশা-মাছি যেন অস্ত্রোপচার কক্ষে ঢুকতে না পারে, পরিস্কার পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এবং কারেন্ট বন্ধ হলে অপারেশন যেন নিরাপদে শেষ করা যায়।

২। অস্ত্রোপচারের দিন এন্টিসেপটিক সলিউশন দিয়ে অস্ত্রোপচার কক্ষ পরিস্কার করুন। (অস্ত্রোপচার কক্ষ প্রস্তুত করার জন্য যে জিনিষ যেমন- বালতি এবং পুরানো কাপড় শুধুমাত্র অস্ত্রোপচার কক্ষের জন্যই ব্যবহার করতে হবে)।

- অস্ত্রোপচার দিনটিতে এন্টিসেপটিক সলিউশন দিয়ে অপারেশন থিয়েটার পরিস্কার করতে হবে।
- প্রতিটি অপারেশনের শেষে কমপক্ষে টেবিল এবং ট্রলি এন্টিসেপটিক বা ব্লিচিং সলিউশন দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।
- অপারেশন থিয়েটার পরিস্কারের কাজে যে উপকরণাদি ব্যবহৃত হবে তা শুধুমাত্র এই কাজের জন্যই রাখতে হবে, যেমন- মেঝে মোছার জন্য পুরানো কাপড়। পাট সোয়াব ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ অনেক জীবাণু ভেজা সোয়াবে লেগে থাকে।
- ব্যবহার করার কাপড় ভালভাবে ধুয়ে রোদে শুকাবেন।

৩। হাত ধোয়ার সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করুন।

কল এবং বেসিন ভিম পাউডার/ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। সাবান, ব্রাশ বেসিনের পাশে শুকনা এবং পরিস্কার রাখতে হবে। পানি সরবরাহ কখন বন্ধ হবে কেউ বলতে পারে না। সেজন্য সব সময় **১** বালতি প্রস্তুত করে রাখবেন।

৪। অপারেশনের সাথে যারা জড়িত থাকবেন তাদের জন্য সংক্রমণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে পরিস্কার জুতা, মাস্ক এবং ক্যাপ দরজার কাছে রাখতে হবে।

৫। প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক দ্রবণ সংগ্রহ করুন। মনে রাখবেন প্রত্যেক দিন নতুন দ্রবণ তৈরী করতে হবে।

৬। জরুরী যন্ত্রপাতি (অক্সিজেন পূর্ণ সিলিন্ডার, নল, মাস্ক, আম্বোব্যাগ, বিপি মেশিন, সাকার মেশিন, এম. আর সিরিঞ্জ, এয়ারওয়ে টিউব) প্রস্তুত করুন। যেন জরুরী অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেয়া যায়। যেমন- শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হলে অক্সিজেন দেয়া যায়। গলায় কিছু জমে গেলে সাকার মেশিনের সাহায্যে সাকশন দেয়া যায়। আম্বুব্যাগের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেয়া যায়।

৭। টেবিলে জরুরী ঔষধপত্র সাজিয়ে রাখুন যেন প্রতিটি ঔষধ সহজেই সনাক্ত করা যায়। যেমন- রক্তচাপ কমে গেলে, হাইড্রকর্টিসোন ইনজেকশন দিতে হয়। জরুরী প্রয়োজনে সহজেই ঔষধ বের করা যায় (সংযুক্ত ক ও খ দেখুন)।

৮। জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্র প্রস্তুত রাখুন (ল্যাপারোটোমি সেট)। যেমন- কোন কারণে যদি অপারেশন এর এলাকা বাড়ানোর প্রয়োজন হয় তাই একটি অটোক্লেভ করা ল্যাপারোটোমি সেট এর দরকার হয় এবং সঙ্গে অন্যান্য ঔষধ যেমন- ৫% ডেক্সট্রোজ ইন নরমাল স্যালাইন ৫০০ এম.এল.।

৯। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত অবস্থায় সাজিয়ে নিন। সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এবং কম সময়ে অস্ত্রোপচার এর কাজ শেষ করার জন্য ষ্টেরিলাইজার ড্রাম থেকে যন্ত্রপাতি স্থানান্তর পদ্ধতি ঃ একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্যারামেডিক ঐ কাজে নিয়োজিত থাকবেন। তাকে অবশ্যই ক্যাপ ও মাস্ক পরে জীবাণুমুক্ত লিফটার দিয়ে অপারেশনে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষ স্থানান্তর করতে হবে।

১০। অস্ত্রোপচার শেষে পুনরায় অস্ত্রোপচার কক্ষ পরিস্কার করুন।

সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার দরকার।

১১। মাসে অন্তত:পক্ষে একবার অস্ত্রোপচার কক্ষ ফিউমিগেশন করুন।

দূষিত অস্ত্রোপচার কক্ষ জীবাণু থেকে রক্ষা করার জন্য মেডিক্যাল অফিসার এই ব্যবস্থা করবেন।

অন্যান্য ঃ

অস্ত্রোপচার কক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীগণ ঃ

ক) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্জন।

খ) ও.টি নার্স, এফডাব্লিউভি বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্যারামেডিক, যারা অপারেশন এর সময় অস্ত্রোপচার পরিচালনা করবেন। হেলথ কমপ্লেক্সে অস্ত্রোপচার এর কক্ষের দায়িত্ব অস্ত্রোপচার কক্ষের নার্সের উপর ন্যস্ত থাকবে।

গ) সার্জন এর সহকারী ডাক্তার/স্যাকমো বা কমিউনিটি প্যারামেডিক।

ঘ) অপারেশনের সময় ভর্তি ফরমে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমুহ লিপিবদ্ধ করার জন্য এবং গ্রহীতার পালস/নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্তচাপ পরিমাপ করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্যারামেডিক, এফডাব্লিউভি ও মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট।

ঙ) গ্রহীতার বিবরণ গ্রহণ, ওজন মাপা, তাপ, রক্তচাপ ও পি ভি পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্যারামেডিক, এফডাব্লিউভি, স্যাকমো, অপারেশন পূর্ববর্তী ঔষধপত্রের ব্যবস্থা এবং অপারেশন পরবর্তী মনিটরিং এর ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন যাতে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণেচ্ছুক ক্লায়েন্টদের পূর্ণ বিবরণী ফরম গ্রহীতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার কক্ষে যায় এবং গ্রহীতার সঙ্গেই নিরাময় কক্ষে ফিরে আসে।

চ) পিয়ন বা ও.টি টেকনিশিয়ান- ও.টি নার্সের/ কমিউনিটি প্যারামেডিক এর তত্ত্বাবধানে অটোক্লেভিং এর ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

ছ) আয়া-অপারেশন কক্ষ পুরনো কাপড় দিয়ে মুছে পরিস্কার করবে (কখনই ঝাড়ু ব্যবহার করা যাবে না)

- গ্রহীতাকে শেভ করানো, নতুন শাড়ী পরানো, অপারেশন থিয়েটারে যাবার পূর্বে প্রস্রাব পায়খানা করার সময় সাহায্য করা এবং
- অপারেশন পরবর্তী গ্রহীতাদের দেখাশুনায় সাহায্য করা।

জ) পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী যদি গ্রহীতার সঙ্গে আসেন, তারা কমিউনিটি প্যারামেডিক এর তত্ত্বাবধানে, বিবরণ গ্রহণ, প্রস্রাব সংগ্রহ ও পরীক্ষা কার্যে সাহায্য করতে পারেন।

ঝ) পুরুষ মাঠকর্মী যদি পুরুষ গ্রহীতার সঙ্গে উপস্থিত থাকেন তবে ভ্যাসেকটমী প্রস্তুতির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।

ঞ) অপারেশনের একদিন পূর্বে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্যারামেডিক, এফডাব্লিউভি, স্যাকমো লিনেনের ড্রাম, যন্ত্রপাতি, কাচের সিরিঞ্জ, সূঁচ, কাপড় এবং তুলার বল তৈরী রাখার দায়িত্বে থাকবেন।

কয়েকটি জরুরী নির্দেশ

(এগুলো লিখে অস্ত্রোপচার কক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে হবে)

১। রোগীর নিঃশ্বাস নেয়ার রাস্তায় কোন বাধা আছে কি না, তা দেখতে হবে। যদি থাকে মাথাটা একপাশে কাত করে দিয়ে থুতনিটা উপরের দিকে টেনে ধরে নিচের চোয়ালটা সামনের দিকে একটু ঠেলে ধরতে হবে।

২। প্রয়োজন হলে আর্টারী ফরসেপ এর মাথায় গজ জড়িয়ে নিয়ে মুখের ভিতরের নিঃসরণ পরিস্কার করা যায়। সাকশন মেশিন/এম আর সিরিঞ্জ এর সাথে ক্যাথেটার লাগিয়েও খুব ভালোভাবে সাকশন দেয়া যায়। গলার ভিতর যদি কিছু আটকে থাকে, জিহ্বা গজ দিয়ে ধরে সামনের দিকে টেনে এনে তা বের করতে হবে।

৩। মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য এয়ারওয়ে টিউব ব্যবহার করতে হবে।

৪। প্রয়োজনে আম্বোব্যাগ দিয়ে বা মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু করতে হবে। অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে টিউবের সাহায্যে আম্বোব্যাগে অক্সিজেন দেয়া যায়।

৫। পেথিড্রিন ইনজেকশনজনিত কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে থাকলে ন্যালোকসন ইনজেকশন শিরার মধ্যে (I.V) দিতে হবে।

৬। যদি কিছু সময়ের জন্যও শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এসিডোসিস হতে পারে। এজন্য ৪০-৫০ মিলি ৭.৫% সোডিয়াম বাই কার্বনেট ইনজেকশন দিতে হবে।

৭। যদি রক্তচাপ কমে গিয়ে অভিঘাতের বা শকের (Shock) লক্ষণ যেমন- নীলাভ, ঘর্মাক্ত দেখা যায় তাহলে ৫% গ্লুকোজসহ স্যালাইন শিরার মধ্যে দিতে হবে। এর সাথে ১০০-২০০ মি.গ্রা. হাইড্রোকরটিসন দিতে হবে। অভিঘাতের লক্ষণ হল দ্রুত এবং ক্ষীণ নাড়ী (Rapid and Thready Pulse), রক্তচাপ কমে যাওয়া, কপালে ঠান্ডা ঘাম দেখা যায়।

৮। যদি হৃৎপিন্ডের কাজে বিঘ্ন হয় তাহলেঃ

ক) কার্ডিও-পালমোনারী-রিসাসিটেশন শুরু করতে হবে।

খ) এড্রিনালিন (১ঃ১০০০) ০.৫-১ মি.লি. দিতে হবে। এতে হৃৎপিন্ডের পেশী উত্তেজিত ও সতেজ হয়ে উঠে। এড্রিনালিন ইনজেকশন অবশ্যই চিকিৎসক নিজে দিবেন। হৃৎপিন্ডের কাজ বিঘ্ন হওয়ার লক্ষণঃ গলার দুই পাশে ক্যারোটিড পালস্ অনুভব করা যাবে না।

৯। যদি গায়ে ছোট ছোট চুলকানী ও শ্বাসকষ্ট দেখা যায় তাহলে ২৫ মি. প্রোমেথাজিন শিরার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে।

১০। যদি হাঁপানীর মত টান দেখা যায় তাহলে ২৫০ মি.গ্রা. এমাইনোফাইলিন ২৫% গ্লুকোজ এর সাথে মিশিয়ে ধীরে ধীরে শিরায় দিতে হবে।

পাঠ-২৭
অপারেশন পূর্ববর্তী যত্ন

১) ক্লায়েন্টকে শেভ করানো ঃ

গ্রহীতাকে ঠিক বাছাইকরণের পরে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা/কমিউনিটি প্যারামেডিক গ্রহীতাকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবেন। সেখানে গিয়ে কোন একজন আয়ার সাহায্য নিয়ে গ্রহীতাকে শরীরের যে জায়গায় অপারেশন করা হবে সেখানের পশম প্রয়োজনে কাঁচি দিয়ে ছোট করে ছেটে দিবেন। শেভিং করার প্রয়োজন নাই।

২) ক্লায়েন্টের গোসল করার ব্যবস্থা করুন ঃ

সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নতুন শাড়ী পরার আগে সাবান দিয়ে গোসল করা ভালো, গোসল করা সম্ভব না হলে শরীরের যে জায়গায় অপারেশন হবে সে জায়গা ভালোভাবে সাবান দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

৩) জীবাণুমুক্ত সার্জিক্যাল গাউন পরিয়ে নিন ঃ

বাংলাদেশে পুরুষ এবং মহিলা বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেন। গরু ছাগল পালন করেন। গোবর দিয়ে জ্বালানী তৈরী করেন তাতে তাদের শরীরে বা কাপড়ে ধনুষ্টংকার স্পোর থাকার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেজন্য অবশ্যই অপারেশনের আগে সরকারী সরবরাহকৃত জীবাণুমুক্ত সার্জিক্যাল গাউন পরিয়ে নিতে হবে।

৪) অপারেশনের ছয় ঘন্টা আগে থেকে গ্রহীতাকে কোন শক্ত খাবার দেয়া যাবে না এবং অপারেশনের পূর্বে ঔষধের সাথে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী তরল পানি জাতীয় খাবারও খাওয়া নিষেধ। যেন অপারেশনের সময়ে বমি না হয়। বমি হলে শ্বাস-প্রশ্বাস এর মারাত্মক অসুবিধা হতে পারে।

৫) গ্রহীতাকে প্রস্রাব করে আসতে বলুন ঃ

অপারেশনের সময়ে মূত্রথলি যদি পূর্ণ থাকে তাহলে আঘাত লাগতে পারে সেজন্য ঘুমের ঔষধ খাওয়ার আগে গ্রহীতাকে প্রস্রাব করে আসতে বলতে হবে।

৬) অপারেশনের ৪৫ মিনিট আগে গ্রহীতাকে ১০ মি. গ্রাম ডায়াজিপাম বড়ি খাওয়াতে হবে এবং শুইয়ে রাখতে হবে। এই সময় গ্রহীতাকে কোনক্রমেই বিরক্ত করা যাবে না (কোলের বাচ্চা, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের দ্বারা দেখাশুনা করতে হবে)। যদি ডায়াজিপাম খাওয়ার পর গ্রহীতা বাথরুমে যেতে চান তাহলে একজন কমিউনিটি প্যারামেডিক বা আয়া তাকে নিয়ে যাবেন। একা গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন।

৭) অপারেশনের পূর্বে ১৫ মিনিট পর পর গ্রহীতার রক্তচাপ, নাড়ির গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে "স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণেচ্ছুক ক্লায়েন্টদের পূর্ণ বিবরণী" ফরমে লিখতে হবে। ঘুমের ঔষধ এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না তা দেখবার জন্য।

৮) ঘুমের ঔষধ খাওয়ানোর ৪০ মিনিট পর গ্রহীতাকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যান। অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়ার পর প্যাথেডিন ২৫ মি.গ্রাম বা ইনজেকশন পেনটাজোসিন ৩০ মি. গ্রাম, এট্রোপিন ০.৪ মি. গ্রাম, প্রোমেথাজিন ১২.৫ মি. গ্রাম একটি সিরিঞ্জে নিয়ে (ককটেল করে) শিরার মধ্যে ধীরে ধীরে ইনজেকশন দিতে হবে।

অর্ধেক ইনজেকশন দেয়ার পর দু'মিনিট অপেক্ষা করতে হবে এবং লক্ষ্য করতে হবে যে রোগীর শ্বাস কষ্ট বা অন্য কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কি না।

বিঃ দ্রঃ যেসব রোগীর ওজন ৭৫ পাউন্ড (৩৪ কেজি) বা তার চেয়ে কম তাদের ক্ষেত্রে অর্ধেক ডোজ দিতে হবে।

অপারেশনের আগে গ্রহীতার খুব ভয় লাগতে পারে। তাকে সহানুভূতিসহ যত্ন করতে হবে। তাকে যথেষ্ট আশ্বস্ত করতে হবে।

পাঠ-২৮

স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের সময় ১ম এবং ২য় সাহায্যকারীর দায়িত্ব

অপারেশন চলাকালীন ডাক্তার সার্বিক দায়িত্বে থাকেন। দু'জন কমিউনিটি প্যারামেডিক তাকে সাহায্য করবেন। একজন (১ম সাহায্যকারী) জীবাণুমুক্ত গাউন গ্লাভস্ পরে অপারেশন কাজে সহায়তা করবেন। আর একজন (২য় সাহায্যকারী) গ্রহীতার গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নগুলো পরীক্ষা করবেন এবং অন্যান্য কাজ করবেন।

১ম সাহায্যকারীর দায়িত্ব ঃ

১) অস্ত্রোপচার কক্ষ, অস্ত্রোপচার সরঞ্জামাদি, জীবনরক্ষাকারী ঔষধ এবং ক্লায়েন্ট প্রস্তুত কি না এক নজরে দেখে নিন। জরুরী ঔষধপত্রের এবং জরুরী সরঞ্জামের তালিকা সংযুক্ত আছে কি না দেখুন।

২) জীবাণুমুক্ত টুপি, মাস্ক পরে চেকলিষ্ট অনুযায়ী হাত ধুয়ে ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত গাউন এবং গ্লাভস্ পরে নিন।

অটোক্লেভ করার আগে গাউন এমন ভাবে ভাজ করতে হয় যাতে গাউনের ভেতরের অংশ বাইরে থাকে এবং গাউনের উপরের অংশ সহজে ধরা যায়। লিফটারের সাহায্যে ড্রাম থেকে ২য় সাহায্যকারী গাউন তুলে নিবেন এবং ১ম সাহায্যকারীকে দিবেন।

শরীর থেকে দূরে রেখে ১ম সাহায্যকারী গাউনের উপর অংশ ধরে ঝাকি দিয়ে গাউন খুলবেন।

গাউনের সামনের দিক স্পর্শ না করে ১ম সাহায্যকারী তার হাত গাউনের হাতায় প্রবেশ করাবেন।

১ম সাহায্যকারী সামনে একটু ঝুকবেন যেন গাউনের সামনের ফিতাগুলো নিচের দিকে এবং তার শরীর থেকে দূরে থাকে।

২য় সাহায্যকারী ১ম সাহায্যকারীর শরীর/গাউন স্পর্শ না করে ফিতাগুলো ধরে নিবেন এবং পিছনে বাঁধবেন।

ছবি: অনুযায়ী গাউনের হাতার উপরে জীবাণুমুক্ত গ্লাভস পরতে হবে।

৩) টেবিল চেক করতে হবে যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি ধারাবাহিকভাবে আছে কি নাঃ

প্রয়োজনীয় সবকিছু আছে কি না তা দেখে নিতে হবে এবং অপারেশন করার সময় যেটা আগে ব্যবহার করা হবে সেটা টেবিলের ডান দিকে রেখে অন্যান্য যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখতে হবে।

৪) সিরিঞ্জে অবশ করা ঔষধ তুলে রাখুন ঃ

২য় সাহায্যকারী ভায়াল ভেঙ্গে খুলে ১ম সাহায্যকারীর জন্য ধরবেন। ঔষধ তোলার সময় সাবধান হোন যেন সুই ভায়ালের বাইরের গায়ে না লাগে। ১ম সাহায্যকারী অবশ্যই ভায়ালের গায়ে লেখা ঔষধের নাম দেখে ঔষধ তুলবেন।

৫) সুঁচে সুতা পরিয়ে এবং বি.পি হ্যান্ডেলে ব্লেড পরিয়ে রাখুন ঃ

যদি সূঁচে সুতা বা হ্যান্ডেলে ব্লেড পরানোর সময়ে গ্লাভসে ফুটা হয় তাহলে নতুন জীবাণুমুক্ত গ্লাভস পরতে হবে।

৬) অস্ত্রোপচার এর জায়গা এন্টিসেপটিক দ্রবণ দ্বারা পরিস্কার করুন ঃ

তুলার বল এবং ক্লোরহেক্সিডিন সেট্রিমাইড সল্যুশন দিয়ে স্পঞ্জ ফরসেপের সাহায্যে গ্রহীতার পেটের ও অপারেশনের জায়গাটি পরিস্কার করে নিতে হবে। গ্রহীতার পেট পরিস্কার করার পর স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপসহ ময়লা সোয়াব ময়লা রাখার বালতিতে ফেলে দিবেন।

৭) এ্যাবডোমিনাল সিট বিছিয়ে নিন ঃ

ডাক্তার এবং ১ম সাহায্যকারী এ্যাবডোমিনাল সিট সাবধানে বিছিয়ে দিবেন যেন ছিদ্র সরাসরি গ্রহীতার তলপেটের উপরে থাকে। সিটটা গ্রহীতার কাপড়ের উপরে টেনে বা টেবিলের গায়ে স্পর্শ করে বিছানো যাবে না, তাতে সিটের ছিদ্রস্থান বা সিটের উপরের স্তর দুষিত হতে পারে এবং সংক্রমণ হতে পারে।

৮) অস্ত্রোপচারকারীকে অস্ত্রোপচার চলাকালীন প্রতিটি পদক্ষেপে চাহিদা অনুপাতে সাহায্য করুন ঃ

যেমন- যন্ত্রপাতির মাথা ধরে হাতল সার্জনের হাতে দিয়ে দিন। সার্জনের কথা অনুযায়ী রিট্রাক্টর ধরে নিতে হয়।

৯) সেলাইয়ের পূর্বে যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি গুণে দেখুন ঠিক আছে কি না ঃ

যেন গ্রহীতার পেটে কিছু না থেকে যায়। তুলার বল ও মপ গুনে দেখুন।

১০) ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করুন।

১১) ক্লায়েন্টের কাপড় ঠিক করে দিন।

১২) নিজেকে এইডস এবং অন্যান্য রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ডিকন্টামিনেশন করুন।

১৩) ব্লিচ দ্রবণে হাত ডুবিয়ে গ্লাভস খুলে হাত ধুয়ে নিন।

১৪) অস্ত্রোপচারের শেষে যন্ত্রপাতি ব্রাশ দিয়ে পরিস্কার করে ধুয়ে নিন এবং পরবর্তী ক্লায়েন্টের অস্ত্রোপচারের জন্য অটোক্লেভ করুন। প্রত্যেক গ্রহীতার জন্য অটোক্লেভ করা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র সিদ্ধ করলে চলবে না।

২য় সাহায্যকারীর দায়িত্ব ঃ

১) জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি (অক্সিজেন, সাকার মেশিন, বিপি মেশিন ও জীবনরক্ষাকারী ঔষধ) প্রস্তুত কি না নিশ্চিত করুন।

২) অস্ত্রোপচারকারীকে এবং অস্ত্রোপচারে সাহায্যকারীকে হাত ধোয়া, গাউন ও গ্লাভস পরার কাজে সাহায্য করুন। ২য় সাহায্যকারী সাবধানে কাজ করবেন যেন জীবাণুমুক্ত যন্ত্র, লিনেন, গাউন তার স্পর্শে দুষিত না হয়।

৩) ক্লায়েন্টকে টেবিলে শুইয়ে দিন। গ্রহীতা প্রস্রাব করে এসেছে কি না নিশ্চিত হোন।

৪) ক্লায়েন্টের অপারেশনের জায়গা পরিস্কার করার জন্য সাহায্যকারীকে এন্টিসেপটিক দ্রবণ ঢেলে দিন।

৫) ক্লায়েন্টকে নিয়ম অনুযায়ী অপারেশন চলাকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নগুলো পরীক্ষা করুন এবং মনিটরিং ফর্মে লিপিবদ্ধ করুনঃ

অপারেশনের সময় ৫ মিনিট পর পর রক্তচাপ, নাড়ীর গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহনেচ্ছুক ক্লায়েন্টদের পূর্ণ বিবরণী ফর্মে লিখতে হবে।

৬) কোন অসুবিধা দেখা দিলে অস্ত্রোপচারকারীকে সঙ্গে সঙ্গে জানান। যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে জানাতে হবে। দেরি করলে গ্রহীতা মারা যেতে পারেন।

৭) জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন। যতবেশী অপারেশনের কাজে অংশগ্রহণ করেন না কেন কখন একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটবে কেউ কিছু বলতে পারেন না। সর্বদা প্রস্তুত এবং সতর্ক থাকতে হবে। দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

৮) অস্ত্রোপচার শেখ হলে ক্লায়েন্টের কাপড় ঠিক করে বিছানায় দিন। গ্রহীতার ঘুম ঘুম ভাব থাকলেও গ্রহীতাকে বলবেন যে অপারেশন শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি ভাল আছেন।

৯) সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত ক্লায়েন্টের অর্থ, ঔষধ, শাড়ী/লুঙ্গি প্রদানের রেজিষ্টার পূরণ করুন। তাছাড়া অসমাপ্ত অস্ত্রোপচার অথবা কোন জটিলতা দেখা দিলে ডাক্তারকে দিয়ে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টার পূরণ করিয়ে রাখুন। নমুনা সংযুক্ত আছে।

পাঠ-২৯

কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস এবং কার্ডিয়াক ম্যাসেজ) বা হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস পুনরুজ্জীবিতকরণ

কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস এবং কার্ডিয়াক ম্যাসেজ বলতে কি বুঝায়?

যে কোন কারণে ক্লায়েন্টের নাড়ী না পাওয়া গেলে অথবা শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হলে কৃত্রিম উপায়ে পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস এবং কার্ডিয়াক ম্যাসেজ অথবা কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন বলা হয়।

হৃদপিন্ড ও শ্বাসতন্ত্রসমূহ পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে জরুরী চিকিৎসা পদ্ধতির দুটো অংশ আছে। সেগুলো হলোঃ

১) মৌলিক জীবনের নির্ভরশীলতা (বেসিক লাইফসাপোর্ট) ঃ মৌলিক জীবনের নির্ভরশীলতা বলতে জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসার সে প্রক্রিয়াকেই বোঝায় যার মাধ্যমে প্রথম সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয় ঃ যেমন- শ্বাসনালীতে বাধা, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া ও হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় ঃ যতক্ষণ না আক্রান্ত ব্যক্তি যথেষ্ট সুস্থ্ হচ্ছেন বা যতক্ষণ জীবন রক্ষাকল্পে উন্নত সরঞ্জামাদি তার জন্য সংগৃহীত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে সঠিকভাবে সিপিআর বা কার্ডিওপালমোনারী রিসাসিটেশন প্রক্রিয়া প্রদান করা।

২) মৌল পরবর্তী জীবনের নির্ভরশীলতা (এডভান্স লাইফ সাপোর্ট) ঃ এ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট বলতে বেসিক লাইফ সাপোর্ট এবং সেই সঙ্গে বিশেষ সরঞ্জামাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও ঔষধের ব্যবহারের সাহায্যে তাকে স্থিতিশীল বা সুস্থ্ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা বোঝায়। বাংলাদেশে যেখানে স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশন করা হয় সেখানে সাধারণতঃ মৌলিক জীবনের নির্ভরশীলতার ব্যবস্থা করা যায়।

হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস পুনরুজ্জীবিতকরণ ঃ

যে কোন কারণে ক্লায়েন্টের নাড়ী পাওয়া না গেলে অথবা শ্বাস বন্ধ হলে সাথে সাথে সিপিআর শুরু করা দরকার। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার পর যদি মিনিট দু'য়েকের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্ত চলাচল ঠিকমত না হয় তবে স্থায়ী ও জটিল অনেক শারীরিক ক্ষতি হতে পারে।

ইংরেজী বর্ণমালায় প্রথম তিনটি অক্ষর এ বি সি মনে রাখলে সিপিআর এর মূল করণীয় বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হবে।

যেমন-

এ = এয়ারওয়ে বা শ্বাসনালী

বি = ব্রিদিং বা শ্বাস-প্রশ্বাস

সি = সার্কুলেশন বা রক্ত চলাচল

শ্বাসনালী ঃ

ক্লায়েন্টের শ্বাসনালী যাতে পরিস্কার থাকে এবং সহজে বায়ু চলাচল করে ও শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ক্লায়েন্টকে সমতল জায়গায় শোয়াতে হবে। জিহ্বা উল্টে যদি শ্বাসনালী আটকে দেয় সে অবস্থায় জিহ্বা সরাবার তিনটি উপায় আছে। যেমন-

১) মাথা পেছনে টেনে গলা সোজা করে রাখা

২) চোয়াল সামনে ঠেলে দেয়া এবং

৩) থুতনি ধরে টান দেয়া।

গলার ভিতর বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এর পথে শ্লেষ্মা, বমি প্রভৃতি থাকলে গজ বা একটুকরা শুকনা কাপড় দিয়ে সে সব মুছে পরিস্কার করে দিতে হবে। কোন শক্ত দলা (ফরেন বডি) আটকে থাকলে মেরুদন্ডের পেছনের দিকে ধীরে ধীরে চাপড়ে দিলে তা বের হয়ে আসবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

আক্রান্ত ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এজন্য তার মাথার উপর ঝুঁকে তার মুখ ও নাকের এক ইঞ্চির মধ্যে কান রেখে তার বুকের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এভাবে যদি শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ কানে শোনা না যায় এবং বুকের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে দেখা যায় রোগী শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ নিচ্ছে না তবে এয়ারওয়ে টিউব ঢুকিয়ে এ্যাম্বুব্যাগ এর সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হয়। ব্যাগটির একপ্রান্ত অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাথে সংযুক্ত করে নিয়ে বাতাসে অক্সিজেন এর পরিমাণ বাড়ানো যায়। রোগীকে আইভি ন্যালোকসন দিতে হবে এবং এর পরপরই আই ভি সোডিয়াম বাই কার্বোনেট দিতে হবে। এ্যাম্বুব্যাগ না থাকলে প্রথমে ৪টি দ্রুত পরিপূর্ণ ফুঁ (ফুল ব্রেথ) দিতে হবে। একে বলা হয় দ্রুত পদক্ষেপ বা কুইকষ্টেপ। রোগীর মাথাটিকে সঠিক অবস্থায় রেখে বাতাস যাতে বের হতে না পারে এমনভাবে নাক চেপে ধরে তারপর গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করে এবং বড় করে হা করে রোগীর মুখের উপর নিজের মুখ রেখে মুখ চেপে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমে ঘন ঘন ৪টি বড় ফুঁ দিতে হবে। দুই ফুঁয়ের মাঝখানে যেন এমন সময় না থাকে যাতে ফুসফুসের স্ফীতি হ্রাস পেতে পারে। একটি ফুয়ের সঙ্গে সঙ্গে অপর ফুঁটি দিতে হবে। এতে করে ফুস ফুস পরিপূর্ণভাবে প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় দ্রুততার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন দিতে হবে। একে মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং বলা হয়।

রক্ত সঞ্চালন ঃ

শ্বাস প্রশ্বাসের অবস্থা নির্ণয়ের সাথে সাথে পালস বা নাড়ীর অবস্থাও নির্ণয় করতে হবে। কেরোটিড পালস না পেলে এক্সটার্নাল কার্ডিয়াক ম্যাসাজ শুরু করতে হবে।

চেষ্ট কমপ্রেসন দিতে হলে ডান হাত দিয়ে জিফিস্টারনাম খুঁজে বের করে জিফয়েডের নিচু প্রান্ত থেকে উপরের দিকে তিন সেন্টিমিটার (১-১.৫ ইঞ্চি) মাপতে হবে। (দু আঙ্গুলের সমান, আঙ্গুলগুলো ছোট হলে তিন আঙ্গুল দিয়ে মাপতে হবে)।

এক হাতের দু আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুল এর পাশে ষ্টারনাম এর ঠিক উপরে অন্য হাতের গোড়ালী রেখে তার উপর প্রথম হাতের গোড়ালী রাখতে হবে। ভুলে যদি জিফয়েডে ধাক্কা লাগে, তাহলে এটি বেঁকে যেতে পারে এবং তাতে যকৃত আঘাত লাগতে পারে। ষ্টারনাম এর নিচের অংশের উপর চাপ প্রয়োগ করাই শ্রেয়। আঙ্গুলগুলোকে লেসিং পদ্ধতিতে রেখে অথবা উপরের দিকে তুলে রেখে আক্রান্ত ব্যক্তির বুক থেকে সরিয়ে রাখা যায়।

আঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগ করলে বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যেতে পারে। অনেকে তাদের আঙ্গুলগুলো একত্রে লেসিং করে বুক থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, আবার কেউ কেউ তা পারে না। যে পদ্ধতি সুবিধাজনক মনে হয় সে পদ্ধতি বেছে নিতে হবে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের বুকের কমপক্ষে ৪ সে.মি. পর্যন্ত চাপ প্রয়োগ করতে হবে। খুব স্বাচ্ছন্দভাবে চাপ দিতে হবে। ঝাঁকুনি দেয়া যাবে না। চাপ প্রয়োগের মাঝে হাত দুটোকে আলতো করে রোগীর বুকের উপর রেখে বিশ্রাম নিতে হবে। ইন্ট্রাকার্ডিয়াক এডরিনালিন এবং প্রয়োজনে ১০ মি.লি ১০% ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট আইভি দিতে হবে। যখন একজন রেসকিউয়ার সিপিআর দিবে, তখন প্রতি মিনিটে ৮০ টি চাপ দেবার মত গতিতে পর পর ১৫ টি চাপ দিয়ে তারপর না থেমে দ্রুত পদক্ষেপে আম্বুব্যাগ দ্বারা দুটো পূর্ণ ফুঁ দিতে হবে।

যখন দু'জন রেসকিউয়ার সিপিআর দিবে, তখন একজন প্রতি মিনিটে ৬০টি চাপ দেয়ার মত সুষম গতিতে চাপ প্রয়োগ করে যাবে। এবারের চাপের গতি হবে আগেরটির চেয়ে মন্থর। অন্য আর একজন প্রতি পাঁচটি চাপের পর আম্পুব্যাগ দ্বারা ফুঁ দিতে থাকবে। আম্বুব্যাগ না থাকলে মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ উল্লেখ্য, উক্ত পদক্ষেপসমূহ ডাক্তার দ্বারা সম্পন্ন করা উত্তম।

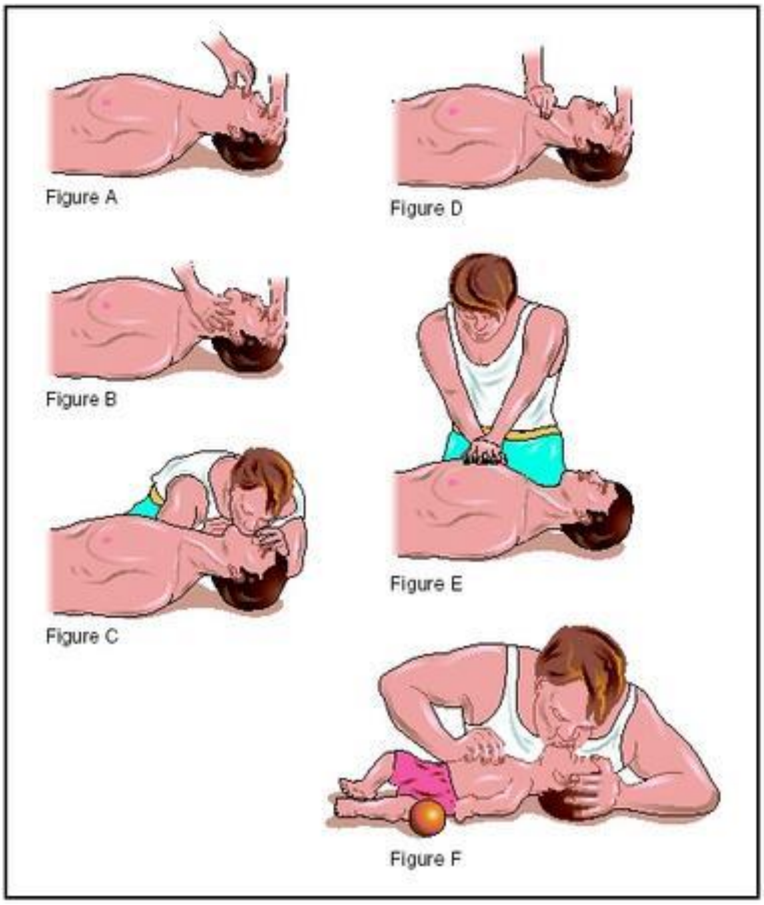

চিত্র : কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন

বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ

১) কতক্ষণ সময় ধরে ক্লায়েন্টের শ্বাস বন্ধ, সে হিসাব করতে না বসে অতি দ্রুততার সাথে সিপিআর শুরু করা উচিত।

২) সিপিআর করার সময় ক্লায়েন্টকে শক্ত ও সমান জায়গায় চিৎ করে শোয়াতে হবে।

৩) ক্লায়েন্টের পাশে হাঁটু গেঁড়ে সিপিআর দিতে হবে।

৪) নাড়ী যদি খুব দুর্বল গতিতে চলে তবে কোনক্রমে হৃৎপিন্ড চাপ দেয়া যাবে না। নাড়ী বন্ধ থাকলে কেবল হৃৎপিন্ডে চাপ দিন।

৫) কমপ্রেসার এর সময় ৫ সেকেন্ড এর বেশী বিরতি দেয়া উচিত নয়।

৬) চাপ দিলে যেন ষ্টারনাম দেড় থেকে দুই ইঞ্চি পরিমাণ ডেবে যায়। কখনো পুরো শক্তি দিয়ে চাপ দিবেন না।

৭) চাপ দেয়ার সাথে শ্বাস-প্রশ্বাস এর অনুপাত এবং ছন্দ বজায় রাখতে হবে।

৮) চাপ দেবার সময় জোর বা শক্তি কনুই থেকে না এনে আপনার কোমর থেকে দিন।

৯) সিপিআর এর প্রতি ৪-৫ মিনিট পর পাঁচ সেকেন্ড ফাঁকে ক্যারোটিড পালস এবং শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কি না দেখতে হবে।

১০) হৃৎপিন্ডে চাপ দেবার সময় ঝাঁকুনি দিবেন না।

১১) জীবিত মানুষের উপর কখনও সিপিআর চালিয়ে হাত পাকানোর চেষ্টা করবেন না। সিপিআর কৃত্রিম মানব মুর্তিতে অনুশীলন করতে হয়।

১২) প্রয়োজনে আম্বুব্যাগ এর মাধ্যমে অক্সিজেন দেয়া যাবে।

পাঠ-৩০
ইমপ্ল্যান্ট

ইমপ্ল্যান্ট কি ? ইমপ্ল্যান্ট পর্যায়ক্রমিক উদ্ভাবন ইতিহাস এবং ইমপ্ল্যান্ট কিভাবে কাজ করে ঃ

ইমপ্ল্যান্ট একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অত্যন্ত কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি। এক সেট নরপ্যান্টে ২টি কাঠি (প্রায় দিয়াশলাই-এর কাঠির সমান) নরম ও চিকন ক্যাপসুল থাকে, যা একজন মহিলার বাহুর ভিতর দিকে, কনুইয়ের ভাঁজ থেকে ৮ সেন্টিমিটার উপরে ঠিক চামড়ার নিচে স্থাপন করা হয়। ক্যাপসুলের ভিতরে লেভোনরজেষ্টেল, নামক এক রকম কৃত্রিম প্রজেষ্টেরন থাকে, যা গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে। স্থাপনের পর পর ক্যাপসুলের ভেতর থেকে অল্প মাত্রায় এই হরমোন নিঃসৃত হতে শুরু করে। ২৪ ঘন্টা পর থেকেই পূর্ণমাত্রায় গর্ভনিরোধ করে। ইমপ্ল্যান্ট খুলে ফেলার পরই মহিলারা আবার স্বাভাবিক গর্ভধারণ করতে পারেন।

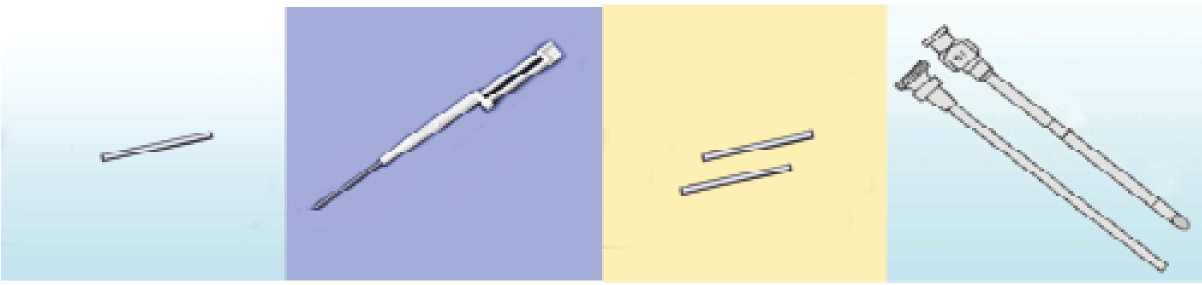

চিত্র ঃ ইমপ্ল্যান্ট

ইমপ্ল্যান্ট কিভাবে কাজ করে ?

ইমপ্ল্যান্ট মূলত তিনভাবে গর্ভনিরোধ করে :

- জরায়ুর মুখের (Cervix) শ্লেষ্মা ঘন করে, যার ফলে শুক্রকীট সহজে জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।
- ডিম্বাস্ফুটন (Ovulation) বন্ধ করে (৫০% ক্ষেত্রে)। কোন মাসিক চক্রে ডিম্বস্ফুটন হলেও ডিম্বস্ফুটন পরবর্তী পর্যায়ে ডিম্বাশয় থেকে প্রাকৃতিক প্রজেষ্টেরন তৈরী কমিয়ে দেয়।
- জরায়ুর ঝিল্লির (Endometrium) বৃদ্ধি মন্থর করে (Hypoplasia) ফলে নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুতে গ্রথীত হবার মত কোন পরিবেশ পায় না বা গ্রথীত হতে পারে না।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে ইমপ্ল্যান্ট জরায়ুর ভিতরে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের মাত্রায় পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে শুক্রকীট জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছালেও ফার্টিলাইজেশন হয় না।

পাঠ-৩১

ইমপ্ল্যান্ট এর কার্যকারিতা এবং ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

ইমপ্ল্যান্টের কার্যকারিতা

ইমপ্ল্যান্ট একটি অত্যন্ত কার্যকরী অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এর কার্যকারিতা পাঁচ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। ইমপ্ল্যন্ট ব্যবহারকারীগণের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বছর একশ জন মহিলার মধ্যে যথাক্রমে ০.১ এবং ১.৬ জন মহিলা গর্ভধারণ করেন। গর্ভধারণের এই হার স্থায়ী পদ্ধতির কার্যকারিতার হারের সমান। দ্বিতীয় বছরের পর থেকে গড় বাৎসরিক গর্ভধারণের হার সামান্য বাড়তে থাকে এবং পঞ্চম বছরে গর্ভধারণের শতকরা হার ২.৪ এ গিয়ে দাঁড়ায়। নিচের সারণিতে ব্যবহারের প্রথম বছর ইমপ্ল্যান্ট ও অন্যান্য পদ্ধতিসমূহের অকার্যকারিতার হার (Typical Failure Rate) এর একটি বিশ্লেষণ দেয়া হল।

অকার্যকারিতার হার

প্রথম বছর ব্যবহারকালীন ইমপ্ল্যান্ট ও অন্যান্য পদ্ধতির অকার্যকারিতার হার-

পদ্ধতির নাম	অকার্যকারিতার হার
ইমপ্ল্যান্ট	০.১
পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি	০.১৫
মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি	০.৫
খাবার বড়ি	৩.০
আই ইউ ডি	
কপার-টি ৩৮০এ	০.৮
কপার-টি ২০০বি	০.৬
পুরুষদের কনডম	১৪.০
বিরতি (Abstinence)	২.৫
প্রত্যাহার/আযল (Withdrawal)	১৯.০
কোন পদ্ধতি ব্যবহার না করে	৮৫.০

শারীরিক ওজনের সাথে ইমপ্ল্যান্টের কার্যকারিতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণের সময় যে সব গ্রহীতার ওজন ৭০ কেজি বা তার উর্ধ্বে তাদের ক্ষেত্রে ইমপ্ল্যান্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান LEIRAS ইমপ্ল্যান্ট প্রস্তুতিতে নতুন টিউবিং ব্যবহার করছে, যা আগের টিউবিং এর চাইতে নরম। এর ফলে ৭০ কেজির বেশী ওজনের মহিলারাও ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করতে পারেন। পদ্ধতিটি খুলে ফেলার পর গ্রহীতা আবার তার স্বাভাবিক গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে পান। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইমপ্ল্যান্ট খুলে নেয়ার পর ৫০ শতাংশ মহিলা প্রথম তিন মাসের মধ্যে, ৮৬ শতাংশ এক বছরের মধ্যে এবং ৯৩ শতাংশ দুই বছরের মধ্যে পুনরায় গর্ভধারণে সক্ষম হয়েছেন।

ইমপ্ল্যান্টের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ঃ

সুবিধা

- যারা এস্ট্রোজেন সমৃদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন না,তাদের জন্য এটি একটি উপযোগী পদ্ধতি।
- অত্যন্ত কার্যকরী-পরিবার পরিকল্পনার সবগুলো অস্থায়ী পদ্ধতির মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট অধিকতর কার্যকর।
- সহজ ব্যবহার বিধি-একবার ইমপ্ল্যান্ট লাগানোর পর গ্রহীতাকে নির্ধারিত সময়ে ক্লিনিকে এসে দেখানো (ফলোআপ) ছাড়া কিছুই করতে হয় না।
- একটানা গর্ভনিরোধ-ক্যাপসুলগুলো স্থাপনের ২৪ ঘন্টা পর থেকেই এর গর্ভনিরোধক কাজ শুরু হয়। এক সেট ইমপ্ল্যান্ট ক্রমাগত ৫ বছরের জন্য গর্ভ সঞ্চার প্রতিরোধ করে। যদি আরো দীর্ঘদিন জন্ম প্রতিরোধ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে এক সেট খোলার পর আর এক সেট লাগিয়ে নেয়া যায়।
- সুবিধাজনক-ইমপ্ল্যান্ট দৈনন্দিন কাজকর্মে, বিশেষ করে ভারী কিছু তোলা বা বহনে অসুবিধা করে না। সহবাস আকাঙ্খা বা যৌনমিলনেও কোন অসুবিধা করে না।
- প্রয়োজনে যে কোন সময়ে খোলার সুবিধা যদি গ্রহীতা ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করতে না চান বা পুনরায় সন্তান নিতে চান তাহলে যে ক্লিনিকে এটা লাগিয়েছেন সেখান থেকে বা যে ক্লিনিকে ইমপ্ল্যান্ট লাগানো ও খোলা হয় সেখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সাহায্যে ইমপ্ল্যান্ট খুলে নিতে পারেন। ইমপ্ল্যান্ট খুলে নেয়ার পরপরই গ্রহীতা শরীরে লেভোনরজেষ্টেলেতর পরিমাণ কমে আসতে থাকে। সাধারণঃ ইমপ্ল্যান্ট খোলার পর পরই গ্রহীতার স্বাভাবিক গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে আসে।
- চামড়ার নিচে ইমপ্ল্যান্ট ক্যাপসুল সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি বা দেখা যায়, তাও রংবিহীন শিরার মত দেখায়। কখনও কখনও একটা দাগ দেখা দিতে পারে তবে তা ৩/4 মিলিমিটারের চেয়ে বড় হয় না। আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে ক্যাপসুল অনুভব করা যায়।
- পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সীমিত।

অসুবিধা

- প্রদানকারীর উপর নির্ভরশীল (Provider Dependant) ইমপ্ল্যান্ট নিজে নিজে ব্যবহার করা যায় না। লাগানো এবং খোলার জন্য সেবাদান কেন্দ্রে যেতে হয়। গ্রহীতা ইচ্ছে করলে নিজে খুলতে পারবেন না।
- লাগানো এবং খোলার জন্য ছোট অপারেশনের প্রয়োজন হয় যার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবা প্রদানকারীর প্রয়োজন।
- অন্যান্য ছোট খাটো অপারেশনের মত কিছু সমস্যা যেমন- সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ বা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। তবে এসব সমস্যা সহজেই নিরাময়যোগ্য।
- চামড়ার নিচে ক্যাপসুলগুলি দৃষ্টি গোচর হতে পারে।
- যৌনবাহিত রোগ এবং এইচআইভি/এইডস নিরোধে কোন ভূমিকা রাখে না।
- মাসিকের অনিয়ম যেমন- বেশী সময় ধরে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ বা মাসিক বন্ধ থাকা।
- স্তন ভারী লাগা।
- সামান্য কিছু অবসাদ অনুভব হতে পারে।
- খুলতে অসুবিধা।
- প্রজেস্টেরন হরমোন সংবেদনশীল এমন মহিলা এটি ব্যবহার করতে পারবেন না।

পাঠ-৩২
ইমপ্ল্যান্ট বিষয়ক কাউন্সেলিং এবং গ্রহীতা বাছাইকরণ

কাউন্সেলিং

- সহজ ভাষায় গ্রহীতাকে ইমপ্ল্যান্ট সম্পর্কে সঠিক এবং বিস্তারিত তথ্য প্রদান।
- পদ্ধতিটি সম্পর্কে গ্রহীতার কোন ভয়-ভীতি থাকলে তার উপর বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সেই ভয়-ভীতি দূর করা এবং সঠিক পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করা।
- অন্যান্য পদ্ধতিসহ ইমপ্ল্যান্টের কার্যকারিতা, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়ে বলা এবং লিখিত সম্মতি নেয়া।
- ফলোআপের প্রয়োজনীয়তা এবং ফলোআপ শিডিউল সম্পর্কে গ্রহীতাকে অবহিত করা।
- পদ্ধতিজনিত যে কোন অসুবিধায় ক্লিনিকে সেবা গ্রহণে সুযোগ সম্পর্কে গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করা।

যে সব বিষয় মনে রাখতে হবে

১) ইমপ্ল্যান্টের অন্যান্য যে সব পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পাওয়া যায় তাদের সবগুলোর বিস্তারিত তথ্য বিশেষ করে সুবিধা ও অসুবিধা গ্রহীতাদের জানাতে হবে।

২) ইমপ্ল্যান্টের বিস্তারিত তথ্য ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং গ্রহীতা তা বুঝলো কি না তা নিশ্চিত হতে হবে।

৩) গ্রহীতার প্রয়োজন ও সংশয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

৪) গ্রহীতার প্রয়োজন, সংশয় ও ভীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে এবং গ্রহীতাকে প্রশ্ন করে উৎসাহিত করতে হবে।

৫) ইমপ্ল্যান্ট লাগানো ও খোলার পদ্ধতি, কিভাবে ক্ষতস্থানের যত্ন নিতে হবে এবং এটা লাগানোর পর কি কি অসুবিধা হতে পারে তা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৬) গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তিনি যে কোন প্রয়োজনে এবং যে কোন কারণে যে কোন সময় ইমপ্ল্যান্ট খুলে নিতে পারবেন।

৭) ইমপ্ল্যান্ট কাউন্সেলিং এর সময় ইমপ্ল্যান্টের নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ গ্রহীতাকে বিশেষভাবে অবহিত করতে হবে-

- পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকরী।
- এর ব্যবহার খুব সহজ।

- পাঁচ বছরের জন্য গর্ভরোধ করে।
- এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা।
- এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম।

গ্রহীতা বাছাইকরণ

ইমপ্ল্যান্ট প্রায় সব মহিলার জন্য প্রযোজ্য হলেও প্রত্যেক মহিলাই ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত নন। গ্রহীতা বাছাইয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল গ্রহীতা ঐ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কি না, কোন বিধি নিষেধ আছে কি না এবং কোন বিশেষ সমস্যা থাকার জন্য আরো কোন পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি না ইত্যাদি।

ইমপ্ল্যান্ট গ্রহীতা বাছাইয়ের জন্য সেবা প্রদানকারীদের করণীয় হচ্ছে-

- গ্রহীতাকে ইমপ্ল্যান্ট প্রদানে কোন বিধি নিষেধ আছে কি না তা চিহ্নিত করা।
- গ্রহীতার ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষা।
- গ্রহীতাকে ইমপ্ল্যান্ট এবং তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কাউন্সেলিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করা। কিভাবে ইমপ্ল্যান্ট প্রদান করা হবে তা জানানো।

ইমপ্ল্যান্টের গ্রহীতা বা বাছাইয়ের সময় যেসব তথ্য জানতে হবে সেগুলো হচ্ছে-

- গ্রহীতা গর্ভবতী কি না।
- গ্রহীতার জন্ডিস বা লিভারের অসুখ আছে কি না।
- অজানা কারণে রক্তস্রাব আছে কি না।
- স্তনের টিউমার বা ক্যান্সার আছে কি না।

উপরের সমস্যাগুলো থাকলে ইমপ্ল্যান্ট প্রদান করা যাবে না। এছাড়াও কিছু কিছু সমস্যা আছে যা থাকলে সতর্কতার সাথে ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করতে হবে বা আরও ঘন ঘন ফলোআপের প্রয়োজন হতে পারে যেমন-

- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- মাইগ্রেন
- মৃগী
- যক্ষ্মা
- মানসিক অবসাদ

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের উপযুক্ত গ্রহীতা কারা

যে সব বিবাহিত মহিলা আপাততঃ সন্তান চান না তাদের বেশীর ভাগই ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করতে পারেন। ইমপ্ল্যান্টের জন্য বিশেষত তারাই উপযোগী যারা-

- বিবাহিত এবং কমপক্ষে ১টি জীবিত সন্তানের মা।
- দীর্ঘদিনের জন্য জন্মবিরতি চান।
- বিভিন্ন কারণবশতঃ আইইউডি বা খাবার বড়ি গ্রহণ করতে পারেন না।
- এমন পদ্ধতি পছন্দ করেন যা রোজ রোজ মনে করে খেতে হয় না বা সহবাসের সময় ব্যবহার করার ঝামেলা থাকে না, অথচ অত্যন্ত কার্যকর অস্থায়ী পদ্ধতি।
- স্থায়ী পদ্ধতি চান কিন্তু সন্তানের সংখ্যা এবং বয়সের জন্য স্থায়ী পদ্ধতির নীতি অনুযায়ী স্থায়ী পদ্ধতির জন্য বিবেচিত নন।
- এস্ট্রোজেন জাতীয় গর্ভনিরোধক ব্যবহার করতে পারেন না।
- বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান।

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের অনুপযুক্ত গ্রহীতা

যে সকল ক্ষেত্রে ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করা যাবে না-

- বর্তমানে গর্ভবতী অথবা গর্ভবতী বলে সন্দেহ।
- কোন কারণ ছাড়াই অস্বাভাবিক রক্তস্রাব।
- স্তনে ক্যান্সার।
- লিভারের অসুখ বা এক বৎসরের মধ্যে জন্ডিসের ইতিহাস থাকলে।
- হৃদরোগ অথবা স্ট্রোক।

এছাড়া যদি গ্রহীতা মৃগী রোগ বা যক্ষ্মার জন্য চিকিৎসাধীন থাকে তাহলে ইমপ্ল্যান্ট দেয়া যাবে না কারণ এই সব রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধ এর সাথে ইমপ্ল্যান্ট এর প্রতিক্রিয়ার ফলে কার্যকারিতা কমে যায়।

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারে সাবধানতা

- ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের আগে ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের জন্য কোন অনুপযুক্ততা বা প্রতিকুল অবস্থা আছে কি না তা দেখে নিতে হবে যেমন-

- অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ (≤ ১৪০/৯০ মিলিমিটার মারকারী)

- ইমপ্ল্যান্ট গ্রহীতার তলপেটে যদি ব্যথা থাকে এবং এর সাথে অনিয়মিত মাসিকের ইতিহাস থাকলে ইমপ্ল্যান্ট দেয়ার আগে সব ধরনের পরীক্ষা করিয়ে নেয়া উচিত।
- যদি স্থাপনের স্থানে অনেকদিন স্থায়ী প্রদাহ হয় অথবা ক্যাপসুলগুলো বার বার খুলে আসে তাহলে সবগুলো ক্যাপসুল খুলে যথোপযুক্ত চিকিৎসা দিতে হবে।

পাঠ-৩৩
ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন

ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি প্যারামেডিক এর সাহায্যে ইমপ্ল্যান্ট খোলা যেতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যেই ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন করতে পারেন। সঠিকভাবে স্থাপন করা হলে ইমপ্ল্যান্ট সহজেই খোলা যায়।

ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের উপযুক্ত সময়

- মাসিক চলাকালীন প্রথম ৭ দিনের মধ্যে।
- যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে গ্রহীতা গর্ভধারণ করেননি তবে মাসিক চক্রের অন্য যে কোন সময়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় যে গ্রহীতা গর্ভবতী নন :

- যদি গ্রহীতা স্বামী সহবাস না করে থাকেন।
- যদি গ্রহীতা ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।
- যদি প্রসবের পর ৬ মাস উত্তীর্ণ না হয়ে থাকে, গ্রহীতা বাচ্চাকে পুরোপুরি বুকের দুধ খাওয়ান এবং মাসিক চক্র ফিরে না আসে।

- গর্ভের পর।
- এমআর (MR) করার পর
- যদি গ্রহীতা বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়ান তাহলে প্রসবের পরপরই বা ৬ সপ্তাহের মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট দেয়া যেতে পারে।
- যদি গ্রহীতা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাহলে প্রসবের ৬ সপ্তাহ পর ইমপ্ল্যান্ট দেয়া যেতে পারে।

গ্রহীতাদের প্রতি নির্দশাবলী

- ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের জায়গাকে কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা শুকনা এবং পরিস্কার রাখতে হবে। গোসল করার সময় বা কাপড় কাচার সময় ভিজে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে।
- কয়েকদিন জায়গাটিতে লালচে, ফুলা বা ব্যথা ভাব হতে পারে। এটিই স্বাভাবিক।
- সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক কাজ কর্ম শুরু করা যাবে। কিন্তু জায়গাটিতে অস্বাভাবিক চাপ প্রয়োগ করা এড়াতে হবে।

- গজ প্রেসার ব্যান্ডেজটিকে ২৪ ঘন্টা এবং ব্যান্ড এইড বা সার্জিক্যাল টেপকে ক্ষতস্থান না শুকানো পর্যন্ত রাখতে হবে (সাধারণত: ৫/৭ দিন)।
- ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার পর জায়গাটি স্পর্শ করা যাবে এবং স্বাভাবিক চাপ দিয়ে পরিস্কার করা যাবে।
- যদি সংক্রমণের চিহ্ন দেখা যায় যেমন জ্বর, ফুলে যাওয়া, লালচে এবং গরম হওয়া, অথবা যদি কয়েকদিন একটানা বেশী ব্যথা থাকে তাহলে ক্লিনিকে আসতে হবে।

১০০ (একশত) জন মহিলার ইমপ্ল্যান্ট ইনসারশন অথবা রিমুভ করার জন্য প্রয়োজনীয় এম এস আর তালিকা

ক্রমিক নং	দ্রব্যাদির নাম	একক	১০০ কেসের জন্য প্রয়োজন
১)	ইনজেকশন জাইলোকেন ১%/ লিগানোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ১%, ৫০ মি:লি:	ভায়াল	১৫
২)	সার্জিকেল ব্লেড	পিস	১১০
৩)	ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ (৫ সি:সি:)	পিস	১১০
৪)	গজ থান (২০ গজ)	থান	০২
৫)	শোষণ তুলা (১০০ গ্রাম)	রোল	১০
৬)	ইলাসটোমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ড্রেসিং (২” X ৪”)	পিস	১১০
৭)	রাবার গ্লাভস ৬.৫” (ষ্টেরাইল)	জোড়া	২৩০
৮)	রাবার গ্লাভস ৭” (ষ্টেরাইল)	জোড়া	১১৫
৯)	ইউরিষ্টিক (গ্লুকোজ/ প্রোটিন পরীক্ষার জন্য)	পিস	১০০
১০)	পভিডন আয়োডিন দ্রবণ ১০০ মি: লি:	বোতল	১৬
১১)	ট্যাবলেট প্যারাসিটামল ৫০০ মি:গ্রা:	ট্যাবলেট	১১৫০
১২)	এন্টিবায়োটিক ট্যাবলেট/ক্যাপসুল	ট্যাবলেট/কাপসুল	২১০/৩১৫

১০০ (একশত) জন মহিলার ইমপ্ল্যান্ট ইনসারশন অথবা রিমুভ করার ক্ষেত্রে ১৫% জটিলতা/ফলো আপের জন্য প্রয়োজনীয় এম এস আর এর তালিকা

ক্রমিক নং	দ্রব্যাদির নাম	একক	১৫% জটিলতা/ ফলো আপের জন্য প্রয়োজন
১)	গজ থান (২০ গজ)	থান	১
২)	তুলা (১০০ গ্রাম)	রোল	১
৩)	ইলাসটোমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ড্রেসিং (২” X ৪”)	পিস	১৫
৪)	রাবার গ্লাভস ৭” (ষ্টেরাইল)	জোড়া	১৫
৫)	ক্লোরোহেক্সিডিন, সেট্রিমাইড দ্রবণ (১ লিটার)	বোতল	১
৬)	পোভিডন আয়োডিন দ্রবণ ১০০ মিঃলিঃ	বোতল	২
৭)	ক্যাপসুল এ্যামক্সিসিলিন (৫০০ মিঃগ্রাঃ)	ক্যাপসুল	৩১৫
৮)	ট্যাবলেট প্যারাসিটামল, ৫০০ মিঃগ্রাঃ	ট্যাবলেট	১৫০

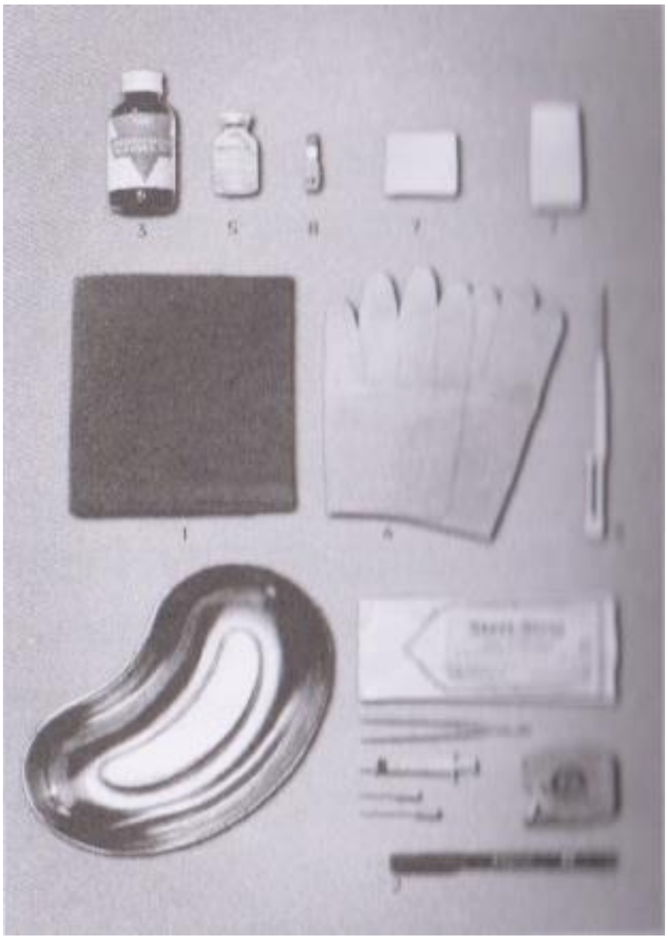

ছবি : ইমপ্ল্যান্ট প্রয়োগের প্রয়োজনীয় উপকরণ

পাঠ-৩৪

ইমপ্ল্যান্ট এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও তার ব্যবস্থাপনা

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারে নিম্নলিখিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যা যে কোন প্রজেক্টেরণ সম্বলিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব ঃ

মাসিক জনিত	• ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব (Spotting), অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Menorrhagia), অনিয়মিত রক্তস্রাব (Metorrhagia), মাসিক বন্ধ থাকা (Amenorrhoea) একজন ইমপ্ল্যান্ট গ্রহীতার মাসিকজনিত কি ধরনের সমস্যা হবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল। সব ধরনের সমস্যাই ছয় থেকে বার মাস ব্যবহারের পর কমে আসে অথবা ভাল হয়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইমপ্ল্যান্ট গ্রহীতাদের প্রতি মাসে রক্তস্রাবের পরিমাণ আগের তুলনায় কম। রক্তস্রাবের স্বল্পতার কারণে সেই সব গ্রহীতার হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। • অতিরিক্ত রক্তস্রাবের পরবর্তীতে দেখা দিতে পারে রক্তস্বল্পতা।
হরমোনজনিত	• ওভারিতে সিষ্ট (cyst), স্তনে ব্যথা, ওজন বৃদ্ধি।
স্নায়ুতন্ত্রজনিত	• মাথা ব্যথা, বমি বমি লাগা, মাথা ঘুরানো, রুচির পরিবর্তন, বিষন্নতা এবং অন্যান্য মানসিক পরিবর্তন।
চর্মজনিত	• ডার্মাটাইটিস, ব্রণ, হারসুটিজম বা মুখে অস্বাভাবিক লোম গজানো।
স্থানীয় ক্ষতজনিত	• ক্ষতস্থানে চুলকানি বা ব্যথা, ক্ষতস্থানে প্রদাহ, একটি বা অধিক ক্যাপসুল বের হয়ে আসা। সাধারণত ঠিকভাবে স্থাপন করা হলে ক্যাপসুল বের হয়ে আসা একটি বিরল ঘটনা। তবে প্রদাহজনিত কারণে অথবা সাইলাষ্টিকের প্রতি কিছু মহিলার এলার্জি থাকার কারণে এক বা অধিক সংখ্যক ক্যাপসুল বের হয়ে আসতে পারে। এই ক্ষেত্রে চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী বের হয়ে যাওয়া ক্যাপসুলগুলো জায়গায় সমান সংখ্যক নতুন ক্যাপসুল স্থাপন করতে হবে অথবা সবগুলো ক্যাপসুল খুলে ফেলে অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে হবে।

ইমপ্ল্যান্ট থেকে প্রতিদিন অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে হরমোন নিঃসৃত হয়। এই কারণে হরমোন সম্বলিত অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় ইমপ্ল্যান্ট এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম। উপরন্ত বেশীর ভাগ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াই কিছুদিন (৬ মাস - ১ বছর) ব্যবহারের পর কমে আসে।

ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের পর অনুসরণ (ফলোআপ)

কখন ক্লিনিকে পুনরায় আসতে হবে-

- বাংলাদেশে ইমপ্ল্যান্টের ফলোআপের জন্য মোট সাত (৭) বার ক্লিনিকে আসতে বলা হয়-

  ১ম বার - স্থাপনের ১ মাস পর
  ২য় বার - ৬ মাস পর
  ৩য় বার - ১ বছর পর
  ৪র্থ বার - ২ বছর পর
  ৫ম বার - ৩ বছর পর
  ৬ষ্ঠ বার - ৪ বছর পর
  ৭ম বার - ৫ বছর পর (খোলার জন্য)

- এছাড়াও জরুরী অবস্থা দেখা দিলে যে কোন সময় ক্লিনিকে আসার পরামর্শ দেয়া হয়।
- কোন সমস্যা দেখা দিলে, পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকলে বা ভয়ভীতি থাকলে যদি মনে হয় গ্রহীতা গর্ভবতী হয়েছে, খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলে, যে ক্লিনিক থেকে ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করা হয়েছে গ্রহীতাকে ফলোআপের জন্য সে ক্লিনিকেই আসতে বলতে হবে। তবে প্রয়োজন বোধে অন্য যে কোনো ক্লিনিকেও ফলোআপ পরীক্ষা করানো যেতে পারে।
- নিম্নের যে কোন সমস্যা থাকলে গ্রহীতাকে যে ক্লিনিক থেকে ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে সে ক্লিনিকেই নিয়ে আসতে বলা হয়ঃ

D (Delay)	যদি দীর্ঘ সময় স্বাভাবিক মাসিক চক্রের পর মাসিক বন্ধ থাকে এবং সেই সাথে তলপেটে ব্যথা থাকে।
I (Infection)	যে জায়গায় ইমপ্ল্যান্ট ক্যাপসুল স্থাপন করা হয়েছে সেখানে কোন সংক্রমণ হলে।
S (Severe Pain)	তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা হলে।
C (Capsule Comes Out)	যদি কোন ক্যাপসুল বের হয়ে আসে।

U (Unusually Heavy Bleeding)	যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়।
S (Soreness)	ক্যাপসুল স্থাপনের কয়েক দিনের মধ্যে যে হাতে স্থাপন করা হয়েছে সে হাতে যদি কোন ঘা হয়।
S (Severe Headache or Blurred Vision)	প্রচন্ড মাথা ব্যথা হলে বা চোখে ঝাঁপসা দেখলে।

পাঠ-৩৫
ইমপ্ল্যান্ট খোলা

ইমপ্ল্যান্ট খোলা

ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের ন্যায় ক্যাপসুলগুলো মাসিকের সময় খোলা যেতে পারে। ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের চাইতে খোলার জন্য সময় বেশী লাগে এবং কিছুটা অসুবিধাজনকও বটে। ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন যত সঠিক হবে যেমন- ক্যাপসুলসমূহ কেবলমাত্র চামড়ার নীচে এবং সবগুলো ক্যাপসুলের মাথা ইনসিশন থেকে মাত্র ৫ মিলিমিটার এর মধ্যে, খোলার পদ্ধতিও ততই সহজ হবে।

ইমপ্ল্যান্ট খোলার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ সেবাপ্রদানকারীর প্রয়োজন। কোন কারণে দক্ষ সেবা প্রদানকারী অনুপস্থিত থাকলে সেদিন ইমপ্ল্যান্ট খোলা স্থগিত রাখাই শেষ করতে হবে অথবা যেখানে দক্ষ সেবা প্রদানকারী রয়েছে সেখানে রেফার করতে হবে। যদি একই সিটিং এ সবগুলো ক্যাপসুল অপসারণ করা সম্ভব না হয় তাহলে গ্রহীতাকে ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাওয়ার পর বাকি ক্যাপসুলগুলো খুলতে আসার পরামর্শ দিতে হবে। যদি কোন ক্যাপসুল খোলা হয়ে থাকে বাকি ক্যাপসুলগুলো না খোলা পর্যন্ত গ্রহীতাকে অন্য কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে। কারণ ক্যাপসুলের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে তা আর গর্ভধারণ রোধ করতে পারবে না।

ইমপ্ল্যান্ট খোলার সময় সেবাপ্রদানকারীকে যত্ন, সাবধানতা এবং ধৈর্য্যের সাথে কাজ করতে হবে। সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং অন্যান্য রোগ ছড়ানোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের মত খোলার সময়ও যথাযথ সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা মেনে চলতে হবে।

গ্রহীতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে ইমপ্ল্যান্ট নিজে খোলা যায় না। কাজেই সমস্যা দেখা দিলে গ্রহীতাকে অবশ্যই সেবাদান কেন্দ্রে আসতে হবে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ইমপ্ল্যান্ট সত্বর খুলে ফেলতে হবেঃ

- বার বার অতিরিক্ত মাথা ব্যথা/ প্রথম বারের মতো মাইগ্রেন জাতীয় মাথা ব্যথা। Thrombophlebitis/Thromboembolism- এর প্রথম লক্ষণ।
- রক্তচাপের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।
- বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের ৬ সপ্তাহ আগে।
- অনেক দিনের জন্য হাটা চলা বন্ধ থাকলে।
- গর্ভধারণ হলে।
- লিভারের কোন রকম গুরুতর অসুখ হলে।

পাঠ-৩৬
ইমপ্ল্যান্ট রিপোর্টিং এবং ইমপ্ল্যান্ট সংক্রান্ত প্রশ্ন-উত্তর

ইমপ্ল্যান্ট রিপোর্টিং

জাতীয় কার্যক্রমে ইমপ্ল্যান্টকে পরিবার পরিকল্পনার সপ্তম পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর ১৯৯২ সালের MIS রিপোর্টে ইমপ্ল্যান্টকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং প্রতি মাসে ইমপ্ল্যান্ট গ্রহীতার সংখ্যা নিয়মিত ভাবে MIS রিপোর্টে দেখানো হয়। MIS কার্যালয় হতে সেবা কেন্দ্রসমূহে সুনির্দিষ্ট ফর্ম সরবরাহ করা হয়। এই ফর্মের মাধ্যমে সেবা কেন্দ্র হতে প্রতি মাসে মাসিক প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের Performance নিয়ে MIS কার্যালয় হতে MIS রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং কেন্দ্রসমূহে ও সংশ্লিষ্ট দফতর সমূহে এই রিপোর্ট পাঠানো হয়। এই রিপোর্ট হতে প্রতিটি কেন্দ্র তাদের নিজ কেন্দ্রের Performance এর সার্বিক অবস্থান ও অন্যান্য কেন্দ্রের Performance এর সাথে তুলনা করার সুযোগ পায়। তবে মনে রাখতে হবে যে সকল কেন্দ্রই যেন সময় মত তাদের রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

ইমপ্ল্যান্ট সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্তর

১) কম বয়সী যুবতী, বয়স্কা এবং যেসব মহিলাদের বাচ্চা নেই তারা কি ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করতে পারেন ?	- না, বাংলাদেশের নীতিমালা অনুযায়ী কেবলমাত্র বিবাহিত মহিলা এবং যাদের কমপক্ষে একটি জীবিত সন্তান আছে তারাই ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করতে পারেন।
২) ৫ বছরেরও বেশি সময় ইমপ্ল্যান্ট শরীরে থাকলে তা কি কোন ক্ষতির কারণ ?	- না, ৫ বছরের বেশী শরীরে থাকলে ইমপ্ল্যান্ট শরীরের কোন ক্ষতি করে না। ৫ বছর পর হরমোনের পরিমাণ কমে যায় বলে ইমপ্ল্যান্টের কার্যকারিতা একেবারেই কমে যায় এবং গর্ভধারণের সম্ভাবনাসহ জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণও হতে পারে। তাই ইমপ্ল্যান্ট খুলে নতুন সেট পরা যায় বা অন্য জন্ম নিরোধক ব্যবহার করা যায়।
৩) ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের পর কোন মহিলা যদি গর্ভবতী হন তবে কি তিনি তা খুলে ফেলার জন্য	- হ্যাঁ, ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারকারী মহিলা গর্ভবতী হলে তিনি তা খুলে ফেলার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবেন।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবেন?	
৪) ইমপ্ল্যান্ট কি ক্যান্সারের কারণ ?	- না, ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারে/ লাগালে ক্যান্সারের কারণ হতে পারে না। উপরন্ত এটা জরায়ুর ভিতরে আবরণের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।
৫) ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারকারী মহিলাদের কি ডিম্বাশয় সিষ্ট হয় ?	- হ্যাঁ। তবে বেশীর ভাগ সিষ্টই কোন অস্ত্রোপচার ছাড়াই নিজে নিজে দূরীভূত হয় -যদি স্বাস্থ্যকর্মী ডিম্বাশয়ের কোন সিষ্ট খুঁজে পান তবে তিনি ৩ সপ্তাহের মধ্যে মহিলাকে আবার পরীক্ষা করবেন এবং নিশ্চিত হবেন এটা কি ছোট (Shrink) হয়ে এসেছে কি না।
৬) ইমপ্ল্যান্ট লাগানোর পূর্বে প্রত্যেক মহিলার তলপেট পরীক্ষা (Pelvic Examination) আবশ্যক কি না ?	- না, ইমপ্ল্যান্ট লাগানোর পূর্বে তলপেট পরীক্ষার প্রয়োজন নেই -তবে মহিলার প্রজননতন্ত্রে কোন অসুবিধা আছে কি না তা জানার জন্য তলপেট পরীক্ষা করাই ভাল।
৭) ইমপ্ল্যান্ট লাগানো হয়েছে এমন কোন মহিলার কি পরীক্ষার জন্য আবার আসা (Follow Up) আবশ্যক ?	- হ্যাঁ, আমাদের দেশে ইমপ্ল্যান্ট খোলা নিশ্চিত করা এবং নিজের গ্রহীতার কোন শারীরিক অসুবিধা হচ্ছে কি না দেখার জন্য গ্রহীতাকে ৫ বছরে মোট ৭টি ফলোআপ করা হয়।
৮) ৫ বছরের পূর্বে যদি কোন মহিলা তার হাতে লাগানো ক্যাপসুল খুলে ফেলতে চান, তবে কি করতে হবে ?	- বিনয়ের সাথে তাকে প্রশ্ন করতে হবে কেন তিনি ক্যাপসুল অপসারণ করতে চান। - তার মনে জাগ্রত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খুবই পরিস্কার এবং সঠিকভাবে দিতে হবে। - তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যদি তার সমস্যাগুলো খুবই গুরুতর না হয়। - কখনই যেন তিনি ইমপ্ল্যান্ট খুলে ফেলার ব্যাপারে লজ্জার, ভয়ের বা চাপের সম্মুখীন না হয়। - কাউন্সেলিং-এর পরও যদি যে কোন কারণেই

	তিনি ক্যাপসুল খুলে ফেলতে চান তখন সংশ্লিষ্ট সেবাদান কেন্দ্র থেকে ক্যাপসুলগুলো খুলে ফেলবেন অথবা খুলে ফেলার ব্যবস্থা করবেন।
৯) মোটা মহিলারা ইমপ্ল্যান্ট লাগানো থেকে কি বিরত থাকবেন ?	- না, গবেষণায় দেখা গেছে যে ৭০ কিলোগ্রামের চেয়ে বেশি ওজনের মহিলাদের জন্য ইমপ্ল্যান্ট লাগানো খুবই কার্যকরী।
১০) একজন মহিলার শরীরে কি ইমপ্ল্যান্ট ভেঙ্গে যায় অথবা ঘুরে বেড়ায় ?	- না, ক্যাপসুলগুলো নমনীয় এবং চামড়ার নিচে ক্যাপসুলগুলো ভাঙ্গে না। অপসারণের আগ পর্যন্ত যে জায়গায় লাগানো হয় ঐ জায়গায়ই থাকে।
১১) ইমপ্ল্যান্ট লাগানোর পর পরই কি একজন মহিলা কাজ করতে পারেন ?	- হ্যাঁ, ক্লিনিক থেকে ফিরে আসার পর পরই একজন মহিলা তার দৈনন্দিন কাজ করতে পারেন, তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে তিনি ঐ জায়গায় হঠাৎ কোন আঘাত না পান বা ঐ জায়গা না ভেজান। তিনি অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার বেশী জায়গাটা পরিস্কার রাখবেন এবং শুষ্ক রাখবেন। আরোগ্য লাভের সাধারণতঃ ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ঐ স্থান স্পর্শ করা যায় এবং পরিস্কার করা যাবে।

পাঠ-৩৭
জরুরী গর্ভনিরোধক (ECP)

জরুরী গর্ভনিরোধক (Emergency Contraceptive Pill)

জরুরী গর্ভনিরোধ হলো অরক্ষিত সহবাসের পরে ব্যবহার করে অনাকাঙ্খিত গর্ভ প্রতিরোধ করা। এছাড়াও রেপ কেস এর ব্যবস্থাপনায় জরুরী গর্ভনিরোধক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কখনও কখনও জরুরী গর্ভনিরোধক কে "পরবর্তী" গর্ভনিরোধকও বলা হয়ে থাকে। তবে সাধারণত "জরুরী গর্ভনিরোধক" নামটিই বহুল প্রচলিত। কারণ পদ্ধতিটি শুধুমাত্র জরুরীভাবে ব্যবহারের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তা অরক্ষিত যৌন সহবাসের পর শুধুমাত্র পরের দিন সকাল নয়, কয়েকদিন পর পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে জরুরী গর্ভনিরোধক এর তিনটি পদ্ধতি আছে, সেগুলো হলো যথাক্রমে, (১) মিশ্র এস্ট্রোজেন ও প্রজেষ্টেরনযুক্ত জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি, (২) শুধুমাত্র প্রজেষ্টেরনযুক্ত জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি ও (৩) আইইউডি (কপার-টি)

জরুরী গর্ভনিরোধের পদ্ধতিসমূহ ঃ

প্রধানতঃ ২টি উপায়ে জরুরীভাবে গর্ভনিরোধ করা যায়

১.ইমারজেন্সী কন্ট্রাসেপটিভ পিল (ইসিপি)

মিশ্র জরুরী গর্ভনিরোধ বড়ি

প্রতি ট্যাবলেটে ০.৫ মিলিগ্রাম নরজেস্ট্রেল এবং ৩০-৫০ মাইক্রোগ্রাম ইথিনাইল ইস্ট্রাডিওল থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে সহজলভ্য সুখী, ফেমিকন, নরডেট-২৮, কম্বিনেশন-৫ এবং ওভরাল বড়িতে এই উপাদান বিদ্যমান।

শুধুমাত্র

প্রতি ট্যাবলেটে ০.৭৫ মিলিগ্রাম লেভোনরজেস্ট্রিল নামক প্রজেষ্টেরন হরমোন বিদ্যমান। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে এট পস্টিনর-২ এবং বাজারে এমকন নামে পাওয়া যায়।

জরুরী গর্ভনিরোধক ঃ

জরুরী গর্ভনিরোধ পদ্ধতি হিসেবে হরমোনযুক্ত বড়ি এবং আইইউডি উভয়ই ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পরিচিত হয়। গত ৪০ বৎসরে মিশ্র এষ্ট্রোজেন প্রজেষ্টেরনযুক্ত গর্ভনিরোধক বড়ি এবং আইইউডি কে জরুরী গর্ভনিরোধ এর নিরাপদ পদ্ধতি হিসাবে পুনরায় যাচাই করা হয় এবং ফলপ্রসূতা আবার প্রমাণিত হয় (ট্রাসেল এবং স্টেনার্ট, ১৯৯২)।

জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে সবচাইতে বেশী ব্যবহৃত “মিশ্র খাবার বড়ি” যা ইউজপি পদ্ধতি (YUZPE Method) হিসেবে পরিচিত এবং কমিটি অন সেফটি অফ মেডিসিনস (CSM) কর্তৃক অনুমোদিত।

নিচে বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো যা জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে-

পদ্ধতি	শুরুর সময়	মাত্রা	পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া/সমস্যা
মাঝারী মাত্রার মিশ্র খাবার বড়ি যেমন কম্বিনেশন-৫	৭২ ঘন্টার মধ্যে ২টি এবং ১২ ঘন্টার পর আরও ২টি	৫০ মাইক্রোগ্রাম ইস্ট্রাডিওল + ০.৫ মিলিগ্রাম নরজেষ্ট্রেল	খাবার বড়িতে সাধারণত যে ধরনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার মতই।
স্বল্পমাত্রার মিশ্র খাবার বড়ি যেমন- সুখী	৭২ ঘন্টার মধ্যে ৪ টি ১২ ঘন্টার পরে আরও ৪টি	৩০ মাইক্রোগ্রাম ইথিনাইল ইস্ট্রাডিওল ১৫০ মাইক্রোগ্রাম লেভোনরজেষ্ট্রেল	খাবার বড়িতে সাধারণত যে ধরনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার মতই।
প্রজেস্টেরন যুক্ত বড়ি	৭২ ঘন্টার মধ্যে ১টি এবং ১২ ঘন্টার পর আরও ১টি	০.৭৫ মিলিগ্রাম লেভোনরজেষ্ট্রেল	বমির ভাব হতে পারে।
আইইউডি	৫ দিনের মধ্যে পরাতে হবে		স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা প্রয়োজন। যৌনরোগে আক্রান্ত মহিলাদের সুবিধাজনক নয়।

জরুরী গর্ভনিরোধক বিষয়ক তথ্যসমূহ

- সকল গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারীদের বিশেষ করে যারা “বেরিয়ার পদ্ধতি” যেমন কনডম এবং আজল পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদেরকে গর্ভনিরোধকের সহজ প্রাপ্তির ব্যাপারে শিক্ষা দিতে হবে।
- রেপ বা ধর্ষণ কেস ব্যবস্থাপনায় ইহা ব্যবহার করা যায়।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার ও লিফলেট তৈরী এবং ব্যবহার করতে হবে।

- অরক্ষিত যৌনসহবাসের পরে জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে হরমোন পদ্ধতি এবং আইইউডি যথাক্রমে ৭২ ঘন্টা এবং ১২০ ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে, সে ব্যাপারে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে।
- সেবা প্রদানকারীগণকে গ্রহীতাদের প্রয়োজনে অগ্রিম তথ্য ও কাউন্সেলিং, নির্দেশনা এবং জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি দিতে হবে।
- জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি গ্রহণ পদ্ধতি সঠিকভাবে বর্ণনা করতে হবে। অতিরিক্ত জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি গ্রহণে কার্যকারিতা বৃদ্ধির চেয়ে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার সম্ভাবনাই বেশী, এ ব্যাপারে গ্রহীতাদের উপদেশ দিতে হবে।

মিশ্র জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি

প্রস্তুতি ঃ প্রতি ট্যাবলেটে ০.৫ মিলিগ্রাম নরজেস্ট্রেল এবং ৫০ মা ইক্রোগ্রাম ইথিনাইল ইস্ট্রাডিওল থাকে। অনিয়ন্ত্রিত বা অরক্ষিত যৌন মিলনের ৭২ ঘন্টার মধ্যে ২টি বড়ি (১২ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খেলে ভাল হয়) এবং ১২ ঘন্টার পর আরো ২টি বড়ি খেতে হয়।

মাত্রা ঃ সহবাসের পরে ৭২ ঘন্টার মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ২টি ট্যাবলেট খেতে হবে। পুনরায় ১২ ঘন্টা পর ২টি ট্যাবলেট খেতে হবে। তবে প্রথম ২টি বড়ি খাওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, পরবর্তী বড়ি ২টি যেন ১২ ঘন্টার পরে অবশ্যই রোগীর জন্য সুবিধাজনক সময়ে হয়।

রিফামপিসিন প্রাপ্ত কোন রোগীর যদি মিশ্র জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ির প্রয়োজন হয়, তবে তাকে প্রথমবারে ৩টি ট্যাবলেট এবং পরবর্তী ১২ ঘন্টা পরে আরও ৩টি ট্যাবলেট খেতে হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাত্রা হলো মোট ৬টি ট্যাবলেট।

কিভাবে কাজ করে?

জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি কতগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করে। এটি সাধারণত এন্ডোমেট্রিয়াম ও ডিম্বাশয়ে পরিবর্তন আনে। পরিবর্তনগুলো হলোঃ ডিম্বাণু তৈরী বন্ধ রাখা, নিষিক্ত (Fertihation) করণ প্রতিরোধ করা অথবা নিষিক্ত ডিম্বানুকে জরায়ুতে গ্রোথিত হওয়া থেকে বিরত রাখা। যদি গর্ভনিরোধক বড়ি মাসিক চক্রের প্রথমার্ধে গ্রহণ করা হয় তাহলে ডিম্বোস্ফোরণ দেরীতে হয়, আর যদি গর্ভনিরোধক বড়ি ডিম্বস্ফোরণের পরে গ্রহণ করা হয় তাহলে করপাস লুটিয়াম-এর কার্যক্রম পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু গর্ভনিরোধক বড়ি কখনও গর্ভপাত ঘটায় না।

চিকিৎসা সময়কাল

অরক্ষিত যৌনসহবাসের ৭২ ঘন্টার মধ্যে জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি খেতে হবে। দেখা গেছে যে, ৭২ ঘন্টা সময় কালের মধ্যে যত আগে খাওয়া যাবে তত ভাল ফল পাওয়া যাবে। একাধিকবার যৌনসহবাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম বার যৌনসহবাসের সময় থেকে হিসাব করতে হবে। জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি ব্যবহারের সময় ২৪ ঘন্টার পর্যাপ্ত হরমোন লেভেল রক্ষার জন্য ১২ ঘন্টা ব্যবধানে বড়ি খাওয়া উচিত।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

ক. শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রেই বমি বমি ভাব দেখা দেয়। সাধারণত ২৪ ঘন্টার বেশী তা থাকে না। এক্ষেত্রে বমি প্রতিরোধক ঔষধ দেয়া যেতে পারে। তবে বমি শুরু হলে বমি প্রতিরোধক আর কাজ করে না।

খ. যারা এস্ট্রোজেন ও প্রজেষ্টেরন যুক্ত মিশ্র বড়ি ব্যবহার করেন, তাদের শতকরা ২০ ভাগের ক্ষেত্রে বমি হয়ে থাকে। যদি বড়ি খাওয়ার ২ ঘন্টার মধ্যে রোগী বমি করে থাকে, তাহলে বমি প্রতিরোধক বড়ি সহ আরও ২টি গর্ভনিরোধক বড়ি গ্রহণ করতে হবে। অথবা আইইউডি স্থাপনের চিন্তাভাবনা করতে হবে।

গ. মাথা ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা এবং স্তন ভারী হয়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে শুধুমাত্র প্রজেস্টেরনযুক্ত বড়ি

কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে মিশ্র বড়ি দেয়া যায় না। সে সব ক্ষেত্রে জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে শুধু প্রজেস্টেরনযুক্ত গর্ভনিরোধক দেয়া যেতে পারে। বর্তমানে ব্যবহৃত অনেক ধরনের শুধু প্রজেস্টেরনযুক্ত জরুরী গর্ভনিরোধকের মধ্যে লেভোনরজেস্ট্রেলই সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। হো (Ho) এবং কন (Kwan) সম্প্রতি এর ২ মাত্রার ব্যবহার পদ্ধতিটি বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে অরক্ষিত যৌন মিলনের ৭২ ঘন্টার মধ্যে ০.৭৫ মিলিগ্রাম লেভোনরজেস্ট্রিল (২৫ টি মাইক্রোওভাল বড়ির সমমাত্রা) বড়ি ১২ ঘন্টা অন্তর ২টি মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে। এটি ইউজপি (YUZPE) পদ্ধতিটির চেয়ে বেশী কার্যকরী। যখন একজন গ্রহীতাকে এই পদ্ধতিটি দেয়া হবে তখন তাকে অবশ্যই এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

পাঠ-৩৮

জরুরী গর্ভনিরোধক (ECP) হিসেবে আইইউডি

জরুরী গর্ভনিরোধক হিসাবে আইইউডি

জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে আইইউডি পরানো অন্য স্বাভাবিক পদ্ধতির মতোই। অরক্ষিত যৌন মিলনের পাঁচ দিনের মধ্যে আইইউডি পরানো হলে তা গর্ভনিরোধক হিসেবে কার্যকর হবে।

জরুরী গর্ভনিরোধ এর কার্য পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা

আইইউডি জরায়ুর ভেতরের স্তরে (এন্ডোমেট্রিয়াম) এমন পরিবর্তন সাধন করে, যার ফলে ভ্রূণ (নিষিক্ত ডিম্বাণু) জরায়ুতে গ্রথিত (Implanned) হতে পারে না। তা ছাড়া যে সব এনজাইম নিষিক্তকরণ (Fertilization) এবং গ্রথিতকরণে (Implantation) সাহায্য করে কপার সে সব এনজাইমের কাজে বাধা প্রদান করে। বিভিন্ন উপাত্ত থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আইইউডি অপরিণত গর্ভপাত (Abortion) ঘটায় না।

অন্য জরুরী গর্ভনিরোধকগুলোর মধ্যে এই পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। যখন কার্যকারিতাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, তখন জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে আইইউডিকে বেছে নেয়া হয়।

প্রয়োগের সময় ঃ অরক্ষিত যৌন মিলনের পর পাঁচ দিনের মধ্যে নিশ্চিতভাবে আইইউডি পরানো যায়, যা এই পদ্ধতিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে আইইউডি পরানোর প্রথম মাসেই এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে। সেবা প্রদানকারীদের আইইউডি প্রয়োগ পরবর্তী (Pelvic Infection) তলপেটে সংক্রমণ ঝুঁকির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যৌন হয়রানি বা রেপ কেস এর ক্ষেত্রে যৌনবাহিত রোগকে একটি ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

জরুরী গর্ভনিরোধের ব্যবহার নির্দেশ

ক. আজল পদ্ধতি ব্যর্থ হওয়া।

খ. বহিঃজনন অঙ্গে বীর্যপাত।

গ. রিদম (Rythm) প্রক্রিয়ার হিসাবে ভুল হওয়া।

ঘ. পদ্ধতি গ্রহণ না করে প্রথম বার যৌন মিলন।

- কনডম ছিঁড়ে যাওয়া বা স্থানচ্যুত হওয়া।
- আইইউডি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে খুলে যাওয়া।
- মাসিক চক্রের মাঝামাঝি সময় আইইউডি অপসারণ জরুরী হলে।
- খাবার বড়ি খেতে ভুলে যাওয়া ঃ নয়/দশ দিনের ব্যবধানে একাধিক বার বড়ি খেতে ভুলে গেলে এবং সে সময় অরক্ষিত যৌন মিলন হয়ে থাকলে জরুরী গর্ভনিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একটি দম্পতি যারা জন্মনিয়ন্ত্রণে অপারগ হচ্ছে বা অন্য কোন কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে রাজি নন, তারা একাধিক বার জরুরী জন্মনিরোধক বড়ি ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন। দম্পতি যদি অযাচিত গর্ভের সম্মুখীন হন এবং গর্ভের সমাপ্তি ঘটাতে চান, তাহলে সেটা হবে ঝুঁকিপূর্ণ। এমতাবস্থায়, তাদেরকে জরুরী গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা দেয়া যেতে পারে।

মহিলার যারা জরুরী জন্মনিরোধক পদ্ধতিকে প্রচলিত কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে চান তাদেরকে সতর্ক করা প্রয়োজন। কারণ প্রচলিত কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরিবর্তে বার বার জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ির ব্যবহার গর্ভধারণের সম্ভাবনাকে অধিক মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়।

গ্রহীতাকে নিশ্চিত করা জরুরী যে-

ক. চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয়েছে। যদি গর্ভধারণের সম্ভাবনা থেকে থাকে তবে পেলভিক পরীক্ষা করতে হবে। কোন কোন সময় প্রেগনেন্সী পরীক্ষার (Pregnancy Test) দরকার হতে পারে। যদি গর্ভধারণ নিশ্চিত হওয়া যায় তবে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের ব্যবস্থাপনা যেমন- এম আর করার কথা বলা যেতে পারে।

খ. গ্রহীতা একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যে গ্রহীতা আইইউডি পরেছেন তিনি যদি চান তবে আইইউডি রেখে দিতে পারেন। তবে নিশ্চিত করতে হবে গ্রহীতা যদি তার পছন্দমত অন্য কোন পদ্ধতি নিতে চান তবে তিনি তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারবেন।

জরুরী গর্ভনিরোধের কার্যকারীতার ক্ষেত্রে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অরক্ষিত যৌনমিলনের পর পাঁচ দিনের মধ্যে অবশ্যই আইইউডি পরিয়ে ফেলতে হবে। হরমোনাল পদ্ধতি বেশী কার্যকরী হবে যদি তা যৌন মিলনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রহণ করা হয়। কার্যকরী ফল পেতে হলে প্রায় সবগুলো হরমোন পদ্ধতিই সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। জরুরী গর্ভনিরোধ সামগ্রীর সহজ প্রাপ্যতার অভাবে অনেক গ্রহীতা এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে উৎসাহী হন না। যে সব দেশে জরুরী গর্ভনিরোধক সামগ্রী সহজলভ্য সে সব দেশ ছাড়া অন্যত্র একজন গ্রহীতাকে এ সব সামগ্রীর জন্য ঔষধ প্রদানকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয়।

জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি কার্যকরী না হলে

বেশীর ভাগ মহিলাই গর্ভের সমাপ্তি ঘটাতে চান। এধরনের মহিলাদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সঠিক উপদেশ বা প্রয়োজনে সঠিক স্থানে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো। যে সব মহিলা গর্ভ চালিয়ে যেতে চান তাদের জন্য উপদেশ হলো ঃ

ক) গর্ভ চালিয়ে যাওয়ার উপর জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ির কোন প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক নয়। এই ধরনের অভিব্যক্তি তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, এ ধরনের খুব কম সংখ্যক গর্ভই গর্ভশেষ কালীন পর্যন্ত পৌঁছায়।

খ) জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ির অকার্যকারিতা গর্ভের সমাপ্তি ঘটানোর নির্দেশক নয়।

গ) গর্ভের স্বাভাবিক সমাপ্তি পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায় না।

ফলোআপ

একজন জরুরী গর্ভনিরোধক গ্রহীতার যদি তলপেটে ব্যথাসহ প্রচুর রক্ত স্রাবের ইতিহাস থাকে তবে তাকে তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে ফলোআপে আসার জন্য বলতে হবে। ফলোআপের সুযোগ না থাকলে তাকে কোন পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উপদেশ দিতে হবে যদি তার তলপেটে ব্যথার সাথে অস্বাভাবিক রক্তস্রাব অথবা যদি তার পরবর্তী মাসিক চক্র অস্বাভাবিকভাবে ছোট অথবা বন্ধ থাকে। ফলোআপে চিকিৎসা পরবর্তী মাসিকের ধরন রেকর্ড করতে হবে।

টিপস

অরক্ষিত যৌনসহবাসের ৭২ ঘন্টার মধ্যে জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি খেতে হবে। দেখা গেছে যে, ৭২ ঘন্টা সময় কালের মধ্যে যত আগে খাওয়া যাবে তত ফল ভাল পাওয়া যাবে। একাধিকবার যৌনসহবাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম বার যৌনসহবাসের সময় থেকে হিসাব করতে হবে। জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি ব্যবহারের সময় ২৪ ঘন্টায় পর্যাপ্ত হরমোন লেভেল রক্ষার জন্য ১২ ঘন্টা ব্যবধানে বড়ি খাওয়া উচিত।

পাঠ-৩৯

অনিরাপদ গর্ভপাত (Unsafe Abortion)

অনিরাপদ গর্ভপাত (Unsafe Abortion)

সংজ্ঞা ঃ

যথোপযুক্ত কেন্দ্রে অথবা উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা গর্ভপাত করানো না হলে, নির্ধারিত গর্ভপাতের নিয়ম অনুসরণ না করে অন্যান্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে তাকে অনিরাপদ গর্ভপাত বলা হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে সেবা প্রদানকারীর অপর্যান্ত দক্ষতা, বিপদজনক পদ্ধতি বা টেকনিক প্রয়োগ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণ ঃ

- অপরিকল্পিত গর্ভসঞ্চার।
- পরিবারের সংখ্যা সীমিত রাখতে বা জন্মবিরতির জন্য।
- জন্মবিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকরী না হলে বা আধুনিক পদ্ধতি সহজলভ্য না হলে
- অবিবাহিত কিশোরীরা গর্ভবতী হলে।

অনিরাপদ গর্ভপাতের কৌশল ঃ

- অনিরাপদ গর্ভপাত করাতে মহিলা নিজেই চেষ্টা করতে পারেন।
- চিকিৎসা কর্মী ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারেন।

নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয় ঃ

- কোন শক্ত জিনিস (শেকড়, কাঠ/ ক্যাথেটার) জরায়ুতে প্রবেশ করানো
- জরায়ূর মুখ যথাযথভাবে না খুলে কিউরেট করা বা ওয়াশ করা
- ক্ষতিকর পদার্থ ভেতরে প্রবেশ করানো (ঔষধ/ কেমিকেল, গাছপালা)
- বাইরের শক্তি প্রয়োগ

অনিরাপদ গর্ভপাতের স্বাস্থ্যগত প্রভাব: যে সব জটিলতা দেখা দিতে পারে তা হলো-

- সেপসিস
- রক্তক্ষরণ
- যৌনাঙ্গ বা পেটে আঘাত

- জরায়ু মুখ ছিড়ে যাওয়া
- জরায়ু ফুটো হয়ে যাওয়া

মৃত্যু ঃ

জটিলতার চিকিৎসা করা না হলে মৃত্যু অবধারিত। অত্যধিক জটিলতা যেমন গ্যাংরিন এবং একিউট রেনাল ফেইলিউর এর কারণেও মৃত্যু হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী (Long Term) জটিলতা ঃ

তলপেটে সংক্রমণ (PID)

- ডিম্বনালী বা ফেলোপিয়ান টিউব বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে পরবর্তীতে বন্ধ্যা হয়ে যায়।
- জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণ (Ectopic Pregnancy)
- অপরিণত প্রসব (Premature Delivery)
- আপনা আপনি গর্ভপাতের ঝুঁকি বৃদ্ধি।

অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধে কাউন্সেলিং বা পরামর্শদান ঃ

১) যৌনতা, নিরাপদ যৌন আচরণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রজননক্ষম পুরুষ ও মহিলাদের তথ্য প্রদান।

২) মহিলাদের নিরাপদ গর্ভপাত কেন্দ্রে যাওয়ার বা মাসিক নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করা।

   - এ ধরনের সেবাকেন্দ্রে এবং সেবাপ্রদানকারী সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।
   - গোপনীয়তা বজায় রাখা।

৩) অনিরাপদ গর্ভপাতের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান

৪) গর্ভপাত ও গর্ভপাতের জটিলতা চিহ্নিত করা।

পাঠ-৪০

মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর)

সংজ্ঞা ঃ

যে কোন কারণে নারীদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে শেষ মাসিকের প্রথম দিন হতে ১২ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে মাসিক নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়াকে এমআর বলে।

ভূমিকা ঃ

মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১৯৭৪ সালে শহরাঞ্চলের কয়েকটি সরকারী পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে এম আর শুরু করা হয়। ১৯৭৯ সালে এমআর সেবা ব্যবস্থা জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং সকল সরকারী হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে বাস্তবায়িত করা হয়।

জাতীয় এমআর কার্যক্রমটি মাতৃমৃত্যু ও পঙ্গুত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যাক্তিমালিকানাধীন সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে সকল স্তরের স্বাস্থ্ সেবা ব্যবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে বাস্তবায়িত করা হয়।

জাতীয় এমআর কার্যক্রমটি মাতৃমৃত্যু ও পঙ্গুত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে সকল স্তরের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এম আর সেবা এখন সহজলভ্য। ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম অ্যাসপিরেশন (MVA) নামক পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারী ডাক্তার ও প্যারামেডিকসঃ যেমন- পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) এবং মহিলা সাব এসিসট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO)- দের দ্বারা এমআর করা হয়ে থাকে ।

পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যু বিষয়ক জরিপ ২০১১ অনুযায়ী অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণে শতকরা এক ভাগ মাতৃমৃত্যু হয়ে থাকে। অতীতে মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ ছিল অনিরাপদ এমআর। এই সেবার শুরু থেকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাসিক নিয়মিতকরণ সেবার প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ডাক্তার এবং প্যারামেডিক দ্বারা এমভিএ পদ্ধতিতে মাসিক নিয়মিতকরণ করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে এমআর কার্যক্রমটি প্রধানত আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহায়তায় অব্যাহত রয়েছে, MRTSP (Menstrual Regulation Training and Service Program) এর

মাধ্যমে USAID (United States Agency for International Development) এবং পরবর্তীতে ফোর্ড ফাউন্ডেশন, পাথ ফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এবং পপুলেশন ক্রাইসিস কমিটি, বর্তমানে পপুলেশন একশন ইন্টারন্যাশনাল। পরে দি সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি (SIDA) এবং রয়েল নেদারল্যান্ডস দূতাবাস বেসরকারী এমআর সংস্থাগুলোকে সহায়তা দান করেছেন। জাতীয় এমআর সেবা ব্যবস্থা সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলোর অংশিদারিত্বের একটি অনন্য উদাহরণ।

- মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (MFSTC) এমআর সেবা প্রদান করে এবং সেবা গ্রহীতাদের প্রশিক্ষণ দেয়।
- দি রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিংস এবং এডুকেশন প্রোগ্রাম (RHSTEP) প্রাথমিক সংস্থা যা কিনা শুরুতে ১৯৭৯ সালে মেন্সট্রিয়াল রেগুলেশন ট্রেনিং এবং সার্ভিসেস প্রজেক্ট (MRTSP) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে ১৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাধ্যেমে প্রশিক্ষণ এবং সেবা দিয়ে থাকে ।
- দি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর প্রিভেশন অব সেপটিক এবরশন (BAPSA) ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংস্থাটি সরকারি এবং বেসরকারী এমআর প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এমআর তথ্য কণিকা (MR Newsletter), বর্তমান নাম Health Rights প্রকাশ করে। এরা এদের সব সেবা কেন্দ্রগুলোতে এমআর সেবা এবং ৪টি ক্লিনিকে প্রশিক্ষন দিয়ে থাকে ।
- বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (BWHC) ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; ২৪টি সেবা কেন্দ্রে এমআর সেবা এবং ৩টি ক্লিনিকে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের প্রশিক্ষণ দেয়।
- মেরী স্টোপস ক্লিনিক সোসাইটি (MSCS) সারা শহর এলাকায় একাধিক ক্লিনিকের মাধ্যমে এমআর সেবা প্রদান কারী নেতৃস্থানীয় সংস্থা।
- ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (FPAB) তাদের সেবা কেন্দ্র সমূহের মাধ্যমে এমআর সেবা দিয়ে থাকে।

মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর) এর প্রকারভেদ :

- সার্জিক্যাল মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর)
- মেডিকেল মাসিক নিয়মিতকরণ (ওষুধের মাধ্যমে এমআর)

এম আর কখন করা হয় ঃ

যে কোন কারণে প্রজনন ক্ষম নারীদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে, এম আর করা হয়

এমআর সেবা কোথায় দেওয়া যেতে পারে ঃ

সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা সরকার অনুমোদিত বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতাল/ ক্লিনিক যেখানে এমআর-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ সেবাদানকারী আছেন এবং যথাযথ ও যথেষ্ট পরিমান প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতি আছে - তারা এমআর সেবা দিতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে:

- সরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান যেমন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU), মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (MFSTC), মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (MCHTI) এবং শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (ICMH)
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সমূহ (সরকারী এবং সরকার অনুমোদিত ব্যক্তি মালিকানাধীন)
- জেলা হাসপাতাল সমূহ
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র সমূহ
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মা, শিশু ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র সমূহ
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সমূহ
- সরকার অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতাল/ ক্লিনিক
- সরকার অনুমোদিত ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতাল/ ক্লিনিক

এম আর এর ধাপসমূহ

১)	প্রথম	-	এম আর পূর্ব কাউন্সেলিং
২)	দ্বিতীয়	-	ইতিহাস গ্রহণ
৩)	তৃতীয়	-	শারীরিক পরীক্ষা
৪)	চতুর্থ	-	ল্যাবরেটরী পরীক্ষা
৫)	পঞ্চম	-	যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা
৬)	ষষ্ঠ	-	এম আর পদ্ধতি প্রয়োগ করা
৭)	সপ্তম	-	এম আর পরবর্তী কাউন্সেলিং

এম আর পূর্ব কাউন্সেলিং ঃ

- শুভেচ্ছা বিনিময় ও যোগাযোগ স্থাপন।

- কাউন্সেলিং এর জন্য একটি আলাদা রুম অথবা নিরিবিলি জায়গা দরকার। ক্লায়েন্ট রুমে ঢোকা মাত্র তার দিকে মনোযোগ দিয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করে গোপনীয়তা রক্ষার আশ্বাস দিতে হবে।
- চাহিদা নির্ণয়
- তথ্য প্রদান ও সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা প্রদান।
- সম্মতি পত্র।

ইতিহাস গ্রহণ ঃ

- মাসিক সম্পর্কিত
- গর্ভধারণ সম্পর্কিত
- প্রজনন তন্ত্রের রোগ সম্পর্কিত
- অন্যান্য রোগসমূহ ঃ
  - উচ্চ রক্তচাপ
  - হৃদরোগ
  - ডায়াবেটিস
  - জন্ডিস
  - রক্তক্ষরণ জনিত রোগ।

শারীরিক পরীক্ষা

তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় ঃ

সাধারণ পরীক্ষা ঃ

১) ওজন
২) নাড়ীর গতি
৩) শারীরিক তাপমাত্রা
৪) রক্তস্বল্পতা
৫) জন্ডিস
৬) রক্তচাপ
৭) হার্ট
৮) ফুসফুস

তলপেট পরীক্ষা

- মহিলাকে পরীক্ষা করার পূর্বে প্রস্রাব করে আসতে বলতে হবে।

- মহিলাকে চিৎ করে সামান্য একটু হাটু ভাজ করে শুইয়ে শরীরে চাদর দিয়ে ঢেকে কোমরের কাপড় নিচের দিকে সরিয়ে দিতে হবে।
- তলপেটে অস্ত্রপচারের কোন দাগ আছে কি না লক্ষ্য করতে হবে।
- তলপেটের উভয় দিকে ডান হাত দিয়ে চাপ দিয়ে মহিলা ব্যাথা অনুভব করে কি না খেয়াল করতে হবে।
- তলপেটে কোন চাকা (Mass), চাকার অবস্থান, আকৃতি ও গতিশীলতা দেখে নিতে হবে।

দুই হাতে পেলভিক পরীক্ষা (Bimanual Pelvic Examination)

এই পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ুর আকার, অবস্থান, প্রদাহ ও অন্যান্য অস্বাভাবিকতা জানা যায়।

- পেলভিক পরীক্ষার জন্য মহিলাকে লিথোটমি অবস্থায় শোয়াতে হবে।
- বাহ্যিক প্রজননতন্ত্রের (External Genital Organs) দিকে নজর দিতে হবে।
- জীবাণুমুক্ত গ্লাভস ডান ও বাম হাতে পরে নিতে হবে। গ্লাভস পরার পর জীবাণুমুক্ত নয় এমন কোন জিনিস ধরা চলবে না।
- বাহ্যিক প্রজনন অংগ পরিস্কার

স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপের সাহায্যে স্যাভলন সলিউশনে ভিজানো জীবাণুমুক্ত তুলার বল/ গজের সাহায্যে পাঁচ (৫) বার বাহ্যিক প্রজনন অংগের মধ্যস্থান থেকে বাহিরের দিকে মুছতে হবে।

জরায়ুর অবস্থান ও আকার নির্ধারণ ঃ

১) বাম হাত ক্লায়েন্টের তলপেটে, পিউবিক সিম্ফাইসিসের ঠিক উপরে রাখতে হবে এবং নীচের দিকে চাপ দিতে হবে।

২) যোনি পথে ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল প্রবেশ করাতে হবে এবং আঙ্গুলদ্বয় জরায়ু গ্রীবার সামনের দিকে রাখতে হবে এবং আস্তে আস্তে তলপেটের দিকে তুলে ধরতে হবে।

৩) যদি জরায়ুর অবস্থান এন্টিভারটেড (Ante-verted) হয় তবে দুই হাতের মধ্যস্থানে জরায়ু অনুভব করা যায়। জরায়ুর অবস্থান এন্টিভারটেড হলে জরায়ূ অনুভব করা যাবে না এই ক্ষেত্রে আঙ্গুলদ্বয় জরায়ু গ্রীবার পিছন দিকে রাখতে হবে তাতে করে আঙ্গুলদ্বয়ের পিছনের অংশ দিয়ে জরায়ু অনুভব করা যাবে।

জরায়ুর আকার ঃ

- স্বাভাবিক অবস্থা ঃ জরায়ুর আকার প্রায় ৭ সেঃমিঃ এবং জরায়ু ও জরায়ুর গ্রীবা (Cervix) শক্ত থাকে।
- ৬ সপ্তাহ গর্ভাবস্থা ঃ জরায়ুর আকার ৭-৮ সেঃমিঃ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। জরায়ু গ্রীবা নরম থাকে। জরায়ুর আকার মুরগীর ডিমের সমান হয়।
- ৮ সপ্তাহ গর্ভাবস্থা ঃ জরায়ুর আকার ৯ সেঃমিঃ এ বর্ধিত হয়। জরায়ুকে হাসের ডিমের সাথে তুলনা করা চলে।
- ১০ সপ্তাহ গর্ভাবস্থা ঃ জরায়ুর আকার ১২ সেঃমিঃ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। জরায়ুর আকার কমলালেবুর মত হয়।
- ১২ সপ্তাহ গর্ভাবস্থা ঃ জরায়ুর আকার ১২ সেঃমিঃ এ বর্ধিত হয়। জরায়ু ফান্ডাস পিউবিক সিমফাইসিসের বরাবর থাকবে।
- এডনেক্সা পরীক্ষা ও বার্থোলিন গ্রন্থির অবস্থা নির্ণয় ঃ তলপেটের উপরে হাত জরায়ুর একদিকে রাখতে হবে এবং যোনীপথের আঙ্গুলদ্বয় Lateral Vaginal Fornix এ রেখে উপরের হাত দিয়ে চাপ দিলে ডিম্বকোষ ও ডিম্বনালী অনুভব করা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালী অনুভব করা যায় না। এ্যাডনেক্সার-এ কোন অস্বাভাবিকতা থাকলে তা নির্ণয় করা যায় যেমন একটোপিক প্রেগনেন্সি, টিউমার, প্রদাহ ইত্যাদি।
- বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দুই আঙ্গুলের সাহায্যে লেবিয়া মেজোরা-এর নীচের অংশে বার্থোলিন গ্রন্থির আকার পরিবর্তন অনুভব করা যায়।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা ঃ

১। রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা

২। প্রস্রাব পরীক্ষা- সুগার ও এলবুমিন (পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রয়োজন হয়)।

এম. আর. যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা ঃ

যন্ত্রপাতিসমূহ

নিম্লোক্ত তালিকায় উল্লেখিত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি এবং সরবরাহের সঙ্গে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অবশ্যই পরিস্কার প্রবাহমান পানি ও একটি শৌচাগার থাকতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাউন্সেলিং এর জন্যে একটি আলাদা গোপনীয় স্থান বা আলাদা কক্ষ থাকা শ্রেয় তবে বাধ্যতামূলক নয়।

- সিম'স এবং/ অথবা কাসকো'স স্পেকুলাম
- ভলসেলাম/ টেনাকুলাম/ এ্যালিস ফরসেপস
- স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপস
- যথাযথ আলোর উৎস/ টর্চ
- একভাল্ব যুক্ত এমভিএ এসপিরেটর/ সিরিঞ্জ
- বিভিন্ন আকারের ক্যানুলা, এ্যাডাপটর সহ
- হেগার'স ডাইলেটর: সাইজ ৪-১০
- ধারালো Sharp কিউরেট
- কিডনি ট্রে অথবা সুবিধাজনক পাত্র সিরিঞ্জের দ্রব্যাদি খালি করে রাখার জন্য
- টিস্যুর জন্য চালনী
- ক্লোরিন দ্রবণের জন্য প্লাষ্টিকের বালতি; যন্ত্রপাতি পরিস্কার করা ও প্রক্রিয়াজাত করার জন্য আগে ভিজিয়ে রাখার জন্য
- রিসাসিটেশনের জন্য আম্বুব্যাগ/ এয়ারওয়ে টিউব, অক্সিজেন সিলিন্ডার
- সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জীবানুমুক্ত করনের জন্য যন্ত্রপাতি; অটোক্লেভ/ ফুটানোর পাত্র/ সাইডেক্স ট্রে

খ) অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ঃ

- এন্টিসেপটিক সলিউশন; পভিডন আয়োডিন/ ক্লোরহিক্সিডিন
- জীবানুমুক্ত গ্লাভস (ছোট, মাঝারি ও বড়)
- পরিস্কার টেবিলের উপর বিছানোর চাদর (থাকলে ভালো হয়)
- একবার ব্যবহার যোগ্য সিরিঞ্জ (সূঁচ সহ) প্যারাসারভাইক্যাল ব্লক ও অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের জন্য -

- ক্লোরিন দ্রবণ/ ব্লিচিং পাউডার
- সিলিকন; সিরিঞ্জ লুব্রিকেট করার জন্য, প্রয়োজন।

যন্ত্রপাতি সবসময় জীবাণুমুক্ত অবস্থায় তৈরী করে জীবাণুমুক্ত ঢাকনাযুক্ত পাত্রে রাখতে হবে। এম আর করার জন্য ক্লায়েন্ট উপযুক্ত হলে একটি জীবাণুমুক্ত ট্রেতে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে নিতে হবে এবং তাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিস রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এম. আর পদ্ধতি প্রয়োগ করা (জরায়ুর ভ্যাকুয়াম এ্যাসপিরেশন) ৪র্থ ধাপ ঃ

- এম আর ট্রেতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে কি না পুনরায় পরীক্ষা করে নিন।
- সিমস ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম (Sims Vaginal Speculum) আড়াআড়ি ভাবে ধীরে ধীরে যোনীপথে ঢুকান এবং যোনীপথের মাঝামাঝি অবস্থানে সমান্তরাল অবস্থায় আনুন। এ অবস্থায় জরায়ুর মুখ (Cervical os) দেখা যাবে। (সিমস ভ্যাজাইনাল স্পেকুলামের পরিবর্তে কাসকস স্পেকুলাম ব্যবহার করা যেতে পারে তবে সেক্ষেত্রে টেনাকুলাম ব্যবহার করতে হবে এবং টেনাকুলামের সাহায্যে ঘড়ির কাটার ১০ ও ২ টার অবস্থানে জরায়ু ধরতে হবে।
- স্যাভলনে ভিজানো জীবাণুমুক্ত তুলার বল/গজ দিয়ে জরায়ুর মুখ এবং যোনী পথের উপরিভাগ পরিস্কার করুন।
- ভলসেলামের সাহায্যে জরায়ুর গ্রীবা (Cervix) ঘড়ির কাঁটার ১২ টার অবস্থানে ধরুন এবং স্পেকুলামের সমান্তরালে টেনে ধরুন। জরায়ু গ্রীবা এবং যোনী পথে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কি না দেখুন, যেমন- রক্ত বা সাদা স্রাব, সারভাইকাল ইরোসন, একটোপিয়ন, সারভাইকাল পলিপ ইত্যাদি।
- সাউন্ডিং (Sounding) ঃ এই প্রক্রিয়ায় জরায়ুর গভীরতা নির্ণয় করা হয়। এম আর এর ক্ষেত্রে ৪ মিঃমিঃ মাপের ক্যানুলার সাহায্য সাউন্ডিং করা হয়। এটা জরায়ু মুখকে সম্প্রসারণ করতে সাহায্য করে।
- সিরিঞ্জ প্রস্তুত করুন ঃ এম আর শুরু করার আগে সম্ভব হলে দুটো সিরিঞ্জ তৈরী রাখা বাঞ্চনীয়, যেহেতু জরায়ুর ভিতরের রক্ত ও টিস্যুর পরিমাণ আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়।
- সিরিঞ্জে কোন ফাটল আছে কি না দেখে নিন।
- প্লাহ্জার ও ভালভ গুলো পরীক্ষা করুনঃ প্লাঞ্জার ব্যারেলের মুখে বসান এবং পিঞ্চ ভালভ গুলো খুলুন। প্লাঞ্জারটি পুরোপুরি ভাবে ব্যারেলের ভিতর প্রবেশ করান।
- বোতাম নীচের দিকে চাপ দিয়ে ও সামনের দিকে ঠেলে পিঞ্চভাল্ব গুলো বন্ধ করুন।
- ভাল্বগুলো ঠিকমত বন্ধ হলে টিক আওযাজ শোনা যাবে।
- ব্যারেল শক্ত করে ধরে প্লাঞ্জার পিছনের দিকে শেষ পর্যন্ত টানুন যতক্ষণ না প্লাঞ্জারের বাহুদ্বয় ব্যারেলের শেষ প্রান্ত থেকে বের হয়ে আসে। বাহুদ্বয় দুই পার্শ্বে এমনভাবে ছড়িয়ে থাকবে যাতে ব্যারেলের ভিতর ঢুকতে না পারে। এই অবস্থায় সিরিঞ্জে শূন্যতা বিরাজ করে। যদি সঠিকভাবে অবস্থান না করে তাহলে প্লাঞ্জার ব্যারেলের সামনের দিকে চলে যেতে পারে যার ফলে জরায়ু ফুটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সতর্কতা ঃ

- ক্যানুলা ও সিরিঞ্জ ভালভাবে পরীক্ষা করে নিন। কোনো ফাটল বা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার লক্ষণ থাকলে ক্যানুলা ও সিরিঞ্জ বাতিল করতে হবে।
- সার্বিক পদ্ধতিতে স্পর্শ বিহীন পন্থা (No Touch Technique) অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যে অংশ জরায়ু গহ্বরে প্রবেশ করানো হবে তা যেন কখনই স্পর্শ করা না হয়।
- ক্যানুলা একবার জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবেশ হলে, প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বের করা উচিৎ নয়, তবে যদি টিস্যু দিয়ে ক্যানুলার ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় তবে তা বের করে আর একটি জীবাণুমুক্ত ক্যানুলা ব্যবহার করতে হবে। ক্যানুলা বের করার সময় পিঞ্চভাল্ব বন্ধ করে নিতে হবে।
- সিরিঞ্জের শূন্যতা পরীক্ষা করণ ঃ পিঞ্চ ভাল্ব খুলে দিন। যদি সিরিঞ্জের ভিতর বাতাস প্রবেশের শব্দ শোনা যায় তবে বুঝতে হবে সিরিঞ্জে শূন্যতা ছিল। পুনরায় শূন্যতা তৈরী করে নিন। (পূর্বে উল্লেখিত উপায়ে)
- ক্যানুলা নির্বাচন- ছক অনুযায়ী ক্যানুলা এবং এ্যাডাপ্টার (যদি প্রয়োজন হয়) নির্বাচন করুন।

ছক

ক্যানুলার মাপ	জরায়ুর আকার
৪ মিঃ মিঃ	৫-৭ সপ্তাহ
৫ মিঃ মিঃ	৭ সপ্তাহ
৭-১২ মিঃ মিঃ	৯-১২ সপ্তাহ

- ক্যানুলা জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করান। এক হাতে ক্যানুলার শেষ প্রান্ত ও অপর হাতে সিরিঞ্জ ধরে ক্যানুলা সিরিঞ্জের সাথে সংযোগ করুন।
- ক্যানুলা জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করান যতক্ষণ না ফান্ডাস স্পর্শ করে।
- ক্যানুলা সামান্য পিছন দিকে টেনে পিঞ্চ ভালভ খুলে দিন, এর ফলে জরায়ুর অভ্যন্তরে রক্তময় টিস্যু ক্যানুলার মধ্য দিয়ে সিরিঞ্জে আসতে থাকবে।
- ক্যানুলাটি অত্যন্ত ধীরে ধীরে সামনে পিছনে করে ও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জরায়ুর ভিতরের পদার্থ খালি করতে হবে।
- সিরিঞ্জ একদিকে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরাতে হবে এবং দিক পরিবর্তন করে পুনরায় ১৮০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে প্রথম অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।

এম. আর. সম্পন্ন হওয়ার লক্ষণ/চিহ্নসমূহ ঃ

- ক্যানুলার মাধ্যমে লাল বা গোলাপী বুদ বুদ আসবে কিন্তু কোন টিস্যু আসবে না।
- ক্যানুলা খালি জরায়ুর গায়ে লাগলে এক ধরনের খস খসে ভাব অনুভব করা যাবে।
- জরায়ুর মুখ (Cervical) সংকুচিত হয়ে ক্যানুলাটি আটকে রাখবে।
- ৪.১৫ ঃ পিঞ্চ ভালভ বন্ধ করে জরায়ুর ভিতর হতে ক্যানুলা সরিয়ে নিন।

পিঞ্চ ভালভ খুলে সিরিঞ্জের ভিতরকার রক্ত ও টিস্যু একটি ছাকনিতে ঢালুন এবং অতিরিক্ত রক্ত পরিস্কার করার জন্য ছাকনিতে পানি ঢালুন।

পাত্রে পানি নিয়ে টিস্যুগুলি রাখুন এবং ভিলাই (Villi), এমনিওটিক স্যাক (Amniotic Sac) এবং ডেসিডুয়া (Decidua) আছে কি না পরীক্ষা করে দেখুন।

সতর্কতা ঃ

যদি জরায়ু হতে নিসৃত রক্ত ও টিস্যুর পরিমান জরায়ুর আকারের তুলনায় কম হয় অথবা যদি ভিলাই চিহ্নিত করা না যায় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং প্রয়োজনে জরায়ু আবার এসপিরেশন করে দেখতে হবে।

টিস্যু পরীক্ষার ফলাফল ঃ

এম আর পরবর্তী সেবা / উপদেশ বা কাউন্সেলিং করা ঃ

- এম আর সম্পন্ন হওয়ার পরেই রোগীর নাড়ীর গতি, রক্তচাপ পরীক্ষা করুন।
- রোগীকে স্বাস্থ্যসম্মত প্যাড সরবরাহ করুন এবং বিশ্রাম কক্ষে সরিয়ে নিন।
- রোগী ক্লিনিক ত্যাগের পূর্বে সুস্থ্যতা যাচাই করুন এবং রোগীর অত্যাধিক রক্তক্ষরণ বা তলপেটে ব্যথা আছে কি না দেখুন।

এম আর পরবর্তী কাউন্সেলিং :

- এম আর করার পরে কখনও কখনও ক্লায়েন্ট এর মধ্যে বিমর্ষভাব বা অপরাধ বোধ সৃষ্টি হতে পারে সুতরাং ক্লায়েন্ট এর প্রতি সহানুভূতিশীল হোন এবং মানসিক সহায়তা করুন।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করুন এবং পদ্ধতি সরবরাহ করুন।
- ঔষধ সরবরাহ করুন এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাবলী বুঝিয়ে দিন।
- এম আর এর পর সাধারণত: নিম্নলিখিত ঔষধ দেয়া হয়-

Cap. Amoxycillin (250 mg) ১টা করে ৮ ঘন্টা পর পর (৭ দিন)।

Tab. Metronidazole (400 mg) ১টা করে দিনে ৩ বার (৭ দিন)।

ব্যথানাশক বড়ি যেমন- প্যারাসিটামল, যদি ব্যথা থাকে।

আরগোমেট্রিন ট্যাবলেট- ১টা করে দিনে ৩ বার (যদি প্রয়োজন হয়)।

ক্লায়েন্টকে বলুন যে এম আর করার পর কয়েকদিন নিম্নলিখিত অসুবিধা দেখা দিতে পারে এবং এ ব্যাপারে তিনি যেন দুশ্চিন্তা না করেন যেমন :

- সামান্য রক্তস্রাব/ একেবারেই রক্তস্রাব না হওয়া
- তলপেটে সামান্য খিচ ধরা ব্যথা
- গর্ভাবস্থার লক্ষণ সমূহ, যেমন- বমি বমি ভাব, স্তনে ব্যথা
- ৪-৬ সপ্তাহ পর স্বাভাবিক মাসিক শুরু হবে।

নির্ধারিত সময়ে ফলোআপ ভিজিটে আসার প্রয়োজনীয়তা এবং পরবর্তী ২ সপ্তাহ যে সমস্ত ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে বুঝিয়ে বলুন। যেমন-

- ভারী কাজ থেকে বিরত থাকা
- সহবাস থেকে বিরত থাকা
- যোনিপথে Douch দিয়ে পরিস্কার না করা
- যোনিপথে রক্তস্রাব শুষে নেয়ার জন্য কাপড়/তুলা না ঢোকানো

এম আর এর মারাত্মক জটিলতা দেখা দিলে ক্লায়েন্ট যেন অনতিবিলম্বে ক্লিনিকে আসেন যেমন:

- প্রচুর রক্তস্রাব
- কাঁপুনিসহ জ্বর
- তলপেটে ব্যথা
- অধিক সময় গর্ভাবস্থার লক্ষণ (বমি ভাব, স্তনে ব্যথা) থাকা
- দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব

মহিলার রক্তের গ্রুপ যদি RH Negative হয় তাহলে তাকে RH Immunogobulin নেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করুন।

মহিলার টিটেনাস প্রতিষেধক নেয়া না থাকলে, ১ ডোজ টিটি দিয়ে দিন এবং পরবর্তী ডোজের তারিখ বলে দিন।

মাসিক নিয়মিতকরণ চেকলিষ্ট

ক্র.নং	যে সব বিষয় দেখতে হবে/ করতে হবে	০	১	২	৩	৪
১)	ক্লায়েন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন					
২)	মাসিক নিয়মিত করার সুবিধা অসুবিধা ক্লায়েন্টকে বুঝিয়ে বলুন					
৩)	শরীরের সামগ্রিক অবস্থা যাচাই করুন					
৪)	ক্লায়েন্টের ইতিহাস গ্রহণ করুন					
৫)	শেষ মাসিকের তারিখ জেনে নিন					
৬)	ক্লায়েন্টকে প্রস্রাব করে আসতে বলুন					
ক্লায়েন্টের শারীরিক পরীক্ষা করুন ঃ						
৭)	জীবনের অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন (Vital Signs) পরীক্ষা করুন					
৮)	হাত ধুয়ে নিন					
৯)	জীবাণুমুক্ত পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে নিন					
এম আর সিরিঞ্জ প্রস্তুত করুন ঃ						
১০)	সিরিঞ্জ ফাটা আছে কি না তা দেখুন (ফাটা সিরিঞ্জ বাদ দিন)					
১১)	প্রয়োজন হলে সিরিঞ্জে উপযোজনকারী লাগিয়ে নিন।					
১২)	প্লাঞ্জার ব্যারেলের মধ্যে প্রবেশ করানো যায় এবং পিঞ্চ ভালব খোলা এবং বন্ধ করা যায় কি না তা পরীক্ষা করে দেখুন।					
১৩)	সিরিঞ্জের সামনে ও নিচের দিকে পিঞ্চ ভালব টিপে বন্ধ করুন					
১৪)	পিঞ্চ ভালব বন্ধ করে ব্যারেল বাম হাতে ধরুন					
১৫)	ডান হাতের প্লাঞ্জারের বাহুদ্বয় টেনে নিন যাতে করে প্লাঞ্জারের ২টা পাশাদন্ধ ব্যারেল বেড়ে আটকিয়ে পড়ে।					
১৬)	প্লাঞ্জার বাহুদ্বয় ঠিকমত ব্যারেল বেড়ে প্রসারিত অবস্থায় আছে কি না দেখুন					

১৭)	প্লাঞ্জারের বাহুতে কখনও ধরবেন না।					
১৮)	সিরিঞ্জ ব্যবহারের পূর্বে সিরিঞ্জের শূন্যতা ধারণক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখুন (পিঞ্চ ভালব খুলে বাতাস সিরিঞ্জে ঢোকার শব্দ শোনা যায় কি না)					
১৯)	এম আর করার আগে আবার ১০-১৫ অনুযায়ী করুন					
২০)	হাত ধুয়ে জীবাণুমুক্ত গ্লাভস পরিধান করুন					
২১)	পি ভি পরীক্ষা করুন					
২২)	ক্লায়েন্টকে সঠিকভাবে বাছাই করুন (গর্ভ ৮ সপ্তাহের মধ্যে আছে অথবা অন্য কোন অসুবিধা নাই নিশ্চিত হোন)					
২৩)	স্যাভলন দিয়ে জরায়ুর মুখ ৩ বার পরীক্ষা করুন					
২৪)	টেনাকুলাম দ্বারা জরায়ু স্থির করুন (ঘড়ির কাটা অনুযায়ী দশটা এবং দু'টার অবস্থান)					
২৫)	উপযুক্ত ক্যানুলা বেছে নিন। (মাসিক ৫-৭ সপ্তাহ যদি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে ৫ মি:মি: ক্যানুলা ব্যবহার করুন। যদি ৭/৮ সপ্তাহ বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে ৬ মি:মি: ক্যানুলা ব্যবহার করুন)।					
২৬)	ক্যানুলা ব্যবহার করার আগে ক্যানুলার মাথা ফাটা আছে কি না তা দেখুন					
২৭)	যোনিপথের দেয়াল এবং স্পেকুলামের গায়ে না লাগিয়ে ক্যানুলাটা জরায়ুতে প্রবেশ করিয়ে দিন।					
২৮)	ক্যানুলায় প্রস্তুত করানো সিরিঞ্জ সংযোগ করুন।					
২৯)	ক্যানুলা ফান্ডাস পর্যন্ত অগ্রসর করান তারপর ক্যানুলাটি সামান্য সরিয়ে নিন					
৩০)	পিঞ্চ ভালব খুলে দিন					
৩১)	ক্যানুলা সাধানে আগ-পিছ করে এবং সিরিঞ্জ ঘুরিয়ে জরায়ূর ভিতরের পদার্থ বের করে নিন।					
এম আর সম্পূর্ণ হওয়ার চিহ্ন লক্ষণ লক্ষ্য করুন ঃ						

৩২)	ছোট ছোট বুদ বুদ (লাল ফেনা) ক্যানুলায় দেখা যাবে এবং কোন টিস্যু প্রবাহ থাকবে না।					
৩৩)	জরায়ুর খালি দেয়ালের গায়ে ক্যানুলায় কম্পন অনুভূত হবে।					
৩৪)	জরায়ু সংকুচিত হয়ে ক্যানুলার উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে কি না ক্যানুলায় হাত দিয়ে বুঝবেন					
৩৫)	ক্যানুলা বের করুন					
৩৬)	প্রয়োজন হলে কপার টি প্রয়োগ করুন					
৩৭)	টেনাকুলাম খুলে বের করুন					
৩৮)	জরায়ুর মুখের অবস্থা লক্ষ্য করুন। অতিরিক্ত রক্তপাত হলে তুলা দিয়ে জায়গাটি চেপে রাখুন।					
৩৯)	স্পেকুলাম বের করুন					
৪০)	ক্লায়েন্টকে পরিস্কার প্যাড পড়িয়ে দিন					
৪১)	গ্লাভস ডিকন্টামিনেশন করে খুলে হাত ধুয়ে নিন।					
ব্যক্তিগত উপদেশ দিন						
৪২)	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য শিক্ষা দিন					
৪৩)	মহিলাকে বলুন যে ৪/৮ সপ্তাহের মধ্যে তার মাসিক হবে					
৪৪)	১৫ দিন স্বামীর সঙ্গে সহবাস নিষেধ করে দিন					
৪৫)	একটি উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিন					
৪৬)	বের করে আনা টিস্যু পর্যবেক্ষণ করুন					
৪৭)	যন্ত্রপাতি ভালভাবে ডিকন্টামিনেশন করে পরিস্কার করুন					
৪৮)	রেজিষ্টার খাতা পূরণ করুন					

জটিলতা ও ব্যবস্থাপনা

এম আর একটি সহজ পদ্ধতি এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা সঠিক নিয়মে করলে জটিলতার সম্ভাবনা কম। প্রত্যেক সেবাদানকারীকে এম আর এর সম্ভাব্য জটিলতা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

এম আর জটিলতাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

১। **তাৎক্ষনিক জটিলতা/এম আর করার সময় যে গুলো হয়-**

- Vasovegal এ্যাটাক বা অজ্ঞান হওয়া।
- মাথা ঘুরানো এবং বমি বমি ভাব
- রক্তক্ষরণ
- জরায়ু ছিদ্র হওয়া
- জরায়ুর মুখ ছিড়ে যাওয়া

২। **দেরীতে বা পরের জটিলতা-ক্লায়েন্ট ক্লিনিক থেকে যাওয়ার পর-**

- অসম্পূর্ণ এম আর (Incomplete MR)
- সেপটিক গর্ভপাত (Septic Abortion)
- এম আর কার্যকরী না হওয়া এবং গর্ভাবস্থা বজায় থাকা (Continued Pregnancy)
- জরায়ুর অভ্যন্তরে রক্ত জমে যাওয়া (Haeuato metra)
- এম আর পরবর্তী মাসিক বন্ধ থাকা

তাৎক্ষণিক জটিলতার ব্যবস্থাপনা ঃ

১। **ক) Vasovegal এ্যাটাক বা অজ্ঞান হয়ে গেলে-**

- ক্লায়েন্টের পা উপরে তুলে মাথা নিচে করে শোয়াতে হবে।
- রক্তচাপ/নাড়ীর গতি ঘন ঘন রেকর্ড করতে হবে। যদি নাড়ীর গতি মিনিটে ৫৪ ও

নিচে রক্তচাপ সিসটোলিক ৮৫ এর নিচে হয় তবে ০.৬ মি:গ্রা: এট্রপিন ইনজেকশন শিরায় দিতে হবে।

- অজ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হলে অক্সিজেন দিতে হবে।
- আধ ঘন্টার মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে তবে ৫% ডেক্সট্রোজ স্যালাইন শিরায় দিতে হবে। মুখে কিছু খাবে না।

খ) মাথা ঘুরানো / বমি বমি ভাব-

তেমন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। বিশ্রামে ঠিক হবে।

গ) রক্তক্ষরণ-

যোনিপথে অত্যাধিক রক্তক্ষরণ হলে ক্লায়েন্ট শকে চলে যেতে পারে। রোগীনির অবস্থার উপর চিকিৎসা নির্ভরশীল।

সাধারণ ব্যবস্থাপনা ঃ

- রোগীর নাড়ীর গতি ও রক্তচাপ ঘন ঘন মাপতে হবে।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের নালী পরিস্কার আছে কি না দেখতে হবে।
- ক্লায়েন্টের পা সামান্য উঁচুতে তুলে এবং মাথা নিচে রেখে শোয়াতে হবে।
- স্যালাইন দেয়া ৫০০-১০০০ এম.এল ডেক্সট্রোজ স্যালাইন প্রতি মিনিটে ৩০ ফোঁটা হারে দিতে হবে।
- রক্ত সঞ্চালন- হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৪৫% কম হলে রক্ত দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- এন্টিবায়োটিক শিরায় কিংবা মাংসপেশীতে দিতে হবে। ০১ গ্রাম এ্যামপিসিলিন ৬ ঘন্টা পর পর অথবা ১ গ্রাম এমপিসিলিন ও ১ গ্রাম ক্লক্সাসিলিন মিশ্রিত করে ৬ ঘন্টা পর পর প্রয়োগ করতে হবে।
- শকের জীবন রক্ষাকারী ৫-১০ মি.গ্রাম Oradexon শিরায় দিতে হবে।

শকের কারণের ব্যবস্থাপনা ঃ

- জরায়ুর সঠিক আকৃতি নিরুপন করতে না পারা বা সম্পূর্ণ এম আর এর ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বড় সাইজের ক্যানুলা ব্যবহার করে পদ্ধতি সম্পন্ন করতে হবে। এম আর সম্পূর্ণ না হলে উন্নততর সুবিধাদি আছে এমন হাসপাতালে রেফার করতে হবে।
- ১/২ এম্পুল মিথাইল আরগোমেট্রিন শিরায় বা মাংসপেশীতে দিতে হবে।
- ২/৪ এম্পুল অক্সিটোসিন (পিটন এস) শিরায় দিতে হবে।
- জরায়ু ভালভাবে ম্যাসেজ করলে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

১। **ঘ) জরায়ু ছিদ্র হওয়া ঃ**

লক্ষণ ঃ

- জরায়ুর মাপ ছাড়িয়ে কোন বাধা না পেয়ে ক্যানুলা জরায়ু ভেদ করে পেলভিক ক্যাভিটিতে চলে যেতে পারে।
- ক্লায়েন্ট হঠাৎ একটি খোঁচামারা ব্যথা অনুভব করবে।

- বমি বমি ভাব ও মাথা ঘোরানো
- জরায়ুর ফুটা হওয়ার উপর নির্ভর করে রক্তক্ষরণ।
- প্রথম দিকে নাড়ীর গতি ও রক্তচাপের কোন পরিবর্তন না হলেও পরবর্তীতে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি ও রক্তচাপ বৃদ্ধি হতে পারে। জরায়ু ফুটা হওয়ার সন্দেহ হলে সাথে সাথে এম আর বন্ধ করতে হবে। ১৫-৩০ মি: পর পর জরুরী লক্ষণ গুলো দেখতে হবে এবং রেকর্ড রাখতে হবে।
- এ্যান্টিবায়োটিক ১ গ্রাম এমপিসিলিন অথবা ১ গ্রাম এমপিসিলিন +১ গ্রাম ক্লোক্সাসিলিন শিরায় প্রয়োগ করতে হবে।
- ১-২ এম্পুল মিথাইল আরগোম্ট্রিন শিরায় বা মাংসপেশীতে দিতে হবে।
- যোনিপথে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না পরীক্ষা করতে হবে।
- ৫-৬ ঘন্টার মধ্যে রোগীর অবস্থা ভাল হলে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে বিদায় করতে হবে ও ৩-৫ দিন পর হাসপাতালে রিপোর্ট করবে। আর যদি কোন অসুবিধা হয় সাথে সাথে হাসপাতালে যাবে।
- এম আর করবার পর রোগীনির জরায়ুর ফুটা নিশ্চিত হলে সাথে সাথে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

১। **ঙ) জরায়ুর মুখ ছিড়ে যাওয়া ঃ**

লক্ষণঃ

- এম আর করানোর সময় ভলসেলাম বা টেনাকুলাম স্থানচ্যুত হলে জরায়ুর মুখ ছিড়ে যায়।
- রক্তক্ষরণ হতে পারে।

ব্যবস্থাপনা ঃ

অতএব রক্তক্ষরণের ব্যবস্থাপনা দিতে হবে।

২। ক) অসম্পূর্ণ এম আর (Incomplete MR)

লক্ষণঃ

- দীর্ঘদিন রক্তক্ষরণ, স্বল্প পরিমাণ রক্তক্ষরণ অথবা হঠাৎ বেশী রক্তক্ষরণ শুরু হওয়া।
- শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে
- তলপেটে ব্যথা থাকবে
- জরায়ুর আকার স্বাভাবিকের চেয়ে বড় থাকবে।
- জরায়ুর মুখ খোলা থাকবে বা নাও থাকতে পারে।

ব্যবস্থাপনা ঃ

এন্টিবায়োটিক দেয়ার পর পুনরায় জরায়ু পরিস্কার করতে হবে। মিথাইল আরগোমোট্রিন প্রয়োগ করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

২। **খ) অসফল এম আর** (Failed MR) **এর কারণসমূহ ঃ**

- ৬ সপ্তাহের পূর্বে এম আর করা।
- সঠিক পদ্ধতিতে যদি এম আর না করা।
- একটোপিক গর্ভাবস্থায় এম আর করা।

লক্ষণঃ

- এম আর এর পর স্বাভাবিক নিয়মে মাসিক শুরু না হওয়া
- গর্ভাবস্থার লক্ষণ অব্যাহত থাকা
- বাই ম্যানুয়াল পেলভিক পরীক্ষায় জরায়ুর মাপ স্বাভাবিক থেকে বড় পাওয়া (আলট্রাসোনোগ্রামের সাহায্যে অসফল এম আর নিশ্চিত হওয়া যায়)।

ব্যবস্থাপনা (Failed M.R with continued Pregnancy)

- জরায়ুতে স্বাভাবিক গর্ভাবস্থা বজায় রয়েছে, তখন ক্লায়েন্ট ইচ্ছে করলে গর্ভাবস্থা বজায় রাখতে পারে। এই অবস্থায় বাচ্চা অস্বাভাবিক হবে বলে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।
- টিস্যু পরীক্ষায় যদি ভিলাই অনুপস্থিত থাকে এবং গর্ভাবস্থার অন্যান্য লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তখন গর্ভাবস্থা বলে সন্দেহ করতে হবে। আলট্রাসোনোগ্রাম করে নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নততর হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

২। **গ) এম আর পরবর্তী মাসিক বন্ধ থাকা ঃ**

- রোগীকে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হউন যে গর্ভাবস্থা নেই।
- মাসিক বন্ধের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। রোগীকে কাউন্সেলিং ও মানসিক সহায়তা দিতে হবে।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি দিলে সামান্য রক্তস্রাব হতে পারে, তবে অবস্থার পরিবর্তন হবে না।
- পুনরায় ডি এন্ড সি করলে ক্ষতির সম্ভাবনা। মাসিকের জন্য অপেক্ষা করতে বলতে হবে এবং ঐ অবস্থাতেও জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদি ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে।

হেমোটোমেটরা (Haaematometra)

২। ঘ) এম আর করার পর জরায়ুর মুখ জোড়া লেগে বন্ধ হয়ে যায় তবে মাসিকের রক্তস্রাব স্বাভাবিক নিয়মে তৈরী হয় ও মুখ বন্ধ থাকার ফলে জরায়ুর অভ্যন্তরে জমা থাকে।

লক্ষণসমূহ ঃ

- মাসিকের সময় খুব সামান্য রক্তক্ষরণ হয় বা নাও হতে পারে।
- তলপেটে ব্যথা অনুভূত হয় ও চাকা অনুভব হয়।
- পেলভিক পরীক্ষা জরায়ুর আকার বড় অনুভূত হয়। (আলট্রাসোনোগ্রাম করে নিশ্চিত হওয়া যাবে)

ব্যবস্থাপনা ঃ

বন্ধ হয়ে যাওয়া জরায়ুর মুখ সম্প্রসারিত করতে হবে।

সেপটিক গর্ভপাত (Septic Abortion)

অসম্পূর্ণ এম আর বা গর্ভপাতের পর জীবাণু সংক্রমণের ফলে যদি প্রদাহের সৃষ্টি হয় তবে তাকে সেপটিক গর্ভপাত বলে।

অদক্ষ সেবাপ্রদানকারী দ্বারা সঠিক পদ্ধতিতে এম আর করা না হলে যেমন-

- যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে জীবাণু মুক্ত করা না হলে।
- স্পর্শ বিহীন পদ্ধতি অবলম্বন না করলে।
- কাঠি, গাছের শিকড়, ধাতব যন্ত্র বা ক্যাথেটারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটানোর চেষ্টা করলে।
- এম আর এর যোনী পথে ডুস দিলে, রক্ত শুশে নেয়ার জন্য কাপড় বা তুলা ব্যবহার করলে।

সেপটিক গর্ভপাতের লক্ষণ ঃ

- এম আর/গর্ভপাতের সাম্প্রতিক ইতিহাস।
- জ্বর ও তলপেটে ব্যথা।
- দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব/ রক্তস্রাব
- বমি ভাব, খাওয়ার অরুচি, মাথাব্যথা।

রোগীকে পরীক্ষা করলে- লক্ষণ/চিহ্ন সমূহ ঃ

- রোগীর মুখমন্ডলে অস্থিরতা।
- জিহ্বার উপর পাতলা আবরণ থাকবে।
- শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে।

- নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হবে।
- তলপেট ফুলে যাবে ও পেটে শক্ত চাকা অনুভূত হবে। পেটে চাপ দিলে তীব্র ব্যথা বোধ করবে।
- যোনীপথে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ যায় ও রক্ত মিশ্রিত স্রাব দেখা যাবে।
- সেপটিক গর্ভপাত সন্দেহ হলে রোগীকে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রেফার করতে হবে।

জটিলতা এড়ানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিৎ তা হচ্ছে ঃ

- ক্লায়েন্টকে সঠিকভাবে কাউন্সেলিং করুন।
- আপনার হাত ভালভাবে ধুয়ে নিন।
- সকল যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করুন।
- শুধু মাত্র জীবাণুমুক্ত সরবরাহ ব্যবহার করুন।
- বিরুদ্ধ ইঙ্গিত (Contra-indication) আছে এমন মহিলার এম আর করবেন না।
- মহিলার মূত্রথলি খালি আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।
- সর্বপর্যায়ে জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
- ধীরে ধীরে সঠিক পদক্ষেপ অনুসরণ করে এম আর করুন।

৪। জটিলতা প্রতিরোধের উপায়, চিকিৎসা করা ঃ

জটিলতা	প্রতিরোধের উপায়	চিকিৎসা	রেফার করা
- জরায়ুর ছিদ্র হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তলপেটে মারাত্মক ব্যথা এবং শক এর লক্ষণ হতে পারে।	- পরিপূর্ণ ইতিহাস গ্রহণ - পরিপূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা - পুরো পদ্ধতি সাবধানতার সাথে করা	- পায়ের দিক উচু করে রেখে উন্নতি/অবনতি লক্ষ্য করুন - মুখে কিছু দেবেন না - শিরায় স্যালাইন দিন যদি থাকে।	- সাথে সাথে জেলা হাসপাতালে রেফার
- রক্তক্ষরণ বা অনিয়মিত রক্তপাত	- পরিপূর্ণ ইতিহাস গ্রহণ - পরিপূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করা এবং পুরো পদ্ধতি সাবধানতার সাথে করা	- মেথারজিন ০.৫ মি: গ্রাম বড়ি ৩ বার ৩ দিন - আয়রণ ও ফলিক এসিড ট্যাবলেট	- রক্তক্ষরণ বেশী হলে রেফার
- ইনফেকশন	- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার - জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি	- ২৫০ মি: গ্রাম এমপিসিলিন ক্যাপসুল ৬ ঘন্টা পর পর ৫-৭ দিন	- যদি মারাত্মক হয় বা চিকিৎসায় উন্নতি দেখা না যায় তবে রেফার

	প্রয়োগ		
- ধনুষ্টংকার	- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার - জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ	- ১০ মিঃ গ্রাঃ ডায়াজিপাম বড়ি এবং ১০ লাখ ইউনিটের ক্রিষ্টালাইন পেনিসিলিন মাংসপেশীতে	- সাথে সাথে জেলা হাসপাতালে অথবা সংক্রামক রোগ হাসপাতালে রেফার
- তলপেটে ব্যথা	- পুরো পদ্ধতি সাবধানতার সাথে করা	- ৫০০ মিঃ গ্রাম প্যারাসিটামল বড়ি	- সাধারণত প্রয়োজন হয় না। যদি এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যথা না কমে তাহলে রেফার করতে হবে।

ওষুধের মাধ্যমে মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর)

ওষুধের মাধ্যমে মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর) করা যেতে পারে। এমআর করার জন্য যে সকল ওষুধ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হলো ট্যাবলেট মিফেপ্রিষ্টোন (Mifepristone) এবং ট্যাবলেট মিসোপ্রোষ্টল (Misoprotol)-এর সংমিশ্রণ । এই দু'টো ওষুধ-এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে যখন এম আর করা হয়, তখন তাকে "ওষুধের মাধ্যমে মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর)" বলা হয়ে থাকে।

কখন করা যেতে পারে ঃ

মাসিক বন্ধের ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত ট্যাবলেট মিফেপ্রিষ্টোন এবং ট্যাবলেট মিসোপ্রোষ্টল-এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে এমআর করা যেতে পারে।

কখন করা যাবে না ঃ

- কোন ওষুধে যদি এলার্জী হবার অতীত ইতিহাস থাকে
- দীর্ঘদিন ধরে কোন ষ্টেরয়েড ব্যবহার
- Porphyria
- হাঁপানী
- মারাত্মক রক্ত স্বল্পতা
- ইকটোপিক প্রেগনেন্সি অথবা ইকটোপিক প্রেগনেন্সি-র সন্দেহ করা
- হৃদরোগ

যেভাবে এ দু'টো ওষুধের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয় ঃ

গত মাসিকের সময়	ট্যাবলেট মিফেপ্রিস্টোন-এর মাত্রা	ট্যাবলেট মিসোপ্রোষ্টল-এর মাত্রা
মাসিক বন্ধের ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত	২০০ মিঃ গ্রাঃ (১টি ট্যাবলেট) মুখে, এক মাত্রা	ট্যবলেট মিফেপ্রিষ্টোন খাওয়ার ২৪ ঘন্টা পরে, ট্যবলেট মিসোপ্রোষ্টল ৮০০ মাইক্রোগ্রাম। ৪টি ট্যবলেট, প্রতিটি ২০০ মাইক্রোগাম করে) জিহ্বার নীচে বা যোনীপথে প্রয়োগ করতে হবে, এক মাত্রা

ওষুধের মাধ্যমে এমআর এর ক্ষেত্রে যা খেয়াল রাখতে হবে-

ওষুধের মাধ্যমে এমআর-এর ক্ষেত্রে খুবই উচুঁমানের ক্লিনিক্যাল যাচাই-বাছাই, দক্ষতা ও ফলো আপ এর প্রয়োজন হয়। ইতিহাস গ্রহণের সময় যদি কোন শারিরীক বা মেডিক্যাল সমস্যা দেখা যায়, তবে পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কোন প্রশিক্ষিত ডাক্তার অথবা কোন উচ্চতর সেবা প্রদান কেন্দ্রে মহিলাটিকে রেফার করতে হবে।

- **যদি আই ইউ ডি পরিহিত অবস্থায় থাকে ঃ**

- ইকটোপিক প্রেগনেন্সি আছে কিনা তা ভালোভাবে দেখুন। যদি না থাকে, তবে আই ইউ ডি খুলে ফেলন এবং এর পরে এমআর-এর জন্য ওষুধ প্রয়োগ করুন।

- যদি মারাত্মক অনিয়ন্ত্রিত হাঁপানি কিংবা দীর্ঘদিন ধরে করটিকোষ্টেরয়েড থেরাপী ব্যবহার এর ক্ষেত্রে ঃ

- ষ্টেরয়েড গ্রহণকারী মহিলাদের বেলায় ট্যাবলেট মিফেপ্রিষ্টোন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোন প্রামাণিক তথ্য নেই।

- নিরাপদ এমআর-এর যদি কোন বিকল্প না থাকে তবে ক্লিনিক্যাল যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

- স্টেরয়েড-এর মাত্রা ৩-৪ দিনের জন্য বাড়িয়ে দিতে হবে এবং মহিলাটিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

- অবস্থা (যেমন-স্বল্প নিয়ন্ত্রিত হাঁপানী) এর ক্ষেত্রে খারাপ হতে পারে।

- হৃদরোগ, মারাত্মক রক্তস্বল্পতা এবং রক্তপাত জনিত সমস্যা থাকলে ঃ

- হৃদরোগ, মারাত্মক রক্তস্বল্পতা এবং রক্তপাতজনিত সমস্যায় আক্রান্ত মহিলাদের বেলায় ট্যবলেট মিফেপ্রিষ্টোন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোন প্রামাণিক তথ্য নেই।

- **ইকটোপিক প্রেগনেন্সি থাকলে ঃ**

মহিলা যারা গর্ভবতী (এবং যদি তাদের ইকটোপিক প্রেগনেন্সি, টিউবেকটমী বা আই ইউ ডি গ্রহণের ইতিহাস থাকে), তাহলে তাদের ইকটোপিক প্রেগনেন্সি হবার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

- তাই সেবা প্রদান কারীকে এমআর-এর জন্য ওষুধ প্রয়োগ করবার পূর্বে খুব সুচারুরূপে ইকটোপিক প্রেগনেন্সি হবার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- তাই সেবা প্রদানকারীকে এমআর-এর জন্য ওষুধ প্রয়োগ করবার পূর্বে খুব সুচারুরূপে ইকটোপিক প্রেগনেন্সির পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই সমূহ করে নিতে হবে।

বিশেষ বিবেচনার অবস্থা সমূহ ঃ

নিম্নোক্ত অবস্থার মহিলাদের বেলায় মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর)-এর জন্য ওষুধ দেয়া যেতে পারেঃ

- কিশোরী / তরুণী মহিলাঃ

- কিশোরীদের বেলায় ওষুধ দিয়ে এমআর করা নিরাপদ ও কার্যকরী (Phelps 2001)
- ওষুধ দিয়ে এমআর করা সে সকল মহিলাদের জন্য অনেক বেশী কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে যারা কোনদিন সন্তান জন্ম দেয়নি (Chien 2009; Le Febvre 2008)
- ওষুধ প্রয়োগ করে এমআর করার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মহিলাদের বয়স বেশী, পূর্ববর্তী স্বাভাবিক গর্ভপাত এবং সন্তান জন্মদানের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলাদের যোগসূত্র আছে বলে দেখা যায় (Halimov-Kochman 2007)

- এইচ আই ভি ও এইডস ঃ

- এইচ আই ভি ও এইডস-এ আক্রান্ত মহিলাদের বেলায় ওষুধ প্রয়োগে এমআর করা যেতে পারে।

- এইচ আই ভি ও এইডস-এ আক্রান্ত মহিলাগণ রক্তস্বল্পতার ঝুঁকিতে থাকে, বিশেষ করে যদি তারা ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে কিংবা কোন এন্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপী গ্রহণ করে (Gangopadhyay 2011)
- যদি কোন মহিলার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত রক্তপাত হয়, তবে খুব তাড়াতাড়ি ভ্যাকিউম এ্যাসপিরেশন করতে হবে।

- যৌনবাহিত রোগ ঃ

- ওষুধ ব্যবহার করে এমআর করতে আসা কোন মহিলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যদি যৌনবাহিত রোগ পাওয়া যায়, তাহলে তাকে সেই দিন থেকেই যৌনবাহিত রোগের চিকিৎসা করাতে হবে যেদিন থেকে সে ট্যাবলেট মিফেপ্রিষ্টোন শুরু করবে (Davies & Easterling 2009 and Achilles & Reeves 2011)

- স্থুলতা ঃ

- ট্যাবলেট মিফেপ্রিষ্টোন এবং ট্যাবলেট মিসোপ্রোষ্টল প্রয়োগে কার্যকারীতার ক্ষেত্রে স্থুলকায় ও অ-স্থুলকায় মহিলাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (Strafford 2009)
- সুতরাং ট্যাবলেট মিফেপ্রিষ্টোন বা ট্যাবলেট মিসোপ্রোষ্ট্রল-এর মাত্রা সমন্বয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

- বুকের দুধ খাওয়ানো অবস্থায় ঃ

- স্তনদানকারী মহিলাদের ওষুধ প্রয়োগে এমআর করা যেতে পারে।
- মিসোপ্রোষ্টল প্রয়োগের পর বাচ্চাদের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।
- যে সকল মহিলা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন তারা ওষুধ প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্বেই বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে অথবা ওষুধ গ্রহণ শেষ হবার পর থেকে ৪-৫ ঘন্টা অপেক্ষা করে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে। (Vogel 2004; Abdel-Aleem 2003; and Saav 2010)

- হেপাটাইটিস ঃ
  - মিফেপ্রিষ্টোন বা মিসোপ্রোষ্ট্রল ব্যবহার করে হেপাটাইটিস রোগীর এমআর করার ক্ষেত্রে কোন পরিস্কার প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে তা নির্ভর করবে ক্ষতিগ্রস্থ লিভারের অবস্থার উপর যখন সেবা প্রদানকারী তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন।

সূত্র :

1. Bangladesh National Service Delivery Guideline on Menstrual Regulation with Medication (MRM), MCH-Services Unit, Directorate General of Family Planning, Ministry of Health and Family welfare.

২. মাসিক নিয়মিতকরণ সেবার জাতীয় নির্দেশনা-বাংলাদেশ, এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ডিসেম্বর ২০১৩।

পাঠ-৪১

মেনোপজ ও এর ব্যবস্থাপনা

মেনোপজ কি?

মেনোপজ নারী জীবনের একটি অবশ্যম্ভাবী অধ্যায়। এটি তার যৌন জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং মাসিক সম্পর্কিত। আমাদের দেশে মেয়েদের স্বাভাবিকভাবে মাসিক শুরু হয় ১৫ বছর বয়স থেকে এবং শেষ হয় ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে। তবে এর ব্যতিক্রম ও হতে পারে। এর শুরু এবং শেষ হতে পার যথাক্রমে ১২ এবং ৫৪ বছর বয়সে। এ হিসেবে আমাদের দেশের মেয়েদের মাসিক শেষের গড় বয়স বর্তমানে ধরা হচ্ছে ৪৯ বছর। এই মাসিক মেয়েদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ এটাই মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির কাল। এর আগে অথবা পরে গর্ভে সন্তান ধারণ মেয়েদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। প্রথম মাসিক শুরু হওয়াকে রজঃপ্রারম্ভ বা মেনার্কি বলে। আর রজঃশেষ অর্থাৎ ঋতুস্রাবের সমাপ্তিকে "মেনোপজ" বলে।

মেনোপজের আগে মাসিক অনিয়মিত হয়ে পড়ে, স্রাবের পরিমাণ কমবেশী হতে পারে। এক বছর মাসিক না হলে বুঝতে হবে মেনোপজ হয়েছে। এ সময়ের পর মহিলা আর সন্তান জন্মদানে সক্ষম থাকেন না।

মেনোপজ এর প্রক্রিয়া এবং উপসর্গ দুটি প্রক্রিয়ায় ঘটতে পারে ঃ

১। পরিবর্তন মুলক প্রক্রিয়া।

২। হঠাৎ করে।

পরিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া এবং উপসর্গ

এই প্রক্রিয়া ১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়কালে শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হয়। এই উপসর্গগুলো ক্লাইমেটরিক উপসর্গ নামে পরিচিত। এগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১। অতিরিক্ত অথবা স্বল্প রক্তস্রাব

২। অনিয়মিত মাসিক

৩। মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা।

এগুলো মাসিক কালীন উপসর্গ। এছাড়াও অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ঃ

১। অতিরিক্ত গরম লাগা

২। স্তনে ব্যথা

৩। হাতে পায়ে বুকে জ্বালাপোড়া

৪। নিদ্রাহীনতা

৫। পেটে ব্যথা

৬। সারা শরীরে ব্যথা

৭। মাথা ব্যথা

৮। মাথা ঘোরা

৯। সহবাসে ব্যথা

১০। জরায়ুতে জ্বালাপোড়া।

মেনোপজজনিত দৈহিক পরিবর্তন এবং জটিলতা ঃ

মেনোপজের কালে কিছু দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। এ সময় মহিলাদের দেহের গঠনের পরিবর্তন ও কমনীয়তা কিছুটা নষ্ট হতে থাকে। চেহারায় রুক্ষভাব সৃষ্টি হয়। কোমর ও কাঁধ মোটা হয়। স্তনের আকার ছোট হতে থাকে। মুখমন্ডলে সামান্য চুল গজাতে পারে। শরীর, ত্বক ও খসখসে হয়। শরীরের ওজন বাড়তে পারে। ক্ষুধা ও খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়।

কিছু বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে কিছু ক্ষণস্থায়ী এবং কিছু দীর্ঘস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী জটিলতা তিন ধরণের হতে পারে।

১. ভেসোমোটর (Vasomotor) ঃ এ পর্যায়ে শরীরে ঘাম হয়, বুক ধরপড় করে, যখন-তখন মাথা ব্যথা করে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় ইত্যাদি।
২. মানসিক (Psychological) ঃ এ পর্যায়ে মেজাজ খিটখিটে হয়, হঠাৎ করে রেগে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, স্মৃতিশক্তি কমে যায়, মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল বোধ হয়, যৌন ইচ্ছা কমে যায় ইত্যাদি।
৩. মূত্র ও জননতন্ত্র সম্পর্কিতঃ এ পর্যায়ে যোনিপথ শুকিয়ে যায়, সহবাসে ব্যথা লাগে, প্রস্রাবের সময় জ্বালা অনুভূত হয়, ঘনঘন প্রস্রাব হয়, প্রস্রাব লাগলে বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না, কখনো কখনো ফোঁট ফোঁটা প্রস্রাব হতে থাকে।

মেনোপজের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা ঃ

১. অষ্টিওপোরোসিস বা অস্থির ভঙ্গুরতা

মেনোপজ চিকিৎসা

মেনোপজের জটিলতা ক্ষণস্থায়ী হোক আর দীর্ঘস্থায়ী হোক, এর জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, যদিও তা বিভিন্ন ধরনের। এই বিভিন্ন ধরনকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. মেডিকেল চিকিৎসা
২. সাধারণ চিকিৎসা।

১। মেডিকেল চিকিৎসা ঃ

রোগীর শরীরে গরম অনুভুত বেশী হলে অথবা বেশী জ্বালাপোড়া হলে স্বল্পমাত্রায় ঘুমের বড়ি দেয়া যেতে পারে। কোন কোন উপসর্গ নিরাময়ে ব্যবস্থ্পনার জন্য মেনোপজ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে রোগীকে রেফার করতে হবে।

২। সাধারণ চিকিৎসা ঃ

মহিলাদের মেনোপজকালে শরীরের বিভিন্ন ক্ষয়সাধন ও বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি হতে থাকে। এর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি জাতীয় উপাদানের ঘাটতিই বেশী হতে থাকে। তাই ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন- দুধ, দই, মাছ, সীম জাতীয় খাবার ইত্যাদি বেশী খাওয়া এবং নিয়মিত হাঁটা, ব্যায়াম করা ও শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। একই সঙ্গে দেহের সার্বিক সুস্থতার জন্য অন্যান্য উপাদান গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া নিয়মিত ব্যয়ামের মাধ্যমে অনেক উপকার পাওয়া যায়। জননেন্দ্রিয় জনিত সমস্যার জন্য এ সময় অনেক মহিলা যৌন আচরণ তথা যৌন সহবাসে ভীত হন। এটা ক্ষতিকর। কারণ এর ফলে এ জাতীয় সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকে। তাই মেনোপজকালে স্বাভাবিক যৌন আচরণ অব্যাহত রাখা উচিৎ। সবচেয়ে বড় যে চিকিৎসা প্রয়োজন, তা হচ্ছে মানসিক। মেনোপজ হলে অনেক মহিলা বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হন। তারা মনে করেন, তাদের যৌবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং নারী হিসাবে তার সব বৈশিষ্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্বামীর ভালবাসা কমে যাবে। অনেকে এটাকে একটি রোগ ব্যাধি বলে মনে করেন। অথবা এ থেকে শরীরে মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টির আশংকা বোধ করেন। এ ধরনের মানসিক চিন্তা অবশ্যই ক্ষতিকর। এ ধরনের ধারণা ও চিন্তা মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক। তাই এ চিন্তা পরিহার করা উচিত। মনে রাখা উচিত, মেনোপজ নারী জীবনের একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। একজন স্বাভাবিক বয়সপ্রাপ্ত নারীর জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাল এই সময়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মেনোপজ হলে যে স্বামীর ভালোবাসা কমে যাবে, এ ধারণা ঠিক নহে। বরং উল্টোটা হয়। কারণ মেনোপজ জনিত চিকিৎসা ও সাবধানতার ফলে শরীরের লাবণ্য ও ঔজ্জল্য বাড়ে। গর্ভধারনের সম্ভাবনা না থাকায় যৌন সহবাসে তৃপ্তি বাড়ে। অবশ্য মেনোপজের

প্রথম দিকে যৌন মিলনকালে গর্ভ নিরোধক ব্যবহার করা উচিত। কারণ এ সময় অর্থাৎ যতদিন মাসিক চলতে থাকে, সে সময় গর্ভধারণ হতে পারে। সে যাই হোক, এটা সব সময় মনে রাখা উচিত যে, মেনোপজ নারী জীবনের একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কোনক্রমেই এটি কোন রকম রোগ বা ব্যাধি নয়। তাই এতে ভীতির কিছু নেই। কিছু কিছু যে দৈহিক বা শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, চিকিৎসার মাধ্যমে তার উপশম হয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে, এ থেকে যে প্রধান ব্যাধি সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে মানসিক। এ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে পারলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

পাঠ-৪২

জরায়ু মুখের ক্যান্সার (Cervical Cancer)

বাংলাদেশে ক্যানসার আক্রান্ত মহিলাদের শতকরা ৩০ ভাগই হচ্ছে জরায়ু মুখের ক্যান্সার। ৩০ বৎসর এবং তদুর্ধ মহিলাদের নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জরায়ুমুখ পরীক্ষা করে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। জরায়ু মুখের ক্যানসার হতে ১০-১৫ বৎসর সময় লাগে। ফলে নিয়মিত পরীক্ষা করে প্রাথমিক অবস্থা চিহ্নিত করা হলে পুরোপুরি ভাল হয়ে যায়।

জরায়ু মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ ঃ

- মাসিকের রাস্তা দিয়ে অনিয়মিত রক্তক্ষরণ
- মাসিক পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবার পর পুনরায় মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্ত যাওয়া
- স্বামী সহবাসে রক্তক্ষরণ
- মাসিকের রাস্তা দিয়ে পানির মতো সাদা, ঘন অথবা ময়লা বাদামি রংয়ের গন্ধযুক্ত স্রাব
- তলপেটে ব্যথা

জরায়ু মুখ পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া ঃ

- জরায়ু মুখ স্পেকুলামের সাহায্যে ভালভাবে উন্মুক্ত করতে হবে
- ৫% এসিটিক এসিড লাগিয়ে খালি চোখে জরায়ু মুখ দেখতে হবে
- অস্বাভাবিক কোষগুলো এসিটিক এসিড-এর সংস্পর্শে সাদা হয়ে যাবে
- এসিটো-হোয়াইটনেসের গাঢ়ত্ব দেখে ক্যান্সারের পুর্ববর্তী অবস্থা ধারণা করা যাবে

কাদের জরায়ু মুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশী ঃ

- যে সকল মহিলারা অল্প বয়সে বিয়ে করে থাকেন।
- অল্প বয়সে যারা যৌন বা রতিক্রিয়া (Sexual activities) শুরু করেন।
- যে সকল মহিলা ঘন ঘন সন্তানের জন্ম দেন।
- যে সকল মহিলা নিরাপদ যৌন মিলন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নন
- নিজের অথবা স্বামীর একাধিক বিয়ে
- যে সকল মহিলা যৌন রোগে (Sexual transmitted diseases) ভুগে থাকেন। বিশেষ করে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (Human Papilloma Virus) এ আক্রান্ত মহিলা পরবর্তীতে জরায়ু মুখের ক্যান্সারে বেশী ভুগে থাকেন।

- নিম্ন আর্থ সামাজিক অবস্থানের মহিলারা জরায়ুর মুখের ক্যান্সারে বেশী ভুগে থাকেন।

প্রতিরোধ

বেশীর ভাগ মহিলারাই অনেক দেরীতে চিকিৎসা নিতে আসেন যখন ক্যান্সার জরায়ু মুখ ছাড়াও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা গেলে এই ক্যান্সারের ভাল চিকিৎসা করা যায় এবং রোগী দীর্ঘ দিন ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে। দেরীতে ধরা পড়লে এই রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই তা শরীরের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার সময় সংক্ষিপ্ত করে দেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে কিভাবে এ ক্যান্সার নির্ণয় করা যায় ঃ

খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত একটি পরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রাথমিক পর্যায়েই এ ক্যান্সারটি সনাক্ত করতে পারেন। পরীক্ষাটির নাম ভায়া বা ভিসুয়াল ইনস্‌পেকশন অব সার্ভিক্স উইথ এসিটিক এসিড (Visual Inspection of Cervix with Acetic Acid)

VIA (ভায়া) কি ?

এ পদ্ধতিতে প্রথমে জরায়ু মুখ স্পেকুলামের সাহায্যে খালি চোখে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। অত:পর তুলার সাহায্যে জরায়ুর মুখে ৫% এসিটিক এসিড লাগানো হয়। ১ মিনিট অপেক্ষা করে কি পরিবর্তন হলো তা পর্যবেক্ষণ করা হয় ও পূর্বের পর্যবেক্ষণের তুলনায় একটু উঁচু সাদা প্লেক (Acetowhite epithelium) দেখা দিলে তার টেষ্ট পজিটিভ বা ভায়া পজিটিভ বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা রোগীকে উচ্চতর কেন্দ্রে রেফার করে থাকি। অনেক ক্ষেত্রে খালি চোখেই ফুলকপির মত (Cauliflower) বা অনিয়মিত (Irregular) চাকা বা ঘা দেখা যায় যা সাধারণতঃ ক্যান্সার হয়ে থাকে। ভায়া পরীক্ষায় যে সকল মহিলাদের জরায়ু মসৃণ, গোলাপী ও নিয়মিত (Regular) হয়ে থাকে তাকে 'ভায়া নেগেটিভ' বলা হয়ে থাকে। ভায়া নেগেটিভ হলেও প্রতিটি মহিলাকে প্রতি বছর অন্তর অন্তর ১ বার ফলোআপে আসতে বলতে হবে। ৩০ বছর এর উর্ধ্বে সকল মহিলার ভায়া পরীক্ষা করানো উচিত।

কোথায় ভায়া পরীক্ষা হয় ঃ

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে (MCWC), জেলা হাসপাতালে (District Hospital), সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (BSMMU)

পাঠ-৪৩

স্তন ক্যান্সার (Breast Cancer)

বাংলাদেশে জরায়ু মুখের ক্যান্সারের পরই অন্যতম দ্বিতীয় ক্যান্সার হলো স্তন ক্যান্সার।

কাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশী ঃ

- যে কোন বয়সের মহিলারই স্তন ক্যান্সার হতে পারে। তবে মেনোপজের (Menopause) পর সাধারণত স্তন ক্যান্সার বেশী দেখা যায়।
- সাধারণত পারিবারিক ইতিহাস বা পরিবারে মা, খালা, বা বোনের স্তন ক্যান্সার থাকলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশী থাকে।
- নি:সন্তান বা যারা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান না তাদের স্তন ক্যান্সার হবার ঝুঁকি বেশী থাকে।
- মহিলা অতিরিক্ত মোটা হলে

স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ ঃ

- স্তনে চাকা
- স্তনে ব্যথা
- স্তনে ক্ষত বা ঘা
- স্তনে বোঁটা দিয়ে পুঁজ বা রক্তাক্ত তরল নিঃসরণ

প্রতিরোধ ঃ

খুব সহজে এবং নিজে নিজেই করা যায়। SBE (Self Breast Examination) দ্বারা স্তন ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় সনাক্ত করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় স্তন ক্যান্সার সনাক্ত করা গেলে এবং চিকিৎসা করলে খুব সহজেই আরোগ্য লাভ করা যায় এবং ক্যান্সার থেকে মৃত্যু হ্রাস করা যায়। কিন্তু এই পরীক্ষা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় বেশীর ভাগ স্তন ক্যান্সার অনেক দেরীতে সনাক্ত হয় এবং যখন তারা চিকিৎসা নিতে আসেন তখন চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে যায় এবং ক্যান্সারও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন উপযুক্ত চিকিৎসার পরও রোগীকে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

কিভাবে স্তন পরীক্ষা করা হয় ?

স্বাস্থ্যকর্মী (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার, এফডব্লিউভি বা কমিউনিটি প্যারামেডিক) যখন স্তন পরীক্ষা করেন তখন তাকে CBE (Clinical Breast Examination) বলে।

কোথায় (CBE) করানো যায় ঃ

- মাও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে (MCWC)
- জেলা হাসপাতালে (District Hospital)
- মেডিলে কলেজ হাসপাতালে (Medical College Hospital)
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ে (BSMMU)

এ ছাড়া মহিলারা নিজে নিজেও স্তন পরীক্ষা করতে পারেন, একে Self Breast Examination বলা হয়।

Clinical Breast Examination (CBE) এর পদ্ধতি ঃ

স্তন পরীক্ষার জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় এমন একটা কক্ষের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে এবং কেন এই পরীক্ষা করছেন তা ক্লায়েন্টকে/রোগীকে বুঝিয়ে বলুন এবং তার অনুমতি নিয়ে নিন। পরীক্ষা করার টেবিলের প্রান্তে তাকে কোমর পর্যন্ত কাপড় নামিয়ে দুপাশে হাত ঝুলিয়ে বসতে বলুন। এবার স্তন পর্যবেক্ষণ করুন। পর্যবেক্ষণের সময় নিম্নোক্ত জিনিসগুলো খেয়াল করুন।

- স্তনের আকার ও আকৃতি এবং দুটি স্তনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা লক্ষ্য করুন।
- স্তনের উপরিভাগের চামড়া লক্ষ্য করুন। কোন কুচকানো চাকা, বা রং-এর কোন পার্থক্য আছে কিনা লক্ষ্য করুন।
- নিপল (Nipple) বা স্তনবৃন্ত দুটি খেয়াল করুন। এর আকার-আকৃতি বা কোন ঘা বা কোন রস (Discharge) নি:সৃত হচ্ছে কিনা তা খেয়াল করুন।

এবার ক্লায়েন্ট/রোগীকে প্রথমে দু'হাত মাথার উপরে সোজা করে তুলতে বলুন এবং পরে হাত দু'টো নামিয়ে শরীরে দু'পাশে কোমর চেপে ধরতে বলুন। দু'টি অবস্থায় উপরে উল্লেখিত জিনিসগুলো পর্যবেক্ষণ করুন।

হাত দিয়ে অনুভব করা (Palpation) ঃ

এবার ক্লায়েন্ট/রোগীকে টেবিলের উপর চিৎ হয়ে শুতে বলুন। তার কাঁধের নীচে একটি বালিশ দেন এবং বাম স্তনটি পরীক্ষা করার জন্য বা হাতকে তার মাথার নীচে ভাঁজ করে রাখতে বলুন এবং ডান স্তনটি পরীক্ষা করার সময় ডান হাতটি মাথার নীচে ভাঁজ করে রাখতে বলুন। পরীক্ষার সময় অন্য স্তনটি পরিস্কার কাপড়ে ঢেকে রাখবেন। আপনার হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার প্রান্ত দিয়ে বগলের (axilla) সংলগ্ন স্তনের অংশ হতে সর্পিলাকারে ধীরে ধীরে এরিওলা (areola) পর্যন্ত চাপ দিয়ে অনুভব করতে থাকুন। এমনভাবে চাপ প্রদান করবেন যেন ক্লায়েন্ট/রোগী ব্যথা না পায় কিন্তু স্তনের টিস্যু বুকের পাঁজরের হাড়ে গিয়ে লাগে। চাপ

প্রয়োগের সময় ক্লায়েন্ট/রোগীর মুখের দিকে লক্ষ্য রাখুন তার অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হয় কিনা বা সে ব্যথা পায় কি না। হাতের নীচে কোন চাকা অনুভূত হয় কিনা তা দেখুন। কোন চাকা অনুভূত হলে তার আকার -আকৃতি ও তা নড়াচড়া করে কিনা তা পরীক্ষা করুন। এবার তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে আস্তে আস্তে নিপল বা স্তনবৃন্তে চাপ প্রয়োগ (squeeze) করুন। দেখুন কোন রস (discharge) নিঃসৃত হয় কিনা। একইভাবে অন্য স্তনটি ও পরীক্ষা করুন। এবার ক্লায়েন্ট/রোগীকে উঠে বসতে বলুন এবং বাম হাতটি কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম স্তনের বগল সংলগ্ন (Axillary tail of breast) স্তন পূর্বেও মতো করে palpate করুন এবং আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে বগল পরীক্ষা করে দেখুন কোন লসিকাগ্রন্থি (Lymph node) ফোলা কিনা, ফোলা হলে তার আকার, আকৃতি নড়চড়া খেয়াল করুন। পরীক্ষা করার সময় ক্লায়েন্ট/রোগী ব্যথা পাচ্ছে (Tenderness) কিনা তা খেয়াল করুন।

সব শেষে টেবিল থেকে নেমে রোগীকে সামনের দিকে হাত রেখে মেঝে সমান্তরাল অবস্থায় থাকতে বলুন। এসময় আপনি রোগীর সামনে দাড়িয়ে মেঝের সমান্তরালে বিস্তৃত রোগীর হাতটা ধরে রাখবেন। এ অবস্থায় স্তনের আকার আকৃতি লক্ষ্য করুন। আপনার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবার রোগীকে কাপড় পরতে বলুন ও ধন্যবাদ দিন। আপনার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করুন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করুন। ক্লায়েন্ট/রোগীকে পরীক্ষার ফল সম্পর্কে বলুন। সব কিছু স্বাভাবিক থাকলে তাকে আবার ১ বছর পর ফলোআপে আসতে বলুন। সন্দেহজনক কিছু পেলে তাকে উচ্চতর কেন্দ্রে রেফার করুন।

তথ্যসুত্র :

১. পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ সেপ্টেম্বর ২০১৪

২. জন্মনিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়াল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, জুলাই, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড পপুলেশন এন্ড হেলথ প্রোগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ, জুলাই ২০০০

৩. পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ সেপ্টেম্বর ২০০৭

৪. আইইউডি সংক্রমণ প্রতিরোধ কাউন্সেলিং প্রশিক্ষক ম্যানুয়াল, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৭

৫. ইমপ্ল্যানন প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, সিসিএসডিপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৯

৬. এমআর, গর্ভাপাত পরবর্তী সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা-বিসিসি সয়ায়িকা (মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য ফ্লিপ চার্ট)

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় ও আইপাস বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৪

অধ্যায় ২ ঃ জেন্ডার

পাঠ-১

জেন্ডার ঃ মূলধারণাসমূহ

জেন্ডার একটি ইংরেজী শব্দ এর আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ হলেও উন্নয়নে জেন্ডার আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জেন্ডার নির্দেশ করে একজন নবজাতক মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু কি করে সামাজিকভাবে পূর্ণাঙ্গ একজন নারী ও একজন পুরুষে পরিণত হয়। সমাজ সৃষ্ট নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমরা দেখতে পাই তাদের স্ব স্ব ভূমিকায়, দায়িত্বে, কর্তব্যে, আচার-আচরণে এবং পরিচিতিতে। এ সকল বিষয় সমূহ আবার নির্ধারণ করে সম্পদের বন্টন, সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগের বিষয়সমূহকে।

অনেকে সেক্স ও জেন্ডার শব্দ দু'টিকে একই অর্থে ব্যবহার করে, কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে এই দুটি শব্দের অর্থ একই মনে হলেও উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে এর অর্থ ভিন্ন। এখন দেখা যাক এদের মধ্যে পার্থক্যটা কিংবা এদের সংজ্ঞা কি?

একটি শিশু জন্মানোর পর সে মেয়ে কিংবা ছেলে তা আমরা তাদের শারীরিক পার্থক্যের ভিত্তিতে বুঝি বা তাদের লিঙ্গের মাধ্যমে সনাক্ত করি। এই পার্থক্যটি জন্মগত ও অপরিবর্তণীয়।

এই শারীরিক বা লিঙ্গগত পার্থক্যের কারণে নারী সন্তান জন্ম দিতে পারে এবং সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে। অপরদিকে পুরুষ ভ্রূণ উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। জন্মের পর একটি মেয়ে ও ছেলে শিশুর মধ্যে এটা একটি লিঙ্গগত পার্থক্য ছাড়া তাদের মধ্যে অন্যান্য শারীরিক অঙ্গ ও আচার ব্যবহারে প্রচুর মিল থাকে এবং নারী ও পুরুষের অন্যান্য শারীরিক অঙ্গসমূহের কাজও একই। অন্যভাবে বলা যায়, শারিরীক বৈশিষ্ট্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে অমিলের চেয়ে প্রচুর মিল রয়েছে।

নবজাতক ছেলে ও মেয়ের মধ্যে লিঙ্গের সামান্য পার্থক্য থাকলেও পরবর্তীতে সমাজ সৃষ্ট নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য এবং বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল বৈষম্যসমূহকে প্রকৃতিগত পার্থক্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ সকল বৈষম্য প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট নয়। কাজেই নবজাতক মেয়ে ও ছেলের লিঙ্গের সামান্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সমাজ পরবর্তীতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করে তা বোঝার জন্য জেন্ডারের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সেক্স	জেন্ডার
পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রাকৃতিক বা জৈবিক বা শারীরিক পার্থক্য	জেন্ডার সামাজিকভাবে সৃষ্ট নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক
লিঙ্গ জন্মগতভাবে প্রাপ্ত, অতএব সার্বজনীন ও অপরিবর্তনীয়	সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স ভেদে পরিবর্তনশীল।

একটি শিশু জন্ম নেয় একটি পরিবারে। পরিবার সমাজের একটি অংশ। প্রতিটি সমাজে যেমন অলিখিত কিছু নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি আছে, তেমনি আবার প্রতিটি পরিবারেও অলিখিত কিছু নিয়ম কানুন, রীতি-নীতি আছে শিশু পরিবারে জন্মের পর ওই পরিবারের তথা সমাজের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ও পারিপার্শ্বিক আবস্থার ভিত্তিতে বড় হয়, এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি পরিবার তথা সমাজে তার বিভিন্ন নিয়ম কানুন, রীতি নীতি মেয়ে ও ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ও পক্ষপাতিত্বমূলক। দুটো শিশুর মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য স্বাভাবিক। কিন্তু এই লিঙ্গগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সমাজ তার সৃষ্ট নিয়ম কানুনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থান, কাল ভেদে মেয়ে ও ছেলের জন্য শ্রম বিভাজন, সম্পদ বন্টন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনুমোদন করে। যার ফলে পরবর্তীতে নারী ও পুরুষের মধ্যে শুধু ব্যাপক পার্থক্যই লক্ষ্য করা যায় না বরং পুরুষের তুলনায় নারী নাজুক অবস্থায় থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, আপাতঃদৃষ্টিতে লক্ষণীয় স্বাভাবিক পার্থক্যগুলো পক্ষপাতিত্বমূলক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যম বৈষম্যে পরিণত হয়।

অন্যভাবে বলতে গেলে নবজাতক ছেলে ও মেয়ে লিঙ্গের সামান্য পার্থক্য নিয়ে জন্মে কিন্তু পাক্ষপাতিত্বমূলক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন তারা পূর্ণ পুরুষ ও নারীতে পরিণত হয় তখন তাদের মধ্যে যে ব্যাপক ব্যবধান থাকে তা বৈষম্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। কাজেই জেন্ডার বলতে বুঝায়, সমাজ সৃষ্ট নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ শারীরিক বা প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণে নয় বরং সামাজিক কারণে কিভাবে কাজে কর্মে, চিন্তা ধারায় ও উপলব্ধিতে নারী ও পুরুষ হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করে সেটাই হচ্ছে জেন্ডার। অন্যদিকে সেক্স হচ্ছে শারীরিক বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট যর ভিত্তিতে বোঝা যায় একজন মানুষ মহিলা না পুরুষ। জেন্ডার নির্দেশ করে সমাজের প্রত্যাশিত নারী ও পুরুষের আচরণ, তাদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক অনুমোদন।

সেক্স ও জেন্ডারের পার্থক্য

সেক্স	জেন্ডার
• প্রকৃতিগত বা জন্মগতভাবে সৃষ্ট • জীববিদ্যার পরিসর • সর্বকালে সর্বস্থানে স্থির এবং অপরিবর্তনীয়	• সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট • সমাজবিজ্ঞান পরিসর • সামাজিক শ্রেণী ভেদে ভিন্ন সংস্কৃতি, বয়স, জাতি স্থিতিস্থাপক এর উপর কাজ করা যায় এমন এবং রাজনৈতিক ইচ্ছা কর্তৃক পরিবর্তনশীল

লিঙ্গগত পার্থর্কের দরুণ এবং প্রকৃতিগত কারণে নারী যেহেতু সন্তান জন্ম দিতে পারে সেহেতু ধরে নেয়া হয় সারা জীবন ধরে নারী গৃহস্থালী কাজ ও দৈনন্দিন জীবন প্রতিপালন (House keeping and domestic activities) করবে অর্থাৎ পুনর্গঠন (maintain or reproduce) সংক্রান্ত কাজ। অন্য কথায় এই কাজগুলোকে প্রকৃতিগতভাবে নারীর কাজ বলে তার জন্য বন্টন করা হয়। অপরদিকে সকল বহুমূখী এবং আয় সংক্রান্ত কাজ সমূহ পুরুসের জন্য বন্টন করা হয়। ফলে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর জন্য প্রজনন সংক্রান্ত কাজ সমূহ পুরুষের জন্য বন্টন করা হয়। ফলে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর জন্য প্রজনন সংক্রান্ত কাজ যেমন- সন্তান লালন পালন, সংসারের যাবতীয় কাজ ও পরিবারের অন্যান্য সন্তানদের সেবা প্রদান এবং পুরুষের জন্য উৎপাদনমূলক, সম্মানজনক ও বর্হিমুখী কাজ বন্টন করা হয়। এটাকেই প্রকৃতিগত পার্থক্য হিসাবে গণ্য করা হয়।

আবার নারী ও পুরুষের মধ্যে তাদের আচরণে, ব্যবহারে এবং সমাজে বা পরিবারে তাদের দায়িত্ব কর্তব্যে যে পার্থক্য আছে তাও স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এগুলো কোনটাই প্রকৃতিগত নয়, বরং এ সকল পার্থক্যই জেন্ডার বিষয়ক শ্রম বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট। প্রতিটি সমাজ বা প্রতিটি নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম নীতি জারী করে যার ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জেন্ডারের রূপ ভিন্ন। তবে সকল ক্ষেত্রেই অসম। অন্যভাবেই বলা যায় বিশ্বের সকল দেশেই নারী পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে অথবা অসম অবস্থানে বিরাজ করছে। কিন্তু এই অসম অবস্থানের চিত্রটিও শ্রেণী, সমাজ, ধর্ম, বর্ণ, বয়স

ভেদে ভিন্ন। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সময়ে জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা, আচার-আচরণ ইত্যাদি পরিবর্তিত হচ্ছে। কেননা এগুলো সামাজিকভাবে সৃষ্ট এবং সমাজ (নারী-পুরুষ উভয়েই) এগুলো লালন-পালন করছে।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন

নারীর কাজ

- সন্তান জন্মদান ও লালন
- পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সেবা প্রদান
- সংসারের যাবতীয় কাজ
- হাঁস-মুরগী পালন/সবজি বাগা,
- সনাতনধর্মী কাজ
- ছোট খাট ব্যবসা

পুরুষের কাজ

- উপার্জনকারী
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানকারী
- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী
- লাভজনক ও ঝুকিপূর্ণ পেশা
- কারিগরি কাজ
- বড় ধরণের ব্যবসা।

	নারী	পুরুষ
পরিবার	সন্তান জন্মদান ও লালন পালন, সংসারের যাবতীয় কাজ সম্পাদন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সেবা প্রদান	রোজগারকারী, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানকারী (বাস্তবে পুরুষ সর্বক্ষেত্রে এই ভূমিকা পালন করতে পারছেন না)।
কমিউনিটি	ভাল মা, স্ত্রী, কোমলমতী, রমণী, ধৈর্যশীল, অন্তঃপুরবাসিনী।	সামাজিক, রাজনীতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ, নারীকে নিরাপত্তা প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।
কর্মক্ষেত্র	সনাতনধর্মী কাজ করবে, ছোটখাট ব্যবসা করবে, হাঁস-মুরগী পালন করবে, সবজি বাগান ইত্যাদি করবে। ব্যবসার জন্য স্বাল্পঋণ প্রদান করা হয়, কর্মক্ষেত্রে আদৌ সাহায্য সহযোগীতা পায় না। পেলেও তা অনুল্লেখযোগ্য।	বড় ধরনের ব্যবসা, কারিগরীধর্মী কাজ, লাভজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। কাজের সুযোগ বেশী। বিরাট অংকের ঋণ গ্রহণকারী কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সাহায্য ও অনুপ্রেরণা পায়।
পরিবার	অপর্যাপ্ত/অনুল্লেখযোগ্য সম্পদের অধিকারী। স্বল্প সম্পদের অধিকারী বলে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। স্বল্প খাদ্য গ্রহণ, সিদ্ধান্ত পালনকারী।	সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারী, অধিক মালিকানা, কন্যা অপেক্ষা পুত্রের শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ ব্যয় বেশী অধিক ও উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।
সমাজ	সম্মানজনক অবস্থানে নেই সমাজে পরিচিতি কম, চলাফেরা সীমাবদ্ধ নিজ নিরাপত্তা নারীকে নিশ্চিত করতে দেয়া হয় না। মতামত প্রকাশের সুযোগ কম।	সামাজিক সম্মান ও পরিচিতি আছে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। নারীর নিরাপত্তা প্রদানকারী হিসেবে প্রয়োজনে নারীকে শাস্তি প্রদানের অধিকার রাখে।

অতএব সামাজিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ফলে সমাজ প্রত্যাশিত ভূমিকায়, দায়দায়িত্ব পালনে এবং আচার আচরণে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পদের বন্টন, সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিরাজ করছে।

জেন্ডার ভূমিকা ঃ

জেন্ডার ভূমিকা বলতে আমরা বুঝি একটি সমাজ কর্তৃক প্রত্যাশিত নারী ও পুরুষের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহকে। এ সকল ভূমিকা সমাজে মেয়েলি ও পুরুষালি কাজের ধারণার সৃষ্টি করে। জেন্ডার ভূমিকা বয়স, শ্রেণী, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

জেন্ডার ভূমিকার তিনটি ধারণা

প্রজনন	উৎপাদনমূলক	সামাজিক
সন্তান জন্মদান ও লালন পালন	অর্থের বিনিময়ে কাজ	বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সেবামূলক কাজ
পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সেবা প্রদান	ফসল কাটার পর প্রক্রিয়াজাত করা	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা
গৃহস্থালী কাজ, খাদ্য তৈরী, পানি ও জ্বালানী/ সংগ্রহ		

- লক্ষণীয় যে, প্রজনন ভূমিকা সংক্রান্ত কাজগুলো সম্পাদনে কোন অর্থ উপার্জিত হয় না অর্থাৎ এর কোন বিনিময় মূল্য নেই।
- উৎপাদনমূলক কিছু কাজ আছে যা প্রজনন ভূমিকার পাশাপাশি মহিলারা গৃহস্থালী কাজের মধ্যে করে। যেমন- সংসারের যাবতীয় কাজের মধ্যে নারীরা ধান প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। এই ধান পরবর্তীতে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা হয়। অথচ নারীরা প্রজনন কাজের সাথে সাথে যে সকল উৎপাদন তথা উপার্জনমূলক কাজ করে তা অনেক সময় কাজ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে অদৃশ্য থেকে যায়।
- উৎপাদনমূলক ভূমিকা ও প্রজনন ভূমিকার পার্থক্য কাজ অথবা কাজের ধরণের মধ্যে নয়। পার্থক্য হচ্ছে একটির বিনিময় মূল্য আছে অপরটির বিনিময় মূল্য নেই।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ভূমিকা ঃ

- সমাজে সেবার কাজ বিনা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সম্পাদন করা। যেমন- কোন নির্দিষ্ট এলাকার জনগণ সবাই মিলে যখন বিনা পারিশ্রমিকে এলাকার রাস্তা মেরামত করছে, সে ক্ষেত্রে কাজের ভূমিকাটি সামাজিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ভূমিকা বলে বিবেচ্য হয়।
- সম্পদ যখন সীমিত বা দূর্লভ হয়ে পড়ে তখন সামাজিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। কোন ইস্যু বা কাজ সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার জন্য সিদ্ধান্ত দেবার বা গ্রহণের বিষয়টি সামাজিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই ভূমিকাকে সামাজিক রাজনীতি ভিত্তিক ভূমিকা বলে। যেমন- এলাকার জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাস্তা মেরামত করা হবে এবং জনপ্রতিনিধি এই ধরণের কাজে কখন, কিভাবে, কি ব্যবস্থায় রাস্তা মেরামত হবে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

জেন্ডারের চাহিদা উৎপত্তির কারণ ঃ

- জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাজন
- তিন ধরণের ভূমিকার অর্থাৎ প্রজনন ভূমিকা, উৎপাদনমূলক ভূমিকা এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন।
- সম্মান, প্রতিপত্তি অধিকার ও সুযোগ এর ক্ষেত্রে বৈষম্যকরণ।

জেন্ডার চাহিদা

প্রাত্যহিক/বাস্তবমূখী	কৌশলগত
চাহিদা মেটানোর ফলে	
নারীরা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো আরও সহজে করতে পারে	অধিক সমতা অর্জন সম্ভব হয়
প্রজনন, উৎপাদন এবং সামাজিক ভূমিকাসমূহের কাজের বোঝা কমে	নারীদের ক্ষমতা, সম্মান ও পছন্দ/বাড়ে
এ সকল ভূমিকার বাস্তব অসুবিধাগুলো দুর করতে সাহায্য করে	অধিকারের অসমতা কমে

সুতরাং প্রাত্যহিক/বাস্তবমূখী জেন্ডার চাহিদার লক্ষ্য হলো নারীরা প্রতিদিন যেসব সাংসারিক ও অন্যান্য কাজকর্ম করেতা আরও ভালভাব স্বচ্ছন্দে করার জন্য সহায়তা করা।

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা মিটানোর ফলে যে সকল ক্ষেত্রে অসমতা দূর করার প্রশ্ন আসে তা হচ্ছেঃ মজুরী, আইনগত অধিকার, সম্পদের মালিকানা, জন সম্পদের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, আয় জীবনযাপণ প্রণালী, অপ্রচলিত কাজ ইত্যাদি। সুতরাং কৌশলগত জেন্ডার প্রয়োজন মিটানোর মাধ্যমে নারীর অধঃস্তন অবস্থার উন্নতি হয়।

লক্ষণীয় যে, উভয় চাহিদাই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাত্যহিক জেন্ডার চাহিদা যা কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা বা প্রয়োজনের বিষয়টি ও বিবেচনা করতে হবে।

জেন্ডার চাহিদা

প্রাত্যহিক/বাস্তবমূখী চাহিদা	কৌশলগত চাহিদা
তাৎক্ষণিক বা স্বল্পমেয়াদী হওয়ার সম্ভাবনা	দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার সম্ভাবনা
প্রতিটি নারীর জন্য ভিন্ন	প্রায় সব নারীর জন্য একই
প্রাত্যহিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বাসস্থান, আয়, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত	নারীর অসম অবস্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমনঃ অধঃস্তনতা, সম্পদ ও শিক্ষার অভাব, নির্যাতন ইত্যাদি।
বিশেষ কিছু উৎপাদনের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ সম্ভব যেমনঃ খাদ্য, হস্ত চালিত পাম্প এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্লিনিক ইত্যাদি	চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্ন-সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, নারী সংগঠনকে শক্তিশালীকরণ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

জেন্ডার চাহিদা মিটানোর প্রক্রিয়া

প্রাত্যহিক/বাস্তবমূখী	কৌশলগত
নারীদের সেবা বা উপকার প্রাপক এবং অংশগ্রহণকারী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা	নারীকে প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা
নারীর জীবনে অবস্থার পরিবর্তন	সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তন
ঐতিহ্যগত ও বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা বা সম্পর্কে কোন পরিবর্তন না আনা	নারীর ক্ষমতায়নে সাহায্য সম্পর্কে/এবং পরিবর্তন সাধন করে

অবস্থা ও অবস্থান ঃ

অবস্থা বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন শিক্ষার পর্যায় (শিক্ষিত, নিরক্ষর), স্বাস্থ্য (ভাল স্বাস্থ্য), আয় (উচ্চ আয়, নিম্ন আয়) ইত্যাদি। অবস্থা মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণে সহায়তা করে। সামাজিক অবস্থান মানুষের মান-সম্মান, সমাজে গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত দেবার সুযোগ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সমাজে নারীরা সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রে, পুরুষের তুলনায় একটি অধঃস্তন অবস্থানে রয়েছে। শুধুমাত্র নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে পারব না। যেমনঃ অনেক গোঁড়া, উচ্চবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ হলেও বাড়িতে বাচ্চা প্রসব করানো হয়। এ ক্ষেত্রে প্রসূতির সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতার অভাব রয়েছে বলে আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ নয় এমন ব্যবস্থা তাঁকে মেনে নিতে হচ্ছে।

প্রদত্ত উদাহরণটি আমাদের বলে দিচ্ছে নারীর জন্য শুধু কার্যকরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। কারণ অধঃস্তন অবস্থানের কারণে কার্যকরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নারীরা ঝুকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং এখানে ক্ষমতায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

ক্ষমতায়ন ঃ

ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে নারী, নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তার অবস্থার ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। তবে ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র নারীর জন্য প্রযোজ্য হবে না, পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্যও প্রয়োজন।

ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াটি অনেক ব্যাপক। এককভাবে কোন নির্দিষ্ট উপাদান এখানে কাজ করে না। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর সমন্বিত ভূমিকার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীসমূহ কিভাবে ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে পারে

কতিপয় উদাহরণ ঃ

- একথা বলা যায় যে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছে। এই অধিকার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নারীকে ঘরের বাইরে ক্লিনিকে গিয়ে পরিবার পরিকল্পনার সেবা নিতে হচ্ছে। ঘর থেকে বাইরে গিয়ে সেবা গ্রহণ, বাইরে চলাফেরায় অভ্যস্ত হওয়া, সেবা প্রদানকারী ও অন্যান্য সেবা গ্রহীতার সাথে আলাপ আলোচনার সুযোগের ফলে নারী সচেতন হচ্ছে, নিজের স্বাস্থ্য চাহিদা বুঝতে পারছে- এসব বিষয় ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে।

- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে ক্রমাগত তথ্য পাবার ফলে নারী কুসংস্কার, ঝুকিপূর্ণ বিধি-নিষেধ ইত্যাদি মোকাবেলা করার শক্তি পাচ্ছে, এ বিষয়টি ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক।
- স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে বিশেষতঃ নারীকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে যখন জ্ঞান দেয়া হয় তখন, স্বভাবতই সেবা গ্রহীতা নারীর আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আসে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে সেবা গ্রহীতা নিজেই অসুস্থতার লক্ষণ চিহ্নিত করতে পারছেন, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে উদ্যোগী হচ্ছেন; এ সকল বিষয় ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনে সহায়তা করতে পারে যা কিনা ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত। পুরুষদেরকে সন্তান লালন-পালনে, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত অসম প্রজনন ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য আনতে পারে।
- সামাজিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচীতে (যেমন- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচী) নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকায় নারীকে নিয়ে আসা যায়। যেহেতু এ ধরণের ভূমিকা পালনে সিদ্ধান্ত দেবার বিষয়টি জড়িত থাকে সেহেতু তা নারীর ক্ষমতায়নে সাহায্য করছে।
- জেন্ডার সচেতন স্বাস্থ্যশিক্ষা পরিবারে পুরুষের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের উপর জোর দেয়। জেন্ডার ভূমিকার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন করে পুরুষকে দায়িত্বশীল ভূমিকায় নিয়ে আসতে হবে। ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া জেন্ডার ভূমিকার প্রচলিত ধারাকে পরিবর্তনে সহায়তা করে। যেমন- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষ সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়াও নারীর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বোঝার জন্য তাদের প্রতি সহায়কমূলক আচরণ প্রদর্শন প্রয়োজন।

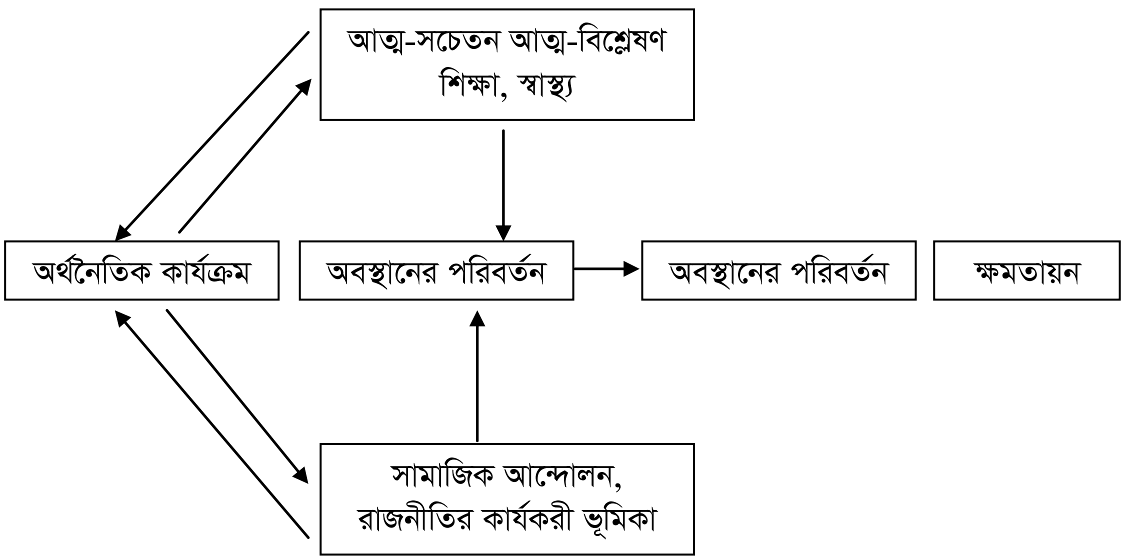

- ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া হতে পারে এবং একটি কর্মসূচীর লক্ষ্যও হতে পারে।

স্বাস্থ্যে জেন্ডার নিয়ে কেন আলোচনা ঃ

পুরুষের মতো নারীরও মৌলিক স্বাস্থ্য চাহিদা রয়েছে যেমন- পর্যাপ্ত খাদ্য চাহিদা, বিশ্রাম, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ গ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রজনন ক্ষমতার ভিন্নতার জন্য নারীর উল্লেখিত চাহিদাগুলো ছাড়াও ভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য চাহিদা রয়েছে।

জেন্ডার সচেতন যোগাযোগ ঃ

নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান কোন নির্দিষ্ট সমাজে সমান নয়। সকল নারীও সকল বিষয়ে একই অবস্থা ও অবস্থানে নেই। তাই জেন্ডার সচেতন যোগাযোগের ক্ষেত্রে-

- যোগাযোগের পদ্ধতি, মাধ্যম বা উপকরণ, বার্তা, নারীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য নির্বাচিত পদ্ধতি, মাধ্যম ও বার্তা অনুসরণ করলে যোগাযোগ সফল হবে না।
- নারীদের মধ্যে শ্রেণীগত, শিক্ষাগত ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই নারী সেবা গ্রহীতা বলে সকলকে একই দরে ফেলা যাবে না।
- প্রজনন ও স্বাস্থ্যচক্রের বিভিন্ন ধাপ এর চাহিদা অনুযায়ী যোগাযোগের বার্তা ঠিক করতে হবে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বার্তার প্রাপক হিসেবে নারীদের সাধারণ ও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ

- অন্যান্য প্রাপকের মতো নারীরাও বাস্তব জীবন ভিত্তিক তথ্য পেতে, সমস্যার সমাধার লাভে আগ্রহী (সাধারণ বৈশিষ্ট্য)।
- নারীদের সাধারণত যোগাযোগের প্রথম অবস্থায় অপরিচিতদের সামনে লাজুক, নিরীহ, শান্ত এবং অনাগ্রহী মনে হবে। কিন্তু যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তারা নিরাপদ ও আস্থাবোধ করলে ক্রমশঃ খোলাখুলি আলাপে আগ্রহী হয়ে উঠবে।
- যেহেতু নারীদেরকে দুর্ভল ও সীমিত জ্ঞানের অধিকারী বলে সমাজ চিহ্নিত করেছে সেহেতু তাদের মধ্যে অনেকের আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে। কাজেই প্রেরকের প্রথম থেকে তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে হবে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে।

- নারীরা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, জেনে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এ কথা মনে করে তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।
- সামাজিক কারণে এখনো নারীরা দূরদূরান্তে যাতায়াত করতে পারে না, গৃহ প্রধানের অনুমতি ছাড়া কারো সাথে যোগযোগের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে না, গৃহের কাজ ও দায়িত্ব থাকায় চাহিদা অনুযায়ী সকল ধরণের সভায় উপস্থিত থাকতে পারে না। যোগাযোগের সময়ে নারীর বাস্তব অসুবিধাগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে এসব বাস্তব অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য সহায়তা করতে হবে।

জেন্ডার বার্তা তৈরীতে চাহিদা ঃ

উদাহরণ ঃ

নারীকে সকল সময় শিশুর যত্ন নিচ্ছে এ ধরণের দায়িত্বে না দেখিয়ে বরং পুরুষকে এ ধরণের দায়িত্বে দেখানো যায় এবং নারীকে সভা পরিচালনাসহ কম্যুনিটির স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে এই ধরণের বিষয় বার্তা ও ছবিতে ফুটিয়ে তোলা যায়।

জেন্ডার সচেতন যোগাযোগের শর্তসমূহ ঃ

- আন্তরিক ও সহজ সম্পর্ক স্থাপন
- সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার
- চাহিদা অনুযায়ী বার্তা প্রদান। যথার্থ বার্তা বা তথ্য দেয়ার আগে মাঠকর্মীকে ঠিক করতে হবে কোন সেবা গ্রহীতার জন্য কি বার্তা বা তথ্য প্রয়োজন। কারণ সবার জন্য এক বার্তা উপযোগী নাও হতে পারে। যেমন- নবদম্পতি ও বয়স্ক দম্পতির জন্য একই তথ্য উপযোগী নয়।
- ধৈর্য্য সহকারে শোনা
- অন্যের আকাঙ্খা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিবেচনা করা। কর্মীর সেবা গ্রহীতার কাছ থেকে শেখার ও জানার প্রয়োজন আছে। নারী বলে সেবা গ্রহীতার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করা উচিত নয়।
- প্রতিবার্তা নেয়া।

জেন্ডার সচেতন পদ্ধতি

কোন পদ্ধতি কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী হবে এ সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবেঃ

- যোগাযোগের বিষয়টি স্পর্শকাতর ও গোপনীয় কি না?
- যোগাযোগের উদ্দেশ্য কি?
- প্রাপকের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হয়েছে কি? পুরুষের মানদন্ডে নারীর স্বাচ্ছন্দ্য বিচার কাম্য নয়।
- ব্যবহৃত পদ্ধতি উপযোগী হবে কি না। যেমন- অনেক সময় ধরে রেডিওতে একটি প্রোগ্রাম চলছে যা নারী ও পুরুষের জন্য উপযোগী নাও হতে পারে। প্রত্যেক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আছে তবে অসুবিধাগুলো যথাসম্ভব কম রেখে সুবিধা নিশ্চিত করা জেন্ডার সচেতন যোগাযোগের উদ্দেশ্য।

একটি উদাহরণ

ক্ষেত্র	মহিলাদের সভা	মহিলা পুরুষ সম্মিলিত সভা
সুবিধা	• মহিলারা সহজে বাড়ীর বাইরে যাওয়ার অনুমতি পায়। • মহিলারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। • নারীদের অংশগ্রহণ, আত্মবিশ্বাস, একতা বাড়ায়	• পুরুষদের কাছ থেকে মহিলারা এবং মহিলাদের কাছ থেকে পুরুষরা শিখতে পারে। • মহিলা ও পুরুষ মিলে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। • নারীদের বিষয় পুরুষরা আরোও ভালভাবে বুঝতে পারে। • অনেক ক্ষেত্রে নারীদের সম্মান বাড়ায়।
অসুবিধা	• অপর পক্ষ থেকে বাধা আসতে পারে। • নারী ও পুরুষ একে অপর থেকে শেখার সুযোগ পায় না।	• নারীরা সহজ হতে পারে না। • সমাজ এ ধরণের সভার সম্মতি সাধারণত দেয় না। • পুরুষদের প্রাধান্য বেশী থাকে।

নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা ঃ

নারীর প্রতি বৈষম্য বলতে বোঝায় নারী-পুরুষ ভেদে কোন বিভেদ সৃষ্টি করা। এর ফলশ্রুতিতে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধঃস্তন বা ছোট করে দেখা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার মানবাধিকার লংঘন করা হয় এবং তারা নানা রকম সহিংসতার স্বীকার হয়।

বয়সের ধাপ	নির্যাতন/সহিংসতা
শৈশবে	শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, শ্যালিকা বা বোন পেটানো, আবেগের সুযোগ নিয়ে শোষন, বৈষম্যপূর্ণ ব্যবহার যেমনঃ চিকিৎসা না করা, প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার দেয়া, অতিরিক্ত কর্মভার, সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ, শারীরিক অক্ষম নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য ইত্যাদি।
কৈশোরে	ক্ষতিকর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কুসংস্কার মানতে বাধ্য করা, কিশোরীর প্রথম ঋতুকালীন সময়ে অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকর ঘরে থাকতে বাধ্য করা, গণমাধ্যমে পর্নোগ্রাফী ও রুচিপূর্ণ নারী দেহ প্রদর্শন, নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা, প্রসবের পর আলাদা অস্বাস্থ্যকর ঘরে থাকতে বাধ্য করা, সামাজিক জীবন যাপনে বাধা প্রদান, গোপনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন নারী সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ প্রকাশনা ও ফ্যাশন প্রদর্শন, যৌন পেশায় বাধ্য করা, মানসিক নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, আত্মহত্যা, বাল্য-বিবাহ ইত্যাদি।
প্রজনন বয়সে ও গর্ভকালীন অবস্থায়	বউ পেটানো, এসিড নিক্ষেপ, স্বামীকে প্রভু বা গুরু বা দেবতা হিসেবে গণ্য করতে বলা, ফতোয়া, নারী বা স্ত্রীকে হত্যা বা দগ্ধ করা, যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতন, বহুগামিতা, নারী পাচার, ছেলে সন্তানের জন্য জোর পুর্বক গর্ভধারণে বাধ্য করা, শিক্ষাঙ্গণে বা কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন, বৃদ্ধের সাথে বিয়ে করতে বাধ্য করা, শারীরিকভাবে ক্ষতিকর যৌন নিরোধক ব্যবহারে বাধ্য করা, যৌ নির্যাতনের স্বীকার হলে সমাজে একঘরে করা, যৌন নিপীড়িত নারী ও তার আত্মীয়কে অমানুষিক শাস্তি প্রদান, কারাগারে বন্দি অবস্থায় নারী নির্যাতন, অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ, জন্ম নিরোধে অস্বীকৃতি, গর্ভপাত, অস্বাস্থ্যকর ও মৃত্যুঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত পদ্ধতি অবলম্বন, কারাগারে বন্দি অবস্থায় যৌন নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, যৌন পেশায় নিযুক্ত হতে বাধ্য করা, অনাকাঙ্খিত বা আকস্মিক গর্ভধারণ, ধর্ষণজনিত কারণে মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি, সমাজে অপমান ও লজ্জাকর অবস্থায় ফেলা, অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের জন্য স্ত্রীকে বাধ্য করা, পুড়িয়ে মারা, পিটিয়ে মারা, পিটিয়ে জখম করা, স্ত্রী পরিবারের থেকে জোর করে যৌতুক আদায়, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি।
বার্ধক্যে	পারিবারিক নির্যাতন, লিঙ্গ বৈষম্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য, সম্পদের নিয়ন্ত্রণ না থাকা, চিকিৎসা না পাওয়া, বিধবা অত্যাচার, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করা, আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্য ইত্যাদি।